লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস

লখীন্দর দিগার
কটাভানারি
জননী
জুনাপুর স্টীল—দুই খণ্ড
বিদ্ধ বিহঙ্গ
অসামাজিক

ছোট গল্প

পাঁচ-ফোড়নী (প্রস্তুয়মান)

সমালোচনা-গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথ
রবীন্দ্র-কাব্যরূপের বিবর্তন-রেখা
গদ্যের সৌন্দর্য

তরঙ্গ

মাহাতোদের বছর পনেরো বয়সের ছেলে পচাই ছুটছিল। বাঁশতলা, আমতলা পেরিয়ে দোলইদের মজা ডোবা—এইটে পেরিয়েই সামনে পাকুড়তলা।

পরনে তালি-দেওয়া জিনের হাফ-প্যান্ট, খালি গা, গলায় গামছা জড়ানো। গামছাটার এক খুঁটে কোঁচড়ে মুড়ি ভরা. মুঠিতে করে তুলে মুখে পুরছে আর ছুটছে। ডোবাটার পশ্চিম কোণে ঝাড় থেকে একটা বাঁশ আড় হয়ে পড়েছিল, লাফিয়ে পেরোতে গিয়ে একটা কঞ্চিতে পা আটকে পড়ে গেল।

'যাস্ শালা, তুর বাঁশের গুষ্টিকে লি ··' মুখে আপসোসের কথা, কিন্তু পচাই তিড়িক করে তখনই লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কালো, ময়লা গায়ে ছোপ-ছোপ ধুলো। অনেকগুলো মুড়ি পড়ে গিয়েছিল, লহমায় উঁচে নিলে যতগুলো পাবে. পুরে মুখে, কিছু কিছু ধুলো সমেত।

আবার ছুটতে যাচ্ছে, পিছন থেকে ডাক., 'এই ছোড়া···পচাই না? কুথা যাবি রে?'

গলার স্বরটা চিনবার আগেই পচাই 'মাছ গুড়াতে ··সিংপুকুরে জাল দিচ্ছে নাই?' বলে ছুট দিলে।

'থাম দিকিনি ··এই!' গরগর করে ওঠা আক্রোশের এই স্বরটা এবার যেন ধাক্কা দিয়ে পচাইকে থামিয়ে দিল। থমকে দাড়ানো পচাইয়ের চোখ দুটো কুতকুতে হয়ে উঠল. মুড়িসুদ্ধ ডান হাতটা শূন্যে স্থির হয়ে গেল: যে সিংপুকুরে সে মাছ কুড়োতে ছুটেছে, তার মালিক গণপতি সিং ডোবাটার অন্য পাড়ে তারই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পায়ের কাছে ছোট-বড় দু'-তিনটে মাছ রাখার খালুই (এক ধরনের ঝুড়ি), যে মাছ ধরা হচ্ছে সেগুলো ভরে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যই। এখন অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে কিন্তু তাকেই উদ্দেশ করে বললে, 'এগুলা লে দিকিন, পাড়ে লিয়ে যা ··', তারপর একই সঙ্গে যোগ করলে, 'শালা, তোরা যদি সব মাছ কুড়ায় লিবি, তো লাভের গুড় পিঁপড়ায় খেয়ে লিবেক!'

পচাইয়ের মুখে আসছিল, 'কেনে, মাছ তো সকলেই গুড়ায়, আর রুই কাতলা লয়, চুণা মাছ, জালের কাদামাটি ঝেড়ে দিলে গুড়াই···' কিন্তু বলতে পারল না।

যেন এও আগেকার দৌড়ের মতো আরো একটা খেলা, এই রকম করে

খালুই তিনটে নেবার জন্য এগিয়ে গেল। গণপতি তাকে দুটো খালুই দিয়ে নিজে একটা নিলে। গ্রামের এই ছোট ধরনের মালিক-জমিদার, এরা যাদের মালিক, তাদের সমানেও স্বচ্ছন্দে নেমে আসে।

পচাই দুটো খালুই দু হাতে নিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেল, কিন্তু হঠাৎ বড়টা উল্টো করে নিজের মাথায় গলিয়ে দিলে, আর সেই অবস্থায় ছুটতে লাগল। খালুইএর বাতার বিনুনির ফাঁকে ফাঁকে অল্প কিছু দেখা যায়, কিন্তু চোখ দুটো স্রেফ বেঁধে দিলেও ওরা ছুটতে পারবে, এসব মাঠ-ঘাট ওদের গা-হাত-পায়ের মতোই চেনা।

'চালানিতে যাবি পচাই? গণ্ডা আষ্টেক পয়সা পাবি, মেদনীপুর…'

'যাব গ', আজ্ঞে…'

পাকুড়তলাটা এসে গিয়েছিল। নিচে দিয়ে রাস্তা চলে গেছে, কিন্তু ওপরে ডালপালা জড়াজড়ি করে ঘন ছায়ার মতো হয়েছে, গাঁয়ের লোকেরা বলে সন্ধ্যের পর এখান দিয়ে যেতে গা ছমছম করে। এই পাকুড়তলা পেরোলেই আড়ালটা সরে যাবে, সামনেই আড়াইক্রোশী মাঠ। যে চাঁদসোল গ্রামটা পচাই পিছনে ফেলে রেখে আসছে তারই লাগাও। এখনো কিছু গাছগাছালি রয়েছে, কুলগাছ, লম্বা বুনো ঘাস, বাঁদিকে একটা শালের চারা, আর একটা প্রকাণ্ড কেঁদ গাছ। গাছটার তলা দিয়ে যাবার সময় হেসে উঠল পচাই, একটা ছড়া বলতে লাগল:

চল বিয়াই ক্যাঁদতলাতে যাব,
ক্যাঁদতলাতে যেয়ে বিয়াই লাচ জুড়ে দিব।

খালুইয়ের ভিতর থেকে তার গলাটা কী রকম শাঁখিনীর মতো শোনাতে লাগল। আর ছুটন্ত অবস্থাতেই সে একটা ঘুরপাক দিয়ে নিলে।

'পচাই, উরে অ পচাই, যাচ্ছিস কুথা রে…' খিলখিল করে হাসতে হাসতে বনের থেকে একটা ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে ওকে ডাকল, 'তুকে যে ভঁদড় ·· তুকে যে ভঁদড়-ভালুক লাগছে রে?'

মেয়েটা শাম্‌লী; পচাইএর দিদি।

'যিখেনে যাই, তুকে বলব কেনে·· তুর কঁছড়ে কী আছে রে, কী মারায় লিছিস?'

হঠাৎ হাসি থামিয়ে রেগে উঠল শাম্‌লী, 'মারায় লিব কেনে…উই বাঁশঝাড়ের গায়ে কুঁদ্‌রী দেখলম…তুর মতো আকাম লিয়ে থাকি, তাই যে?'

পচাই ওসব কথায় কান দেবার ছেলে নয়, সে এগিয়ে গেছে। শাম্‌লী ডাক

দিয়ে বললে, 'তুকে মহন ডেকেছে, সাঁঝ বেলাকে যাবি কেনে আজ, উয়ার ঘরে···'

'তুই যাবি. আমার বয়ে গেছে···' পচাই এখন মাথার থেকে সঙের মতো খালুইটা নামিয়ে ফেলেছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমনিভাবে বললে, 'মাকে, বুলে দিবি, আমি চালানিতে যাব, মেদ্নিফুর···সিংবাবু বুলেছে···'

'সি কি রে, যাস নাই···' বলতে বলতে থমকে গেল শাম্লী, পিছন থেকে আর একজন ওকে বলছে, 'থালেই দেখ, পচাই শুধু আকাম লিয়েই থাকে নাই, রোজগারও করে।'

কাঁধে হাল, সামনে দুটো বলদ তাড়িয়ে মোহন দুলে কাছে এসে পড়ল। এর কথাই এইমাত্র বলছিল শাম্লী। মোহন হাতের লাঠিটা তুলে হেট্-হেট করছে আর আলতো করে গরু দুটোর গায়ে ঠেকাচ্ছে। বছর কুড়ি-একুশের যুবক, লম্বা চেহারা, না-কালো না-ফর্সা রঙ, অমন গেঁয়ো লোকেরও ধবধবে ফর্সা দাত, হাসলে কী রকম 'সোঁদর-সোঁদর' দেখায়, শাম্লী ঠিক বুঝতে পারে না।

'ই মা গ. তুমি! কুথা ঠিঙে এলে গ···সব শুনায় লিছ থালে?' বলতে বলতে সাগ্রহে বন থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে দাঁড়াল শাম্লী।

মোহন বললে, 'শুনায় লিবার কি আছে? তুমি বনকুঁদরী তুলাইছ, আর পচাই আমার সঙ্গে দেখা করবেক নাই, এই ত।'

রাগে অভিমানে ঠোট ওল্টাল মাহাতোদের মেয়ে শাম্লী, বললে, 'আমার কথা উ শুনবেক কেনে? আমি লারব উয়াকে ভজাতে ··' তারপর হাত নেড়ে শুধাল. 'তুমি আমার কথা শুন, মহন?'

এ কথার উত্তর দিল না মোহন, চলে গেল হেট্-হেট করতে করতে। শাম্লী কতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সেই দিকে তাকিয়ে, তারপর উল্টো দিকে চলতে আরম্ভ করল। একবার ফিরে তাকাল মোহনের দিকে, হঠাৎ কী রকম লজ্জার মতো লাগল ওর, মুখ ঘুরিয়ে তারপর ছুটল সোজা ঘরের দিকে।

দুই

কোনো কারণে গণপতি সিং পিছিয়ে পড়েছিল। মুখোমুখি হয়ে গেল ছুটন্ত শাম্‌লীর সঙ্গে।

'তুর কঁছড়ে কী আছে রে, শাম্‌লী?' পচাইএর প্রশ্নটাই কিন্তু ভিন্নভাবে করল গণপতি।

শাম্‌লী দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল, গণপতির দিকে সংশয়ী চোখে তাকিয়ে।

'কেনে, কুঁদ্‌রী, বনকুঁদ্‌রী·· তুলছি হথাকে, উই বনের মধ্যে··' শাম্‌লীর কণ্ঠস্বর ঈষৎ বিরুদ্ধতায় কঠিন হয়ে উঠতে চাইল, গণপতি গ্রামের এক মহাজন, জমিদার হওয়া সত্ত্বেও।

গণপতি বোধ হয় বুঝল। বললে, 'তুর কুঁদ্‌রীগুলা বেচে দিব নাকি। কুঁদ্‌রীগুলা লবেনের মাকে (গণপতির স্ত্রী) দিবি. দশটা নয়া পয়সা লিবি, বুঝলি?'

এখন শাম্‌লী যে কুঁদ্‌রীগুলো তুলেছিল, তা কোনো কিছু না ভেবেই। গণপতির কথা শুনে চকিতে মনে হল যে তার নিজের মাকে দিলে পোড়া-ভাজা করতে পারত, কিন্তু মুখে বললে, 'দিব···'

'আর শুন, কামিনাকে, তুর মাকে বলবি, কাজ কামাই করছে কেনে, লবেনের মা বলছিল, বুঝলি?'

'বুলব···' বলে শাম্‌লী ওকে পাশ কাটাল।

তারপর ছুটতে গিয়েও এবারে আর ছুটল না, একটা নতুন ধাক্কায় ওকে জায়গাটা থেকে ঠেলে নিয়ে গেল যেন। সেটা গণপতি নয়, ওদিক থেকে তারক হালদার আসছিল চোখ দিয়ে তাকে যেন চাটতে চাটতে।

তারকের স্নেহহীন, লম্বা চেহারা বলে ঠিক বয়েস বোঝা যায় না। সব চেয়ে আগে চোখে পড়ে মাঝামাঝি সিঁথি করা কোঁকড়ানো চুল আর জোড়া ভুরু। ঢলা, আডময়লা পাঞ্জাবি, কোঁচা করা ধুতি আর ক্যাম্বিসের জুতো, একটু শৌখিনতা আছে। বগলে কয়েকখানা খাতা, গণপতি সিংএর কাছারিতে সে গোমস্তা, এখন সেখানেই সে চলেছে।

তারক হালদার অন্তগত কর্মচারী, তবু তাকে দেখে ঠিক ঘরোয়া বোধ করল না

গণপতি। দেখতে দেখতে তার চোখমুখের ভাব একই সঙ্গে কঠিন অথচ উৎসুক হয়ে উঠল, বললে, 'কি হে তারক, মংলাবাঁদির ডাকাতির কিছু হদিস পেল থানা-পুলিস?'

'থানা-পুলিসের বাপ এলে পারত নাই। কিন্তু রাখহরিদাকে ইদিকে বড় বাবু লিয়ে পড়েছে, থানায় লিয়ে যেয়ে তোষামুদি লাগাইচে…'

'ঘটনা আছে কিছু থালে, তাই বল কেনে!'

'কত্তাবাবু, বলছি তো তাই…' বলতে বলতে আর একটু কাছাকাছি হয়ে এল তারক, ফিসফিস করে কতকগুলো কথা বলল। শেষে যোগ করল, 'আমার কথা শুনেন, কত্তাবাবু, আইনি হোক, বেআইনি হোক, আমাদের (সিংবাবুদের) একট' বন্দুকে হবেক নাই, সেইট' লিয়ে লেন কেনে··'

একটা চোরাই রাইফেল বিক্রি আছে, তারকই তার সন্ধান এনেছিল। কিন্তু গণপতি এখনো রাজী হচ্ছে না। বললে, 'না হে, উয়ার ঝুটঝামেলা অনেক, তাছাড়া··' একটু থামল গণপতি। তারককে দেখেই প্রথমে যে অস্বস্তি বোধ করেছিল, প্রতিবারেই যা হয়, ইতিমধ্যে সেটা কাটিয়ে উঠেছিল সে। বললে, 'তুমার কি মনে হয়, তারক, মুংগার মতন জবাই হব আমরা? তা তুমাদের ছোঁড়া-ডাকাত, কি সড়কিআলা বাগদী ডাকাত, যাই হোক কেনে!' তারককে পাশ কাটাতে গিয়ে যোগ করল, 'ঠাকুদ্দা রামেশ্বর সিং মরেছিল বটে, কিন্তু বাঘের সঙ্গে লড়াই করে, বুঝলে হে!'

গণপতি চলে যাচ্ছিল। যেন বেকুব বনে গেছে এমনি করে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল তারক, তারপর লাফিয়ে আবার গণপতির পাশে এসে পৌঁছাল।

'আবার কি বুলছ?' গণপতি জিজ্ঞেস করলে।

তারকের গলার স্বর সম্পূর্ণ বদলে গেছে, তেল ঢেলে দিলে পিছল হওয়ার মতো। মাথা চুলকে বললে, 'শাম্‌লীকে দেখলম নাই আপনার সঙ্গে বুলতে? উয়ার মা বুলছিল আপনার ঘরে উয়াকে একট' কাম দিতে··'

পিছনে তাকাল তারক, গ্রামের ভিতর যেদিকে শাম্‌লী গেছে, সেই দিকে। তখন সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

'বটে, বুলেছে তুমাকে!' কঠিন হয়ে উঠতে চাইল গণপতির মুখখানা। শাম্‌লীর দিকে তাকিয়ে তারকের চোখের ভাব তার চোখ এড়ায়নি, রতনে রতন চেনে। বললে, 'আমার ঘরে কি মেঝেন-বাঁদীর অভাব হল নাকি? লরেনের মা ত আমাকে কিছু বুলে নাই…' বলে দ্রুত পা চালিয়ে গেল গণপতি, এবং যে পথ দিয়ে একটু আগে পচাই গেছে, সেই পথে এগিয়ে মাঠে পড়ল।

তিন

চাঁদসোল গ্রামের থেকে আড়াইক্রোশী মাঠে পড়ে পচাই এগোচ্ছিল খানিকটা কোণাচি পশ্চিম মুখে। সেই মুখে আড়াআড়ি মাঠটা ক্রোশখানেক, কিন্তু মাঠটা ডাইনে-বাঁয়ে অর্থাৎ উত্তরে-দক্ষিণে লম্বাটে, আড়াইক্রোশের মতো, সেই জন্যেই ওই নাম।

মাঠের তিনটে দিকে বিছানো রয়েছে গোলাবাঁধি, রামপুর, চন্দনী, মংলাবাঁধি এই সব গ্রাম, আর ওই পশ্চিম দিকে যেখানে সকালের আলোতে ঈষৎ আবছা হলেও গাছপালাগুলো ঝকঝক করছে, সেটা এই অঞ্চলের ডাকসাইটে ব্রাহ্মণ-ভুঁইএর জঙ্গল। মানুষ-হিংস্রপশু-ডাকাত নিয়ে জঙ্গলের অনেক সম্ভব-অসম্ভব গল্প এ অঞ্চলের মানুষের মুখে-মুখে ঘোরে, নতুন কাহিনী তৈরিও হয়। আর এই মাঠটাকে মাঝখানে রেখে জঙ্গল আর মানুষের যোগসূত্র সেই কবে থেকে চলে আসছে।

মাঠে নেমেই পচাইয়ের প্রথম চোখে পড়ল সিংপুকুরের উঁচু পাড়, বট-খেজুর-শাল তার ওপর মাথা তুলে পরস্পর জড়াজড়ি করছে। কয়েকটা চিল গাছগুলোর মাথায় পাক খাচ্ছে আবার নেমে বসছে। এই যাঃ, মাছ ধরা শুরু হয়ে গেছে। পচাই ছুটতে আরম্ভ করল।

পুকুরটার কাছাকাছি কতকগুলো মেয়েকে আসতে দেখা গেল, বেশ হনহন করে এগোচ্ছিল ওরা। পচাইয়ের প্রথম মনে হয়েছিল, ওরা মাছ ধরায় যোগ দেবে। কিন্তু পুকুরটাকে পাশ কাটিয়ে এগোতে দেখে বিস্মিত হল।

মুখোমুখি কিন্তু খুব কাছাকাছি হবার আগেই পচাই চেঁচিয়ে বললে, 'ধনী দিদিমা, কুথা যাচ্ছ গ' তুমরা, এই সাত সকালা•' বোঝা যায় ওদের কেউ কেউ তার চেনা, গ্রাম-সুবাদও আছে।

দলের মধ্যে থেকে প্রৌঢ়া একটা মেয়ে বললে, 'হুথাকে•', দূরে হাত বাড়িয়ে ঝাপসা-দেখায় জঙ্গলটার দিকে দেখালে, 'সকাল সকাল না গেলে মুখপড়াদের লজরে পড়তে হবেক নাই? তাই...'

'ত মাছ ধরাতে যাও নাই কেনে, সিংপুখুরে মাছ ধরা হচ্ছে, খপর জান নাই?'

'জানব নাই কেনে, উই ত দেখি চোখের মাথায় · ' ধনী একটুখানি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, অন্যরা পেরিয়ে গেল ওকে। 'উ মাছধরাতে লাভ নাই আর সিংবাবুদের জ্বালায়···'

যারা ওকে পেরিয়ে গিয়েছিল তাদের একজন হেঁকে বললে, 'ধনী দিদি, এই লয় তুমার বেলা হয়ে যাচ্ছিল!'

'যাচ্ছি, যাচ্ছি · ' বললে বটে ওদেরকে লক্ষ করে, কিন্তু ধনী তক্ষুণি গেল না, পচাইকে একটু অন্তরঙ্গ স্বরে জিজ্ঞেস করলে. 'হঁ রে পচাই, তুর বোন শাম্‌লী কাঠ ভাঙতে যায় নাই কেনে রে?'

পচাইও ওকে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিল, 'উয়ার কথা আমাকে শুধাও নাই···'

'কেনে রে, তুর রাগ হল কেনে?'

'উয়ার ঘঁড়া-রোগে ধরেচে! কাঠ কাটবেক নাই, মাঝ ধরবেক নাই, কুন্থু ঘরে কাজকাম করবেক নাই, খালি-খালি মায়ের সঙ্গে ঝগড়া লাগায় দিবেক···' পচাই এক একটা কথা বলছে আর তারই তালে তালে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছে, কালো ছেলেটা বাচ্চা শালগাছের মতো লকলক করছে যেন।

'কী বললি রে ছুঁড়া, ঘঁডা-রোগে ধরেছে · ' বুড়ো মেয়েটা হঠাৎ খিকখিক করে হেসে উঠল, 'ঘঁডা রোগ লয় রে, বিয়া রোগে ধরেছে, বিয়া রোগ, খি-খি · ' দমকে দমকে বলছে আর ওর সমস্ত দেহটা দুলে দুলে উঠছে। মনেই হয় না যে মেয়েটা খেতে পায় না, প্রকৃতি আর মানুষের বিরুদ্ধতায় খিন্ন। 'পচাই, তুর মাকে বুলবি, খালে জুয়ার ঢুকেছে, তুর বোনের লৌকার মাঝি জগাড করে দিবেক '

পচাই হাসতে গিয়েও থমকে গেল। শাম্‌লীর সম্বন্ধে ও নিজে যাই বলুক না কেন, কেউ কিছু ঠাট্টা করলেও ওর কালো মুখে সিঁদুরে-আভা ফুটে উঠতে চায়। বললে, 'তুমি যেয়ে বল কেনে. আমি বুলতে লারব · ' ঘুরে দাঁড়িয়েই ছুটল পচাই।

ধনীও ফিরতে যাচ্ছিল কিন্তু একটা ভারী অথচ ভাঙা-ভাঙা গলার 'এইগুলান কে গ' তোরা? ধনী···বঁচার মামী···লয়?' কথাগুলো উচ্চারিত হতেই চমকে উঠল। স্বয়ং গণপতি সিং ঠিক পিছনেই উপস্থিত হয়েছে। 'জঙ্গলের কাঠ লুট করতে যাচ্ছিস? যা-যা, যা কেনে···'

ধনী তাড়াতাড়ি পিঠের ময়লা, ছেঁড়া কাপড়টা মাথায় তুলে দিয়ে জিব কাটল। আড়ষ্ট ভাবে বললে, 'হঁ, বাবু··'

উত্তর শোনাতে গণপতির তখন আর মন ছিল না. পাশ কাটিয়ে পেরিয়ে

গেল। ওর চোখ ছিল পুকুরপাড়টার দিকে, এদিক ওদিক থেকে বাচ্চা-বুড়ো, মেয়ে-মদ্দ পুকুরের দিকে ছুটছে, উপরে চিল আর নিচে মানুষ।

বিড়বিড় করতে করতে চলছে গণপতি, খালুইটা নড়বড় করছে তার হাতে, 'সরকারী মাল জঙ্গলের কাঠ, যা, যত পারিস লুট কর আর সিংপুকুরের মাছ, সেইটা' আর এক সরকারী মাল, এই মাছ-কুড়ানির জ্বালায় গাঁ-ছাড়া হতে হবেক, যেখেনে যা পাচ্ছে সব উঁচে লিচ্ছে, যা সব · '

ধনী মুখখানা হাঁ করে চলে-যাওয়া গণপতিকে দেখছিল আর কথাগুলো শুনছিল। ওর সঙ্গীরা একটু দূরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল. তাদের মধ্যে বঁচার মামী বলে উঠল, 'আঁশ লাগায় গেল না কি, ধনী দিদি, এটুকে গেলে দেখি…' কথা শেষ হল না, মেয়েগুলো চাপা লহর তুলে হেসে উঠল।

ধনী বেকুব হয়ে ওদের সঙ্গে এসে জুটল, কিন্তু সেও রসিকতাতে কম নয়. 'আঠা কি আর আছে যে লাগায় যাবেক, আঠা শুকায় গেছে · '

'এখন আর নাই বটেক, তা ছিল এক কালে · ধনী দিদি কপালে টিপ পরত আর কাপড়ে এসেন মাখত কে যায়, না রাধে যায়, কুথা যায়, না কুত্তয় যায়, খি-খি ' আবার একটা হাসির লহর উঠল।

'আর তুই বুঝি বাদ যেতিস · চল চল, বেলা হইচে, বাজে কথা ছাড় দিকি।'

আবার চলা শুরু হল ওদের। দ্রুত পায়ে এগোচ্ছে ওরা. তাল রেখে হাত দুলছে, চুপচাপ সবাই, জমির এক আল শেষ করে গতির মুখ বদলে আর এক আলে এসে পড়ছে, কখনো কোনো জমি কোণাকুণি পার হচ্ছে।

প্রথমে বঁচার মামীকে তারপর ধনীকে পেয়ে বসল পুরনো স্মৃতিতে, গণপতি সিং তখনো ওদের মন থেকে মুছে যায়নি।

বঁচার মামী বললে, 'সিংবাবু মানুষটা' সি-রকম আর নাই, আগে দেখলে মানুষজন দশ হাত ছিট্‌কাই যেত!'

ধনী যোগ দিল, 'তা আর বুলতে, লাল টকটক করছে মুখ, ঘঁড়ায় করে শিকার করতে যাচ্ছে জঙ্গলে…'

'আর এখন সেই মানুষটা' বুড়া বলদ, নিজের হাতে খালুই লিয়ে পুখুরকে যাচ্ছে মাছ আগলাতে, ছি-ছি…'

ধনী এর উত্তরে এক রাশ কথা ছাড়ল, 'পচাই ছঁড়াকে তখন বললাম নাই যে মাছ ধরায় লাভ নাই, ত সে অনেক দুঃখের বিত্তান্ত। সিংবাবু, অমন পেল্লায় পুরুষটা', ত মেছুনীর সঙ্গে খিঁচখিঁচি লাগায় দিবেক। আগে পেতম অদ্ধেক ভাগ, দুটা' মাছ ধরলম ত তুমার একটা' আমার একটা', এখন বলে সিকি ভাগ

নাও। যদি একট' ধরলম, ত বলে তুমি ল্যাজাট' নাও মুড়ট' 'দ' যাও…
ছ্যা-ছ্যা, ছোট মন, মানুষ কী থাকে আর কী হয়।'

কম বয়সী এক মেয়ে অন্য রকম ভাবছিল, সে কুণ্ঠিতভাবে বললে, 'পিসি, তুমি যে বুললে মাছ ধরায় লাভ নাই, ত কাঠ ভাঙতে যাচ্ছ, তায় লাভ আছে ত?'

আর একজন বললে, 'ইকথা ঠিক বটেক. হ।'

যাত্রার ভঙ্গিতে কপালে করাঘাত করল ধনী, 'লসিব, লসিব, ইখেনেও ভাঙা, উখেনেও ভাঙা।'

ওর কথার ধরনে হেসে ফেলল সবাই।

চার

সিংপুকুরের পাড়ে পা দেবার আগে চওড়া রাস্তাটার ওপর অনিশ্চিতের মতো থমকে দাঁড়াল পচাই। রাস্তাটা কাঁচা বটে কিন্তু একেবারে মেটে নয়, খোয়া-বিছানো, বর্ষার জলে নিত্য ব্যবহারে এখানে-ওখানে গর্ত হয়ে গেছে এই যা। গরুর গাড়ি তো বটেই, মোটর কার কি বা ট্রাকও কোনো রকমে যাতায়াত করতে পারে। ডাইনে-বাঁয়ে একবার তাকিয়ে নিয়ে রাস্তাটা পার হল পচাই, তারপর লাফ দিয়ে দিয়ে সিংপুকুরের উঁচু পাড়ের ওপর কাঠবেড়ালির মতো উঠে পড়ল।

মাছ ধরা তখন বেশ দ্রুত হয়ে চলছে, পচাইয়ের কচি বুকের ওঠা-নামার মতো। পাঁচ-সাতজন বেড়াজাল ফেলে টানছে, পচাই তার মধ্যে চিনতে পারল তিন জনকে, দুল্লভ, বেচা দুলে, নারাণ। নারাণ সব চেয়ে বুড়ো কিন্তু তার হাকডাকই বেশি।

'নারাণ জ্যাঠা, কটা খিয়া দিলে গ', ও জ্যাঠা…'পচাই হাঁক দিল, ডান হাতটা ছুঁড়তে ছুঁড়তে।

ওরা সবাই সব কথার উত্তর দেয়, ছোট-বড় ভেদ করে না। নারাণ নতুন করে খিয়া দেবার উদ্যোগ করছিল। পুকুরের তলা থেকে একটা ছোট্ট পচা গাছের ডাল জালের সঙ্গে টানা হয়ে এসে জালকাঠির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল, জট ছাড়াতে ছাড়াতে তেমনি চেঁচিয়ে বললে, 'এই দিলম গটা দুই …ত এই ছঁড়া, দাঁড়ায় কেনে রে, কাঠের মতন, নেমে পড় না কেনে… '

'যাই, লারাণ জ্যাঠা ··' হাতের খালুইটা রেখে, প্রায় লাফিয়ে গড়িয়ে জলের ধারে এসে পড়ল পচাই, 'আমি কী করব গ', জাল টানায় লাগব ?'

দুর্লভ ইতিমধ্যে জালের একটা প্রান্ত হাতে তুলে নিয়েছিল, হেসে উঠে বললে, 'পুঁচকের ডিম, তুই আবার জাল টানবি কি রে। জাল তুকে টেনে লিবেক। তুই বিঁডাগুলান ধরায় দে, পারবি ত ?'

'হুঁ, পুঁচকের ডিম হব কেনে! বিঁডাগুলান ধরায় দিতে পারব, বল কি··· রাগে পচাইয়ের চোখ দুটো ঘুরে উঠছিল, আর ওর কথা শুনে দুর্লভরা উঠছিল খ্যাকখ্যাক করে।

তারই মধ্যে ক্ষিপ্র বেগে পচাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিঁডেগুলো জড়ো করে ফেললে। বিঁডেগুলো খড়ের আঁটিতে খড়ের পাক দিয়ে তৈরি, হাত খানেকের মতো লম্বা। দু'জন জালের এক প্রান্ত ধরে পুকুরের ধার বরাবর জলের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে গেল, আর পচাই পটাপট বিঁডেগুলো হাত দুই তিন ছাড়াছাড়া জালের কানার রশির নিচে ঢুকিয়ে দিতে লাগল।

একটু পরেই জাল টানা শুরু হল। ডান দিকে দু'জন বাঁদিকে দু'জন। চারটে লোক পুকুরের দু'ধার দিয়ে এগোতে লাগল। জলের ওপর বিঁডেগুলো ভেসে রয়েছে কয়েক হাত ছাড়া ছাড়া, দেখতে দেখতে জালটার চেহারা হয়ে গেল আধফালি চাঁদের মতো। লোক চারটে সামনে ঝুঁকে পড়েছে, শব্দ-টব্দ বেশি হচ্ছে না, কালো জলের মধ্যে—এখনো জলটা গুলান হয়নি—সরু সরু পাগুলো ছপছপ করে এগোচ্ছে। শক্ত লাঠিপানা শরীরগুলোয় ভর হয়েছে যেন।

পচাই লারাণ জেলের মতো ভঙ্গিতে কোমরে ডান হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। হঠাৎ একটা পাক খেয়ে চেঁচিয়ে উঠে জলে 'চব্‌রাং' করে ঝাঁপিয়ে পড়ল, 'কাতান যাচ্ছে, কাতান, জয় মা কালী ·' মানে, বাঁকা জালটাকে দেখে কাতান মনে হয়েছে তার।

বুড়া লারাণ কোমরে একটা ছোট খালুই বাঁধছিল। ভিজে, শিথিল চামড়ায় পাঁজরার হাড় দেখা যাচ্ছিল, অদ্ভুত লম্বা-লম্বা ঠ্যাং, ভিজে ময়লা গামছা একট জঙ্ঘার ওপর টাইট করে জড়ানো—তীক্ষ্ণ চোখ দুটো কিন্তু জলের ওপর। পচাইকে লক্ষ করে বললে, 'তুই ছুঁড়া জালের পেছুনে ঝাঁপাই ঝুড়তে লাগলি যে ·'

পরক্ষণেই ওর মনোযোগ বদলে গেল। চোখের ওপর রোগা হাতখানার আড়াল দিয়ে তাকাল ওপারের দিকে, যেদিকে জালটা যাচ্ছে। ঠাওর করে চেঁচাতে লাগল, 'হেই ছুঁড়ারা, উপরে উগুলা কে রে ·লন্দে লয় ? উই লন্দে, ঝাঁপায় পড, ঝাঁপায় পড় না রে, হেই···'

বলার অপেক্ষা মাত্র, পাচ ছ'টা ছেলে আগে-পিছে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।
লারাণ তার লম্বা পায়ে ছুটল পাড দিয়ে। পাড়ের ওপর লোক জমায়েত হয়েছিল, হচ্ছিল আরো। গণপতি সিংয়ের পাশ দিয়ে ছুটে গেল লারাণ, খালুইটা ছোটার তালে তালে ওঠা-নামা করছিল, 'তফ্‌রা তুল, ছঁড়াগুলা, তফ্‌রা তুল…'

পুকুরের আদ্ধেকটা পর্যন্ত তখন জাল এগিয়ে গেছে। পাড়েব সমস্ত লোকের তীক্ষ্ণ, কঠিন চোখগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে জলের ওপর। যেন মৃত্যুদণ্ড জারি করে অপেক্ষা করে রয়েছে। ঢেউ উঠছে, জল দুলছে। জাল এগোচ্ছে, ওদিকে ছেলেগুলো ঘন হয়ে আসছে ক্রমশ। মাছ লাফাতে আরম্ভ করল। 'হুই, বুয়াল না কি রে…', 'কাতলা গ উইট'…' ছেলেগুলোর দাপাদাপি, উথাল-পাতাল, ছেলেগুলোকেই মাছ বলে মনে হতে লাগল এক সময়। একটা বড কাতলা জাল ডিঙিয়ে পডল এদিকে, পচাইও লাফিয়ে দিলে একটা, সেদিক পানে। ওস্‌ শালাঃ, পালায় গেল বে! যা শালা, যাবি কুথাকে, ঘুরে এসছি…'

'হেই ছঁড়ারা, পালায় আয়, পালায় আয়' লারাণ পাড ঘুবে পুকুরটার উল্টো দিকে পৌছে গিয়েছিল, জালটা যেখানে এসে থামবে। যে ছেলেদের সে জলে তফ্‌রা তুলবার জন্য ঝাঁপিয়ে পডতে বলেছিল, এখন তাদেরই হুঁশিয়ার করছে, 'শালাব ব্যাটাবা, জালে জডায় যাবি, তলায় যাবি, যমেব পেটে যাবি…' মানে, জালে জড়িয়ে গেলে তলিয়ে যাওয়া বা ফাঁস আটকে মরা আশ্চর্য নয়।

ছেলেরা আগেই বুঝতে পেরেছিল, ডাকটা কানে পৌছোতে না পৌছোতেই ওরা তিডিক করে উল্টো মুখে সাঁতরাতে আরম্ভ করে দিলে। জাল টানার এই শেষ মুহূর্তটায় উত্তেজিত চিৎকার, ছেলেদের আর মাছের লাফালাফি—সে এক কাণ্ড। জালে কী উঠল দেখবার জন্য পাড়ের সব দিক থেকে মেয়ে-মদ্দ বাল-বাচ্চা ছুটে আসতে লাগল।

লারাণ আবার জলে নেমে পড়েছে। উপরে চিল উডছে পাক দিয়ে, তীক্ষ্ণ চিৎকারে, ছোঁ মারবে বলে, আর নিচে লারাণ নিপুণ হাতে ছোট-বড মাছগুলোকে কানাসিতে ধরে পটাপট তুলে নিচ্ছে জাল থেকে। ছোটগুলোকে পুরছে কোমরে বাঁধা খালুইটার মধ্যে, আর বডগুলোকে পুকুর-কোণে জাল-ঘরে ছুঁড়ে দিচ্ছে, রোদে তাদের রূপোলি রঙ উঠছে ঝিকিয়ে।

আধ কোমর জলে পচাই দাঁড়িয়ে, কোমরে দু'হাত রেখে হাঁপাচ্ছে। সে একবার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে ছটপটিয়ে মরছে খালুইয়ের মাছগুলোর দিকে তাকাল, আবার জালঘরে পাখনা ছড়ানো, লাফানো মাছগুলোর দিকে। খিকখিক করে হেসে ফেললে, 'শালাঃ, ঘুটে পুডে গোবর হাসে! তুদের মিয়াদ আর এক পহর…

তা'পরে সিংবাবুদের খালুইএ ঢুকে চালান যাবি, এখন যত পারিস লাফায় লে…'

গণপতি ছুটতে-হাঁটতে এসে পৌছেছিল, 'এই খপদ্দার, চুরি করবি নাই…'

খুব ছোট মাছ জালে আটকা পড়ার কথা নয়, স্রোতের টানে টানে তবু কিছু পুঁটি-বাটা-বেলে এসে পড়েছিল, লাফিয়ে পড়ছিল ডাঙায়। আর ছেলেমেয়েরা বকের মতো খাপচি মেরে তুলে নিচ্ছিল। গণপতির চোখ সড়কির মতো লিকলিক করে সেদিকে পড়ল একবার, আবার দূরে পুকুরের পাশগুলোতে। জল গুলান অর্থাৎ কাদামাখা হতে আরম্ভ করায় মাছ ভেসে উঠেছে জলের ধারে ধারে, ঘাসের আর কলমি-শুশনির বনে। মেয়েরা চাটুনি জাল দিয়ে ছেঁকে নিচ্ছে, কেউ বা দু'হাতের দশ আঙুলেই জালের কাজ করছে।

গণপতির লিকলিকে চোখ আবার ছোবল মারল, 'অ দুলে-বউ, তেই মাহাতোর ঝি! কী হচ্ছে কি? ই তোদের কী পাত-চাটা স্বভাব. বাবু '

ওরা মুহূর্তের জন্য থমকে যায়, চোখে ভয়, ভিক্ষা আবার ধৃষ্টতা. কেউ বা না শোনার ভান করে।

'তোদের স্বভাব. বেল্লিক. মা যেমন, বংশ যেমন উই করেই তোদের জন্ম-জন্ম কাটবেক '

বুড়ো লারাণ কাজের মাঝখানে মুখ তুলে তাকাল, 'লেউ না উয়ারা দু'চারট', আপুনিদের এঁটো পাত গুড়ায় মানুষ উয়ারা, লেউ লেউ '

একবার থমকে গেল গণপতি, পরক্ষণেই চিবোতে লাগল, 'তুমি বললে বটে লারাণ, এঁটো কুড়ায়! বলি চারপাশে রাবণের গুষ্টি দেখেছ, না. চোখে মোটা চালসে ধরেচে, সব্বাই দুট'-চারট' নিলেও কত কেজি মাছ যাচ্ছে বল দিকি।'

'হঁ হঁ, তা যথাত্ত বুলেচেন…' টেনে টেনে হাসতে লাগল লারাণ, তবু বললে, 'তা আর কি করবেন বলেন. লেউ…'

পাঁচ

পুকুরের চার দিকের পাড় খালি হয়ে গেছে, কর্মকাণ্ডের শেষ পর্বটা যেমন হয়। কাকচক্ষু নীল জল এখন ঘোলাটে, কাদা-কাদা ছোটখাটো ঘাই মারছে মাছেরা প্রাণহীনের মতো, বোঝাই যায় না। জল যেখানে তীরে মিশেছে সেখানে কলমি, হিংচে আর শুশনির ডালপালা সমেত লতার জটগুলো উলটানো—এরা

শিকারের লক্ষ ছিল না তবু কাটা পড়েছে।

এ দিকের পাড়াটাতে মাছের বাঁধাছাঁদা চলছে, গণপতি সিং এখন মাছ চালান দেবার জন্য ব্যস্ত, একাগ্র। পাঁচ সাতজন রয়েছে ওর চারদিকে। লারাণরা জাল, দড়াদড়ি সমেত নিজেদের পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে চলে গেছে, দলের কিশোরীকে রেখে গেছে বাবুকে সাহায্য করার জন্য। বড় বন্ধ খোল-মোটা সরু মুখ খালুই এবং ঝুড়িতে মাছগুলো রাসা হচ্ছে। শালবনির ইন্দুবাবুর আইসক্রিম কারখানা থেকে বরফ এসে পৌঁচেছে, সিং মশায় আগেই অর্ডার দিয়ে রেখেছিল। শালপাতার অভাব নেই, চারদিকেই তো জঙ্গল. পচাইয়ের মতো ছোঁড়াগুলো এক দণ্ডের মধ্যে স্তূপাকার করে ফেলেছিল। এখন শালপাতা বিছোচ্ছে. বরফের কুচি দিচ্ছে।

জালঘর থেকে তুলে আনার সময় মাছগুলোর মরণ-ছটফটানির অন্য এক কায়দা। লাফ মারছে, চিত্তাল খেয়ে পিছলে যাচ্ছে, কিন্তু যে মানুষগুলো তুলে আনছে তাদের মনে পাপ কোনো অনিশ্চয়তা নেই, চোখের ক্রুর অথচ নরম দৃষ্টিতে দেখছে—ঝুড়ির ভেতর শোয়ানো, আশে-পাশে উপরে-নিচে সাজানো মাছ তখনো নড়ছে. পাখনা-কানাশি উঠছে পড়ছে, আস্তে আস্তে থেমে আসছে নড়ানি।

মাঝখানে একটু বাধা পড়ল। মাছ ধরার দলের যে কিশোরী দোলই পিছনে রয়ে গিয়েছিল, তার পিসীকে হঠাৎ দেখা গেল মাঠ পেরিয়ে আসতে। পুকুরের উঁচু পাড়ের ওপর উঠে দলটার থেকে একটু দূরে দাঁড়াল মেয়েটা, গণপতি সিং আছে বলে পরনের ময়লা খাটো থানটার আঁচল মাথায় টানতে টানতে। বয়েস হয়েছে, কালো কাঠিপানা শরীর কিন্তু জরার ছাপ নেই। কিশোরী বুঝল, একটু এগিয়ে যেতেই পিসী জানাল যে বউ (কিশোরীর স্ত্রী) কেমন কেমন করছে. মানে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করছে।

'যত সব অভ্যাপাত, উয়ার আবার কী হল · ' কথাটা শুনেই ব্যাজার মুখে ফিরে এল কিশোরী, যেন ওসব কিছুই নয় এমনি ভাবে কাজে যোগ দিল, বুড়ী পিসীও চলে গেল। কিন্তু দূরে গিয়ে পিসী আর একবার ফিরে তাকাল, কিশোরীও কাজের মধ্যে মুখ তুলে দেখল। সুতরা একটু পরেই কিশোরী দোলই বলল, গণপতির দিকে না তাকিয়ে কিন্তু তাকেই লক্ষ করে, 'থালে একবার ভিটার উদিকে যেতে হয় কেনে · '

'শুনলি তোরা, কিশোর্যার কথা শুনলি। আমার কাম চলবেক কি করে···' ঢ্যাপসা, ক্রুদ্ধ স্বরে বলতে লাগল গণপতি, 'ভিটার উদিকে যেতে হয় থালে!

কেনে হবেক, না উয়ার ইস্তি কেমন করছে। বলি, করবেক আর কি, মুখে জল উঠছে, গা হলপল করছে, পুয়াতি হইছে, আর কি হবেক!'

ওর কথাগুলো শেষ হল না, সবাই হা-হা করে হেসে উঠল।

কিশোরীর বউয়ের শরীর খারাপ হয়েছিল পোয়াতি হবার জন্য নয়, পচাইদের চালানির দল সেটা শীগ্রিই বুঝতে পারল।

সিংপুকুরের পাড় বরাবর যে চওড়া কাঁচাপাকা রাস্তা, সেটা খানিকটা বেঁকে ব্রাহ্মণভুঁইয়ের জঙ্গলকে ছুঁয়েছে, তারপর জঙ্গলের পাশ দিয়ে বরাবর দক্ষিণ মুখে গিয়ে, কয়েক ক্রোশ পরে আবার পশ্চিম মুখে বেঁকে কাঁসাই নদী পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এদিকে উত্তরে গ্রামের মধ্যে সিংবাবুদের বাড়ি, তারও পরে তাদেরই অন্নপূর্ণা রাইস মিলের পাশ দিয়ে এগিয়ে রাস্তাটা মিশেছে বাঁকুড়া-খড়্গপুর পাকা রাস্তায়, সে জায়গাটাকে বলে চণ্ডীতলা। আগে একবার রাস্তাটা বাস-চলাচলের উপযোগী করে বাঁধানো শুরু হয়েছিল, এখানে-ওখানে কতকটা করে হয়েওছিল। শোনা যাচ্ছে, সরকার নাকি রাস্তাটা আবার নতুন করে তৈরি করবে।

সেই চণ্ডীতলাতেই পচাইরা মাছের ঝাঁকাগুলো নিয়ে অপেক্ষা করছিল বাসের জন্য। মাঝের সময়টাতে ওরা উৎসুক হয়ে উঠল সরকারী উদ্যোগে নির্মীয়মাণ রাডার-ডিটেকশন-টাওয়ারটার সম্বন্ধে।

জায়গাটা, রাস্তার দুধারেই, ঘন জঙ্গল আর গাছগাছালিতে মসমস করছে। এখানে ওখানে ঘেসো জমির ওপর ছড়িয়ে রয়েছে বেগুনি ছোপ দেওয়া ঝরে পড়া করঞ্জ নয়তো গোলাপি ঝালরের হিজল ফুল। মাঝে মাঝে পাতায় পাতায় বাতাসের সিরসির শব্দ, বুনো পাখিদের ডাক। কোনো গাছের নিচে, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে, কিংবা অদূরে শালবনি শহরে যাবার সময় চাষাভুষোরা কাঁধের গামছা মাটিতে ফেলে বসে পড়ে—জায়গাটার এমনি টান। বিড়ি ফোঁকে, গল্প করে।

'হঁ গ', পাতরৈব পো, এইট' কি রকম হচ্ছে বল দিকিনি···' টাওয়ারের মাথার দিকে ঘোলাটে চোখ তুলে একজন বললে, 'ই যে আশমান ছুঁয়ে ফেলাইচে গ'···'

'তা ছুঁবেক নাই! উ কাজট' যে আশমানেরই। ধর কেনে, আমাদের শত্তুরা আছে, উয়ারা আসবেক উড়া-জাহাজে করে, নিশুত রেতে। তা খপর পাবেক সব কি করে? এইট' যে যন্তর বানাইচে, উয়াতে ঠিক খপর পাবেক···'

'ধুর! তুমি বাবু কী বুল্‌চ, উই ত লুহার পাঁজরা জুড়ে জুড়ে ঢ্যাঙা তালগাছ

উঠ করাইচে, তা কি করে গন্ধ পাবেক ?'

ময়লা দাঁত বের করে হাসল লোকটা, 'এইট' তুমি ঠিক কথা বুলেছ। কুত্তাগুলা শুঁয়ে শুঁয়ে চোরডাকাতের টের পায় কি করে ?'

'হুঁ, বল কি ! উইট' কেমন ধারা বল দিকিনি...'

'বাস এসছে গ'...', 'মটর গাড়ি এসছে...'

দূরে একটা বাসের সামনেটা দেখা গেল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে একবার দেখা যাচ্ছে, আবার আড়ালে পড়ছে। পিছনে ধুলো উড়ছে টিপির মতো আকার হয়ে।

ছয়

পচাই রাস্তার ধারে তার বয়ে আনা মাছের ঝাঁকাটা অন্যদের সঙ্গে রেখে এতক্ষণ টাওয়ার-বসানো মাটির খোঁদলে নিচে নেমে পড়েছিল, যেখানে লোহার মোটা-মোটা শিক দিয়ে খাঁচার মতো পাটাতন তৈরি হচ্ছিল। খুব শক্ত করে বনিয়াদ তৈরি করছে যাতে একটুও না নড়ে। কালো পাথরের কুচি আর সিমেন্ট মেখে লোহার পেল্লায় হাঁড়ির মধ্যে ঢেলে বনবন করে ঘোরাচ্ছে, ঢালাইয়ের মশলা ওতেই ভালো মিশ খাবে। সেইটেই অবাক চোখে দেখছিল পচাই, এখন বাস আসছে সোরগোল উঠতেই তিড়িক করে লাফিয়ে ছুটে এল।

বাস-কণ্ডাক্টর ভিতরে কোনো ঝাঁকা তুলবে না, সেটা সবারই জানা। ছাদে ঝাঁকাগুলো তোলাতুলি শুরু হল। দেরি হল খানিকটা, যাত্রীরা চেঁচামেচি করে আপত্তি জানাতে লাগল। এক ভদ্রলোক জানলা দিয়ে মুখ গলিয়ে বলে উঠল, 'যত সব ন্যুইস্যান্স...এই কণ্ডাক্টর, তুমি এসব মাছ তুলতে পার না, এর জন্য ওরা পাব্‌লিক ক্যারিয়ার ভাড়া করবে...' কণ্ডাক্টর মেছোদের সঙ্গে কথাবার্তায় এত মগ্ন ছিল যে কথাগুলো তার কানে গেল না।

গেল না পচাইয়ের কানেও। কাঠবেড়ালি যেমন করে গাছে ওঠে, তেমনি করে ছাদে উঠে গিয়েছিল ও। মাছের একটা ঝাঁকা ধাক্কা লেগে খুলে গিয়েছিল, শালপাতার অনেকগুলোই গিয়েছিল পড়ে, বাস চলতে শুরু করেছিল বলে সেগুলো আর কুড়ানোও হল না। পচাই একটা গান হেঁকে দিল, 'কাদের কুলের বউ গ' তুমি কাদের কুলের বউ...'

ছাদে তার সহযাত্রীরা মজা পেয়ে বাহবা দিয়ে উঠল। গাছের ঝুঁকে পড়া ডালের নিচে দিয়ে যাবার সময় মাথা নিচু করছে সবাই, পচাইয়ের গানের লহর

তখন উঁচুতে উঠছে। সেই সঙ্গে আরো একটা কাজ করছিল ও, ঝাঁকার গাদাকরা মাছগুলোর মাথায়, যেন তাল দিচ্ছে, তেমনি করে থাবড়াচ্ছিল। মাছগুলো মরে গেছে, চোখগুলো ড্যাবাড্যাবা। পচাই দু-একটার চোখে গানের তালে খোঁচা দিলে, একটায় এত জোরে যে রক্ত বেরোল একটুখানি।

কিন্তু একটু যেতে না যেতেই বাসটা ঝাঁকানি দিয়ে থেমে গেল। এত শীগ্রি থামার কথা নয়। দু-একজন গেঁয়ো লোক মাঝরাস্তাতে এসেই দাঁড়িয়ে পড়েছে, দু'হাত নেড়ে থামাতে চাইছে বাসটা। কী ব্যাপার?—না, কাকে যেন বয়ে এনেছে একটা খাটিয়ায় করে।

তৎক্ষণাৎ চিনতে পারল পচাই। হেঁকে বললে, 'কী হইচে, কিশোরী কাকা, ও ঠাকুমা, কী হইচে?...'

কিশোরীর সেই পিসীও সঙ্গে ছিল। পচাই নেমে এল ছাদ থেকে। তার মনে পড়ল, কিশোরী তখন সিংপুকুরের পাড় থেকে চলে গিয়েছিল।

কিশোরীর সঙ্গীরা যখন কণ্ডাক্টর থেকে বাসযাত্রী সবারই হাতেপায়ে ধরছিল শবাকার কিশোরীর বউকে বাসে তুলে নেবার জন্য, আর কিশোরীর পিসী হাউহাউ করে কাঁদছিল, পচাই গিয়ে বুড়ির হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললে, 'কী হইচে, ঠাকুমা, কী হইচে কাকীর?' একথা অন্যরাও জিজ্ঞেস করছিল। সবাই সবাইকে।

কিশোরীর পিসীর টুকরো টুকরো কথা, আর অন্যদের জবানিতে যা উদ্ধার করা গেল, তা হচ্ছে এই রকম। কিশোরীর বউ তাদের শোবার ঘরের দেয়ালে গোবর-মাটি লেপে ন্যাতা দিচ্ছিল। বোধহয় একটা ছোট গর্ত ছিল, একসময় কী একটা ওর আঙুলে খাপুচ্ করে ধরেই ছেড়ে দিয়েছিল। কাজ সেরে বাইরে আসতে প্রথমে সেই আঙুলটা, তারপর সমস্ত হাতখানা জ্বলতে থাকে। তারপর পিসশাশুড়ীকে ডেকে বলে যে তার মাথাটা ঘুরছে, গা কেমন কর্ছে। তারপর অজ্ঞান হয়ে যায়। যারা জানে তারা এসে বললে, বউটার সাপকাটি হয়েছে, নির্ঘাত বোড়া সাপে ছুব্‌লেছে।

এখন কিশোরী আর তার সঙ্গীদের প্রার্থনা যে মেয়েটাকে বাসে তুলে নেওয়া হোক, শালবনি শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাবে। বাসের যাত্রীরা স্পষ্টত দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এক দলের আপত্তি, মড়া তুলতে দেবে না, ধরে নিয়েছিল যে বউটা মরে গেছে, অন্যরা বললে, একটা মানুষকে মরতে ফেলে রেখে যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়।

শেষ পর্যন্ত বউটাকে ওঠানো হল। ভর্তি বাসের মেঝেটা ওরই মধ্যে খালি

হল কতকটা, মানে, নামল না কেউ, কিন্তু ছোঁয়া বাঁচাবার জন্য ঠেলাঠেলি করে সরে গেল। যে ভদ্রলোক মাছের ঝাঁকা ওঠানোয় আপত্তি করেছিল, সে ভিড়ের পিছন থেকে উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করলে, 'আছে, না গেছে?'

চারদিকে বসা-দাঁড়ানো লোকগুলোর চোখ সব মেয়েটার ওপর। বউটা কম-বয়সী, স্বাস্থ্যও নেহাত খারাপ নয়। এসব মেয়েদের জামা অন্তর্বাস থাকে না, লাল চওড়াপাড় আড়ময়লা শাড়ি পরনে, যে হাতটাতে কামড়েছে, তাতে শুকিয়ে-ওঠা গোবরমাটি এখনো লেগে আছে, কেউ ধুইয়ে দেয়নি। মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়-মাকড় হয়ে গেছে, সিঁথিতে সিঁদুর। চোখ দুটো বোজা, কিন্তু মুখটা একটু খোলা। কিশোরীর পিসী আঁচলটা টেনেটুনে মাথার ওপর ঢেকে দিলে।

এক বৃদ্ধ লাঠির ওপর ভর দিয়ে বাসের পিছনের সিটে বসেছিল। সেই ভদ্রলোকের কথার উত্তরে বললে, দন্তহীন স্বরে, 'সাপকাটি কিনা, অনেকক্ষণ পবানি থাকে। উয়ার যদি পরমাউ থাকে, থালে বাঁচি যাবেক…।'

সাত

চাঁদসোল গ্রাম আর আড়াইক্রোশী মাঠ পাশাপাশি বিছানো বলে, গ্রামের অনেক রাস্তা গিয়ে পড়েছে মাঠে। গ্রামটার মাঝামাঝি জায়গায় এই রকম একটা চওড়া রাস্তা, মাঠে পড়বার মুখে বাঁদিকে বেশ বড় একটা হিজল গাছ, আর ডানদিকে দুটো পাকুড় গাছ জড়াজড়ি করে রয়েছে। তারই সামনে একটা জমিতে মোহন লাঙল ঠেলছিল।

পচাইদের পাড়াতেই মোহনের ঘর, সে গাজন দুলের শালীর ছেলে। বেশ কিছুদিন হল মোহন তার ঘরে আছে। বুড়ো গাজনের বউয়ের ছেলেপিলে ছিল না, এই মাস দেড়েক আগে তারও কাল হয়েছে, এখন মোহনই তার ঘর আর এই বিঘা চারেক জমির মালিক।

সকাল বেলায় মাঠে নেমেই কাজ শুরু করেছিল মোহন। মাঠের ওপর এ গ্রাম ও গ্রাম বা জঙ্গলের দিকে লোক যাতায়াত করছে, সেটাও চোখে পড়ছিল। সিংপুকুরের জায়গাটা থেকে বেশ খানিকটা দূরে, তবু লোকজনের জড়ো হওয়া, চিল ওড়া, মাছ ধরা শেষ করে লোকজনের ফিরে যাওয়া লক্ষ করছিল সে। এক সময় গরুগুলোকে লাঙলে জুতে রেখেই সে কোথায়, বোধহয় গ্রামের মধ্যেই কোনো দরকারে চলে গিয়েছিল।

তার অনুপস্থিতিতে শামলী এসেছিল তার জলখাবার নিয়ে। হাতে ছোট একটা কলসীতে জল আর গামছাব খুঁটে কোঁচাখানেক মুড়ি বেঁধে। মোহনকে দেখতে না পেয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে মাথা নেড়েছিল শামলী, যেন কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছে সেইভাবে, তারপর সেও চলে গিয়েছিল।

একটু আগে মোহন ফিরে এসে আবার কাজ আরম্ভ করেছে। বেলা আর কত হয়েছে, প্রহর দেডেক হবে, এর মধ্যেই মোহন খুব ক্লান্ত হয়ে পডেছে। বেলা যখন দু'পর পেরোবে, সূর্য উঠবে মাথার ওপর, তখন মোহনেব ছুটি।

দুটো লোক এসে জমির পাশে যেখানে উঁচু ডাঙায় পাকুড গাছ দুটো ছায়া ফেলেছিল, সেখানে বসেছে। চাঁদসোলের ভিতর দিকে সাঁওতাল পাড়া থেকে এসেছিল বনা, বনমালী টুডু, তার মা লুসকি ওদের মোডল। তাছাড়া কিছু তুকতাক, ওষুদ-নিদেন জানে বলে গাঁয়ের অন্য সম্প্রদাযেব লোকেরাও বুডিকে মান্যি করে। অন্য জন মথুর কৌডি, সদ্‌গোপ, গ্রামেব সব মনিষ্যি বেশ সমীহ করে ওকে।

দু'দিক থেকে এল দু'জন, নিজেদের মধ্যে আর মোহনের সঙ্গেও এটা-ওটা কথা বলতে লাগল।

বনা টুডু বেশ জোয়ান, মোহনেব থেকে বছর দুই-তিনেব বড হবে, কালো নিকষ চেহারা, বাব্‌রি চুল, গায়ে গেঞ্জি, পরনে খাটো ধুতি। সে একটা বেতের ডগা ছুলছিল ছুরিতে করে, তীর তৈরির জন্য। এরা আদিম শিকারী জাত, এদের পূর্বপুরুষেরা যুদ্ধও করেছে। বুনো শুযোর, পাখি, কাঠবিডালি, ইঁদুর, গোসাপ এই সব শিকার করা ছাডেনি এরা এখনো। বনেবাদাডে ঘুবে বেড়ানো এদের রক্তের মধ্যেই আছে।

সে কাজের থেকে মুখ তুলে বেত সমেত বাঁ হাতখানা মাঠের দিকে বাডিয়ে বললে, 'উই সবকে লদী-লালা হইচে, ত ই দিয়ে কী ফলাবি তুরা? আর গিইচে ই লালা কত দূরে···বড লদীতে মিশচে, লয়?'

সরকার এই মাঠগুলোকে দো-ফসলী করবার চেষ্টা করছিল। গ্রাম-মাঠ-বনের মধ্য দিয়ে নালা কাটা হচ্ছিল, নদী থেকে জল এনে সেচের ব্যবস্থা করার জন্য। বনা সেই নালাগুলোর কথাই বলছিল।

মথুর কৌড়ি বিড়ি ফোঁকার মাঝখানে বললে, 'হুঁ···' তার চোখ ছিল মাঠের ওপব, মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলের দিকেও।

মথুরের বয়স হয়েছে, কিন্তু বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। বলে ওদের পূর্বপুরুষ বাজপুত। গায়ে ফতুয়া, ধুতিটা মাল্‌কোঁচা হাঁটুর নিচে নেমেছে, কাঁধের ওপর একটা
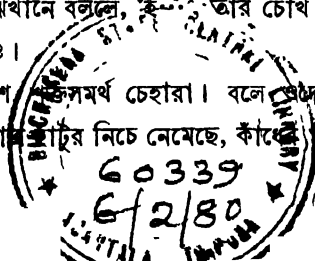
তোয়ালে ফেলা। বাঁ হাতে কোমরের কাছটা চুলকে বললে, 'ওই লালাট' গেছে বামনভুঁইয়ের জঙ্গলের পাশ দিয়ে, কাঁসাই লদীতে পড়েছে! আর কত দিকে যে গেছে, তুমি সাম্‌তালের পো যদি ইদিকে যেতে লাগলে, কিছুট' গেলে ত আর একট' উদিকে বেরোয় গেল আড়াআড়ি করে, ছুট এখন তুমি সিদিকে। লদীর জল ঠিক চলে যাবেক সব জায়গায়, তুমারগে ই হচ্ছে ঠিক লরদেহের রক্তলালীর মতন, পা থিকে মাথা সব জাগায় ঠিক রক্ত বইছে...'

হঠাৎ লাঙল-ঠেলা মোহনের দিকে চোখ পড়ল ওর, ভুরু কুঁচকে উঠল, 'বলি অ মহন, তুমার গে লাঙলের বঁটাট' আর একটুন চিপে ধর, বাবা, মাটি যে ফঁড়ছে নাই হঁ হঁ, কী রকম জান, বঁটার উপরে তুমি যেমন ঝুলে পড়লে আর কি, আর ডাইনে বাঁয়ে হেলে দু'ট' তুমাকে টেনে লি'গেল - হঁ, ইবারট' হইছে, লাও, ঘুরাও ইবার · কালাট'র ল্যাজটা মুড় '

হঠাৎ খিলখিল শব্দে চকিত হয়ে উঠল ওরা সবাই, শাম্‌লী কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে খানিকটা সামলে নিয়ে বলতে আরম্ভ করল, 'অ জ্যাঠা তুমি বুললে বটে, মহন লাঙল চিপে ধরবেক! বলে,

'গায়ে কত জোরাজোরি,

দখ্‌নে বায়ে উল্‌টে পড়ি ..'

শাম্‌লী আবার ঝুঁকে পড়ে কোমর চেপে হাসতে লাগল, হেসে উঠল এরাও। মথুর বললে, 'তুই বিটী ত ছড়া কাটছিস ভাল, আর একট' লাগা দিকি...'

ওদের তিন জনেরই চোখ এখন মোহনের লাঙলের ফলার দিকে। শুকনো, শক্ত মাটি চাড় খেয়ে উঠছে, মাটির ঢেলা দু'দিকে উলটে পড়ছে। লাঙলটা যখন ঘুরে আসবে তখন আর একটা জোল তৈরি হবে। উল্টে-পড়া ঢেলাগুলোর গায়ে গেল-বছরের কাটা ফসলের খুঁচি। এরা বলে, মাটি এই রকম উল্টে-পাল্টে দিলে রোদ থেকে তেজ শুষে নেবে, রেগে টং হয়ে থাকবে। বর্ষায় মেঘ থেকে জল পড়লে মাটি ফঁসর-ফঁসর করে উঠবে। তার পর গলে কাদা। সেই কাদা তৈরি এক মহা ঝামেলার কাজ। তারপর ধানের চারা রোয়ার পালা আসবে।

মোহনের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে শাম্‌লী বলে উঠল—এখন সে হাসছিল না, 'মহন কি চাষা লোক যে লাঙল ঠিলবেক...তুমরা বুলছ বটে!'

বনা ছুরিটা মাটির ওপর রেখে বলল, 'কেনে, মহন চাষা লুক লয়ত কি?'

'হঁ, চাষা লোক বটকি ' মথুর মাতব্বরের মতো কতকটা মীমাংসার ভঙ্গিতে বললে, 'কেনে গ', মহন গাজন ঢুলের শালীর বেটা, কিন্তু চাষীর কাম করছে, চাষী বটে...'

শাম্‌লীর মুখের ভাব বদ্‌লাচ্ছিল, মুখ মুড়ে বললে, 'কে জানে বাবু, কে উয়াকে দেখেছে আগে! চাষা লোক, নাকি, লিখাপড়া বাবু লোক, কে জানে '

যাকে নিয়ে বিতর্ক সেই মোহন চকিতে একবার শাম্‌লীর দিকে তাকিয়েই নিজের কাজে মন দিলে, বাঁ পা দিয়ে লাঙলের ফলায় জড়িয়ে যাওয়া মাটিটা খসিয়ে দিতে চাইল।

'দেখলে ত জ্যাঠা, মহন পারল মাটি ছাড়াতে ফাল থিকে? চাষা আবার এক পায়ে টাল উল্টে পড়ে না কি। আর উয়ার মুখট' দেখেচ·· এই দু'ফর হতে না হতেই চাষার ছেলের মুখ বেগুন-পড়া হয়, বল তুমরা! '

মোহনের মুখ আর দেহের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, শাম্‌লীর কথাগুলো তাকে বোল্‌তার মতো বিঁধ্‌ছে। জ্বালা করছে, কিন্তু মোহন তারও বেশি সচেতন হল কাজের দিকে, লাঙল ঠেলায় কোথায় কোথায় ওব ত্রুটি ঘটছে সব ঠিক বুঝতে পারল না, কিন্তু শাম্‌লী অন্তত যে দোষগুলোব কথা বলেছে, সেগুলো যাতে না হয় তার চেষ্টা করতে লাগল।

ওর থেকে সবার মনোযোগটা এড়াবার জন্যই বোধ হয় ও বলে উঠল, সেই সাঁওতাল যুবককে উদ্দেশ করে, 'বনাদা, হল তুমার তীর বাগানা? তুমার কাঁড়ট' রাখ দিকি, টোক করব···'

'তা কর কেনে। লাঙল ছাড, তবে ত করবে।'

'হঁ, এই ত হয়ে গেল, থামি' যাও একটুন · '

হঠাৎ বনমালীর পাশ থেকে মথুর কৌডি লাফ দিয়ে উঠল, চোখের ওপর হাতের আড়াল দিয়ে দূরে মাঠের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'সামতালের পো, দেখ দিকিন, আমাদের লালীট' লয়?'

বনা উঠে না দাঁড়িয়েই দেখল, দুটো গরু লেজ তুলে মাঠ পেরিয়ে ছুটছে। কিছুটা ছোটার পর এক জায়গায় থেমে ঘুরছে এলোমেলো। ভাবে, গতিটা জঙ্গলের দিকে। বনা কিছু বলার আগেই শাম্‌লী বলে উঠ্‌ল, 'হঁ-হঁ, তুমাদেরই ত গরু · '

মথুরের শোনার অপেক্ষা ছিল না, সে তখন ছুট লাগিয়েছে, 'লালী-ই-ই ' হাঁক দিতে দিতে। বুড়ো মানুষটা অমন ছুটতে পারে কে ভাবতে পারত। এক এক খণ্ড জমি এক দমে পার হয়ে আলের ওপর ধাক্কা মেরে টাল নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে, আবার ছুটছে। ওই গরু দুটোর ছুটের বাতাস যেন তাকেও পেয়েছে।

অনেকটা ছুটে লালীকে আটকাতে পারল ও, গলান দড়িটা ধরে ফেলল। গোঁ ধরে দাঁড়াল লালী, পা দুটো ফাঁক করে পিছন দিকে টেনে ধরল। মথুরের পাঁজরা দুটো হাপরের মতো ওঠা-নামা করছিল। প্রথমেই গরুটার গালে ও একটা থাপ্পড

কষাল, তারপর টান দিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, 'লালীর ঝি লালী, বাই উঠেছে, সাম্‌লাতে পারছিস নাই…'

'হঁ গ, কৌড়িদাদা, কী হইচে, লালী আবার দড়ি ছিঁড়েচে?'

মেয়েটা সন্তী, অল্প বয়সের বিধবা, জঙ্গলে কাঠ ভাঙতে গিয়েও না ঢুকে ফিরে এসেছিল। তাকে লক্ষ না করেই মথুর বললে, 'হঁ, দেখ না, লালীকে এত খাআই-দাআই, তবু উয়ার মন উঠে নাই। হঁ, উইট' কাদের গরু বল দিকিনি…' অন্য যে গরুটা লালীর সঙ্গে ছুটেছিল সেটা তখন আরো একটু দূরে চলে গেছে।

সন্তী সেদিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল, 'কি জানি, কাদের গরু!'

লালীকে টেনে আনতে লাগল মথুর, সন্তী উপযাচক হয়ে পিছন থেকে তাড়াতে লাগল। এখন মথুর জিজ্ঞেস করল, 'তোরা জঙ্গলে যাস নাই? তুর মুখট' অমন হাঁড়িপানা কেনে, তুর মাথায় কাঠের বঝা কুথা?'

এই কথায় ভীত চকিতের মতো পিছনে জঙ্গলটার দিকে তাকাল সন্তী, ফিসফিস করে বললে, 'আজ জঙ্গলে ঢুকলম নাই, সিপাই এস্‌চে, সিপাই, পুলিশ…'

'তাই বলে খালি মাথায় ফিরে এলি, বলিস কি…' তারপর পরিহাসতরল কণ্ঠে বলে উঠল মথুর, 'পুলিশ এস্‌চে ত সে রোজই আসে! তুদের মতন ছুঁড়িগুলাকে দেখলে পুলিশ ত গা ঘেঁষে আসবেক…তাই বলে তুরা বনে ঢুকবি নাই?'

'তুমার এক কথা, কৌড়ি দাদা…' সন্তী যেন একটু হাসল, কিন্তু শঙ্কিত, গাঢ় স্বরে বললে, 'না গ', দাদা, মস্করা লয়। ই বন-পুলিশ লয়… দু'ট' টেরাক্‌ (ট্রাক) বনের পাশ দিয়ে দিয়ে চক্কর দিতে লাগল, তারপর অম্‌নে চলে গেল, বড় রাস্তার দিকে…'

এখন মথুরের উদ্বিগ্ন হবার পালা, ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'বলিস কি! আম (আর্ম্‌ড) পুলিশ না কি রে! কী রকম পোশাক বল দিকি, হাতিয়ার দেখলি কী রকম…'

'কী রকম দেখব আর! আমার মাথা কি ঠিক আছে, উসব দেখে আমার মাথা ঘুরতে নেগেচে…ঢ্যাঙা তালগাছের মত জুয়ান, গঁপ পাকাইচে কানের তক…'

'বলিস কি, ই যে সাংঘাতিক! ঘুরুনে উঠল থালে…এ্যাঁ!'

কৌতূহল আর উত্তেজনায় জঙ্গলের দিকটায় তাকাল মথুর কৌড়ি, তারপর লালীকে টানতে টানতে গ্রামের দিকে এগোল।

আট

এদিকে মোহনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছিনে জোঁকের মতো দাঁড়িয়ে রইল শাম্‌লী। বনা সাঁওতাল চলে গিয়েছিল। মোহন গরুগুলো ছেড়ে লাঙলটা কাঁধে তুলে নিলে, জোয়ালটা লাঙলের বোঁটায় ঝুলিয়ে। শাম্‌লীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াল না যে মোহনের কাঁধ বেঁকে পড়েছে, পা দুটো একটু নড়বড়ে। কিন্তু কেন যেন সে নিয়ে শাম্‌লী এখন আর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল না। মোহনের পিছু পিছু আসছিল। মোহন এমনিতেই কম কথা বলে, এখন দু'জনেই চুপচাপ।

কিছুটা এগিয়েই শাম্‌লী বললে, একটা পুকুরের কাছাকাছি এসে, 'এখেনে গাছতলায় একটুন বস কেনে, তুমার জলখাবার লি' এসি · '

মোহন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। শাম্‌লীর দৃষ্টির সামনে সব সময়েই ওর মনে হয় কোথায় যেন ওর ত্রুটি ঘটছে, এই যে সে লাঙল কাঁধে গরুগুলোকে তাড়িয়ে আনছিল নিশ্চয়ই তার মধ্যে কোথাও একটা বেখাপ্পা কিছু ঘটছিল। আর, সত্যি কথা বলতে কি, এই ভারী লাঙল-জোয়াল ওর পক্ষে একটানা বয়ে নিয়ে যাওয়া কষ্টকরও হচ্ছিল। ও ভারটা নামাতে নামাতে বললে, 'জলখাবার আছে কুথা, তুমাদের ঘরে ?'

এখন, মোহনের সংসার খুব অগোছালো। গাজন দুলের স্ত্রী আর তারপর সে নিজে মারা যাবার পর মোহন হয়েছে একেবারে একলা। নিজেই রেঁধে খেত সে। গাজনের খুড়তুত ভাই সুজন মুনিষ মাহিন্দারের কাজ করে, তার নিজের জমি নাই। তার বউ লখী যদিও মোহনের থেকে মাত্র বছর তিন চারেকের বড় আর তার কোলে ছেলে আছে, তবু সে-ই এখন মাঝে-মধ্যে রেঁধে দেয়, গৃহিণীপনা করে। মোহন তাকে খুড়ি বলে ডাকে।

শাম্‌লী মোহনের পিছনে লাগলে কি হবে, সেই সকালবেলাতেই লক্ষ করেছিল, মোহন তার জলখাবার না নিয়েই মাঠে যাচ্ছে। তাই লখী খুড়িকে বলে নিজেই বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। মোহনের কথার উত্তরে বললে, 'হঁ, তাই ত এনে রাখলম। জলখাবার বেলায় ত লি'গেছলম মাঠে, ত্যাখন তুমি ছিলে নাই…' বলতে বলতে ওর গলায় মোড়লি করবার উৎসাহ ফুটে উঠল, 'হঁ গ', গিছ্‌লে কুথা ? জুতা লাঙল ফেলে রেখে চাষী চলে যায়, এমনধারা ত দেখি নাই…'

'ছিল, কাম ছিল…' আবার শঙ্কিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল মোহন, কিন্তু বললে, যেন কথা ঘুরোচ্ছে, 'তুমাদের পচাই গেল কুথা? সিংবাবুদের মাছ চালানিএ?'

'উয়ার সঙ্গে তুমার দেখা হইছিল?'

'হুঁ, আমাকে ডাকল, দু'ট' কথাও বললম, একটু জিরানাও হল। তা যাও কেনে, মুড়ি এনে দাও…'

শাম্লী গেল, কিন্তু স্পষ্টতই সে সংশয়িত, 'কি জানি, বাবু, তুমাদের মতিগতি বুঝি নাই। এক ফঁটা পচাই, তার সঙ্গে তুমার কী কথা!'

শাম্লী চলে যাবার পর কিছুক্ষণ নিঃঝুমের মতো বসে রইল মোহন। কোমর থেকে গামছাটা খুলে প্রথমে মুখ, তারপর ঘাড় পিঠ মুছল। গরু দুটো নিজের থেকেই পুকুরে জলের ধারে নেমে গিয়ে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে জল খেল, তারপর পাড়ের কোল বরাবর মুচ্‌মুচ্‌ করে ঘাস ছিঁড়ে খেতে লাগল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মোহন অন্যমনস্ক এবং ওর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল।

কিন্তু এ ভাবটা বেশিক্ষণ রাখতে পারল না মোহন, শাম্লী ছোট্ট একটা কলসীতে জল আর গামছায় বাঁধা মুড়ি নিয়ে এল। ওই কলসীর জলেই মুখ হাত ধুয়ে গামছার খুঁট খুলে কোঁচড়ের মতো করে নিল মোহন, তারপর খেতে আরম্ভ করল।

'উয়ার ভিত্‌রে পিঁয়াজ আছে, বার করে লাও…' শাম্লী বললে।

মোহন একটু হাসল, তখনকার কথা ফিরিয়ে দেবার মতো করে বললে, 'এক ফঁটা পচাইয়ের সঙ্গে কথা বলি, তার দিদির সঙ্গেও বলি…'

শাম্লীও হাসল, ও একটু দূরে বসে পড়েছিল, 'বল আর কুথা? তুমি ত বললে নাই পচাইয়ের কাছে কেন গেছলে?'

'আর তুমি যে জলখাবার আনলে, আমাকে না দেখে চলে গেলে, কুথা গেছলে বললে নাই ত!'

'বুলব নাই কেনে, সে এক বিত্তান্ত…'

হঠাৎ কী হল শাম্লীর, মুখে কাপড় চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। পাতলা, লম্বা শরীরটা দুলে দুলে উঠতে লাগল যেন, বললে, 'বিয়া দেখতে গেছলম, বউ ঘরে ঢুকল, তাই…' বলে ও আবার হেসে গড়িয়ে পড়ল।

ওরা বসেছিল একটা করঞ্জ গাছের তলায়। চার দিকের কড়া রোদের মাঝখানে এখানকার ছায়াটা বেশ স্নিগ্ধ। শাদার ওপর বেগ্‌নি ছোপ দেওয়া

ছোট ছোট ফুল ওপর থেকে ঝরে পড়ছিল। তলাটা ঝরা ফুল আর পাতায় ছেয়ে গিয়েছিল, কয়েকটা ফুল পড়ল শাম্‌লীর ঝাঁপ্‌ড়ি-চুল মাথায়।

হাসিটা একটু সামলে শাম্‌লী বলতে লাগল, 'অমন বিয়া দেখি নাই, বাবু, জন্মে···আচ্ছা, মহন, বিয়াতে পাঁঠা বলি দেয়? উই যে গ', উ পাড়ার পঁড়া বাবু, তাদের বড় বেটার বিয়া!'

শাম্‌লী যে ঘটনায় কৌতুকবোধ করছিল আর আশ্চর্যও হয়েছিল, সেটা ছিল এই রকম। বর বিয়ে করে পাল্‌কীতে করে বউ আনছে, পাড়া ঝেঁটিয়ে সবাই যেমন যায়, শাম্‌লীও তেমনি ছুটেছিল। পাল্‌কী ঘরের দরজায় নামাতে না নামাতেই সব গিয়ে ছেঁকে ধরল চার দিকে। কিন্তু শাম্‌লী যা ভেবেছিল, শাঁখ বাজিয়ে তখ্‌নি বউ বরণ করে ঘরে নিল না। একটা গলায় দড়ি বাঁধা ছোট পাঁঠাকে টানতে টানতে নিয়ে এল, ছাগলটার সে কী প্যা-প্যা ডাক—শাম্‌লী বলতে গিয়ে কতকটা নকল করে ফেলল। বর-বউ রইল দাঁড়িয়ে, আর তাদের সামনে ছাগলটাকে এক কোপে দু'ফালি করল। ফিন্‌কি দিয়ে সে কী রক্ত! সরে গেল দূরে সবাই, আর রক্তটা গড়িয়ে গড়িয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে লাগল। তারপর হল কি, সেই রক্তের ওপর পা ফেলে ফেলে বর-বউ ঘরে ঢুকল। তারপরে বরণ-টরণ হল সব। শাম্‌লী শেষে বললে, 'উই দিয়ে নাকি বউভাতের ভোজ হবেক·'

'বেশ কাণ্ড ত···' মোহন বললে। হঠাৎ সোজা শাম্‌লীর চোখের দিকে তাকিয়ে যোগ করল, 'তুমার যখন বিয়া হবেক, তখন অম্‌নি রক্তে পা ডুবি' ঘর ঢুকতে হবেক।'

'দূর, ঘেন্না ··' মুখ মুড়ে শাম্‌লী বললে।

মোহনের খাওয়া হলে কলসীটা নিয়ে চলে যাচ্ছিল ও। হঠাৎ ফিরে বললে, 'তুমার যদি হয় ত আমারও হবেক ··' বলে ও ছুটতে আরম্ভ করল এবং একটু পরেই পুকুরের ওপারে নিজেদের ঘরে ঢুকে গেল।

নয়

ভর দুপুর গড়িয়ে চলেছে। যে মাঠটা থেকে মোহন চাষ ছেড়ে চলে এল, সেটার মূর্তি এখন আগুনের হলকার মতো। মাঠটার প্রসার খুব। ওর পশ্চিম বরাবর ব্রাহ্মণভুঁই জঙ্গলের সারি চলে গেছে, দূরে গাছপালা ঠিক বোঝা

যায় না, যেন মনে হয় আগুনে ভাটার ওপর কাঁচা, আধ-শুকনো কাঠ চাপিয়ে দিয়েছে। উঁচু-নিচু মাঠটার এখানে ওখানে দু'একটা খেজুর, তাল ছাড়া ছাড়া ভাবে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে। এক একটা গাছের মাথার ওপর চিল উড়ে উড়ে ঘুরছে, আবার নিচে নেমে আসছে। আরও উঁচুতে বিন্দুর মতো শকুনি ভেসে রয়েছে। মাঠের মধ্যে এখন গরু-বাছুর নেই, সকালের দিকে যেগুলো চরবার বা চষার জন্যে এসেছিল, সেগুলো ফিরে গেছে।

এই মাঠটা অন্তত প্রহর খানেকের মতো এমনি করে জ্বলতে থাকবে। বেশিক্ষণ তাকানো যায় না, এখানকার লোকেরা বলে খা-খা করতে থাকে। শুকনো পাতা ধুলোর ঘূর্ণি ওঠে, এখানে ওখানে পাক দিয়ে এগোতে এগোতে মিলিয়ে যায়। সমস্ত মাঠটা তখন যেন শূন্য স্বয়ম্ভর মতো হয়ে যায়, আপন মনে শ্বসতে থাকে।

বেলা গড়িয়ে আসে, মাঠটার মর্জিও বদলায়। রোদের তীক্ষ্ণতা তখনও আছে, কিন্তু সেই পোড়ানো তেজটা নেই। আবার দু'একটা প্রাণীর সাক্ষাৎ মিলতে থাকে। সিংপুকুরের কোণ থেকে একটা লোক ছাতা মাথায় দিয়ে মাঠ বরাবর পাড়ি দিতে থাকে, অন্য কোনো গ্রামে যাবে। জঙ্গলের দিক থেকে চার পাঁচটা মেয়ে মাথায় কাঠের বোঝা নিয়ে এদিকে আসছে দেখা যায়। সন্তারা যে মিলিটারির দেখা পেয়েছিল, বোধহয় ওরা তাদের সামনে পড়েনি।

তারপর আরো বেলা যায়। মাঠটার ওপর আবছা নেমে আসে। যে মাঠটা দুপুরে ক্ষেপে গিয়েছিল, ক্রোধে লেলিহান শুকনো জিহ্বায়, সে যেন এখন স্তব্ধ হয়ে আধবোজা চোখে কেমন তাকিয়ে রয়েছে, সামনেই রাত্রি আসছে, যেন শিকারের দিকে তন্ময় হবার চেষ্টা করছে।

চাদসোল গ্রামের ভিতরে ঠিক এরকমটা নয়। উপরে আকাশে ধূসর ছায়া ঘনিয়ে আসতে থাকলেও তার নিচে মানুষগুলোর জীবন বিচিত্রধারায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

বর্ষীয়সী মেয়েরা এখন যার ঘরে যেমন জুটেছে সারা দিনমানের পর তাই দিয়ে পাকের আয়োজন করছে। বাচ্চা খাঁদিরা আর কচি বউরা পুকুরঘাট আর কলতলা করছে জলের জন্যে। পুরুষদেরও নানারকম কাজ, কেউ যাচ্ছে সওদা করতে, কেউ উঠোনে বসে মাছ ধরার পাং ঝোপো তৈরি করছে। কেউ তকলিতে সুতো কাটতে কাটতে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছে, চলে যাচ্ছে সিংবাবুদের ধানভানা কল পর্যন্ত।

সেই সিংবাবুদের দিঘিতে—যেখানে আজ সকালে মাছ ধরা হয়েছিল—শামলী গিয়েছিল গুগলি তুলতে। পুকুরের কোলে এখন খানিকটা অন্ধকার নেমে এসেছে। জলটা এখনো ঘোলা, আরো দু'তিন দিন লাগবে পরিষ্কার হতে। পাড়ের নিচে জলের রেখা বরাবর শাক লতাপাতা সব উলটানো, যুদ্ধের পর মৃতের পড়ে থাকার মতো।

পুকুরটায় কেউ কোথাও নেই। শামলী একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিক দেখে নিয়ে খোলের মধ্যে নেমে পড়ল, সে জানতে পারল না আর একজন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ করছে। যেখানে যেখানে জাল নামিয়েছিল, সেখানে গুগলি পড়ে থাকার কথা। কিন্তু নেই একটাও, বোধ হয় আগেই ওরা এসে নিয়ে গেছে। 'ভাগাড় পড়ল, শকুনিও জুটল···' বিড়বিড় করে প্রতিদ্বন্দ্বী কুড়ুনিদের উদ্দেশ্যে বলে উঠল সে। ততক্ষণ খাটো শাড়িটা আর একটু তুলে কোঁচড় বানিয়ে গুগলি তুলতে আরম্ভ করল।

একটু পরেই গাছের আড়াল থেকে সুড়ুৎ করে তারক হালদার বেরিয়ে এল। নিজের মনেই পাড় বরাবর যেন মাটির থেকে ঝিনুকের খোলা না কী কুড়িয়ে নিচ্ছে এমনিভাবে এগিয়ে আসতে লাগল। তারপর হঠাৎ যেন শামলীকে দেখতে পেয়েছে এমনিভাবে বলে উঠল, 'আরে তুই! কী করছিস··' উত্তর না পেয়ে আবার মোলায়েম স্বরে বললে, 'গুগলি তুলছিস? ছ্যা. তোদের যেমন! হঁ রে, গুগলি তোরা খাস কী করে··'

বুকের ভিতর ঢিপঢিপ করতে লাগল শামলীর, একেবারে কাছে এসে পড়েছে। লোকটার মতলব ভালো করেই বোঝে শামলী, পাড়ায়-বেপাড়ায় ওর কথা কে না জানে। লোকটা তার পিছনে লেগেই রয়েছে। চারদিকে তরল, কাঁপা-কাঁপা চোখে তাকিয়ে দেখল শামলী কেউ কোথাও নেই। জিবের তলাটা আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছে যেন কেউ, হাতের কাজ থেমে গিয়েছে।

তারক অদূরে পাড়ের ওপর বসল। শাড়িটা উঁচু করে কোঁচড় বানিয়েছে শামলী, কচি কলাগাছের মতো উরুর খানিকটা দেখা যাচ্ছিল, তারকের চোখ সেই দিকে। বললে, 'এত দুঃখু-কষ্ট করিস কেনে, শামলী, সিংবাবুদের উখেনে কাম করতে লেগে যা না। তোর কথা বাবুকে বলছিলম, বলে, লোক কী হবেক! তা আমি তোর কাম ঠিক করে দিব। তোর মা কাম করে উখেনে, তুইও ত যাস যখন তখন আমি বলছিলম কি, দিনরাত খাইদাই কামে লেগে যা, তোর থাকার একটা ভাল ঘর ঠিক করে দিব, কত্তবার বলেছি তোকে!'

প্রাণপণে ঢোক গিলল শাম্‌লী, জড়ানো জিবটা কেজো করতে পারল যেন, অস্বাভাবিক স্বরে চেঁচিয়ে বলল, 'আমি কাম করব নাই ত তুমার কি, তুমি অইখনে বস্‌লা কেনে কও·· ' ভয়ে ক্রোধে শাম্‌লীর চোখ পাকিয়ে উঠতে লাগল।

'আচ্ছা, বেশ, সিংবাবুদের বাড়ি যদি কাম না করবি ত আমার ঘরে কর কেনে। আমার ঘরে মাগছেলে নাই, তোরই দুর্নাম হবে তাই উ কথা বলছিলম। তা লেগে যা আমার ঘরে, লোকে কি না বলে, কান না দিলেই হল।'

শাম্‌লী জল ভেঙে সরে যেতে লাগল, ইচ্ছে একটু দূরে গিয়ে ডাঙায় উঠবে।

'আরে, আরে, তুই আয় না আমার কাছে···মাইরি বলছি, তোকে ভাল কথাই বলব, আমার খারাপ মতলব কিছু নাই '

শাম্‌লী ততক্ষণে ডাঙায় উঠেছে, বুকে সাহসও বেড়েছে। চেঁচিয়ে বললে. 'তুমার সঙ্গে আমার কী কথা, মুখপড়া, কুনু দিন আমার ঠেয়ে এস্‌বি নাই '

তারকও উঠে দাঁড়িয়েছিল। 'আচ্ছা, শাম্‌লী, তোর এত রাগ কেনে। তোকে আমার ঘরে কাম করতে বলেছি এই ত! তুই ভেবেছিস আমার মতলব খারাপ। তুই কাজে লেগে যা, তোকে কথা দিলম, আমি বামুনের ছেলে, তোকে বিয়া করে ফেলব। শালা, আজকাল আবার জাতফাত কি ' বলে ও এগোতে গেল।

শাম্‌লী লাফিয়ে ছুটতে আরম্ভ করল, দূরে পাড়ের উপর উঠে উদ্দাম ভাষায় চেঁচাতে লাগল, 'বিয়া করবি, বামুনের বেটা, তোর মুয়ে আগুন দি, তোর বুন-কে বিয়া কর গে যা না, মুখপড়া, ফের যদি আমার ঠেঁয়ে এসবি, তোর মুয়ে ঝাঁটা দিব ' বলছে আর ছুটছে শাম্‌লী।

দশ

মাঠটা পেরিয়ে পাড়ায় যখন শাম্‌লী ঢুকছে, ততক্ষণে শাম্‌লীর উত্তেজনা কমে গেছে, এমন কি আর একটু এগোতেই তার মুখের বুলিও থেমে গেল, হাত পায়ের বিক্ষেপ গেল কমে, এত সহজে ও স্বাভাবিক হয়ে এল যে সেটাই অস্বাভাবিক মনে হতে পারত। তার নির্ভয়তার একটা কারণও ছিল—পাড়ায় ঢুকেই ডান দিকে বেগুন-বেড়ের দিক থেকে কতকগুলো লোকের উঁচু হল্লোড়ের শব্দ শুনতে পেল, আর পায়ে পায়ে সেই দিকেই এগিয়ে গেল সে। ওমা, যা ভেবেছিল তাই—মোহনও সেই দলে আছে। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল ও।

ঘটনাটা ছিল এই রকম। যে পুকুরের ধারে করঞ্জ গাছের তলায় বসে দুপুরে জলখাবার খেয়েছিল মোহন, তারই একটু দূরে বেড়াটার মধ্যে সাঁওতাল-বাগদী-মাহাতোদের আট দশ জন জোয়ান ছেলে জুটেছে, তাদের মধ্যে বনা সাঁওতাল আর মোহনও আছে। বনার হাতে তীর কাঁড। তখন বনা যে তীর তৈরি করছিল, অন্যগুলোর মধ্যে সেটাও আছে।

'দেখি, কেমন হইচে তুমার তীরট'...' তার হাত থেকে নতুন তীরটা নিয়ে মোহন উল্‌টে-পাল্‌টে দেখলে। প্রস্তাব করল তার 'টোক' কেমন আছে তার পরীক্ষা দেবার। অনেক দূরে একটা হিজল গাছের গুঁড়িতে দাগ কেটে দিয়ে তীর ছুঁড়তে বলল। অন্যরা এ প্রস্তাব সহর্ষে সমর্থন করল।

বনা জায়গাটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। প্রথম ওরা ভাবল বনা জায়গাটার দূরত্ব কমিয়ে নিতে চাচ্ছে, কিন্তু না, সে সোজা গাছের গুঁড়িটার কাছেই চলে এল। সবাই মনে করল সে পরীক্ষা দিতে চায় না। কিন্তু বনার মতিগতি বোঝা গেল না—ওপরের দিকে হিজল গাছটার ঘন ডালপালার মধ্যে চোখ চারাতে লাগল। এক সময় ও হাততালি দিলে আর মুখে একটা টানা আর ঢেউ খেলানো শব্দ করতে লাগল।

পরক্ষণেই দুটো কাঠবেড়ালি বেরিয়ে পড়ল কোথা থেকে। লেজ তুলে ডালের গায়ে গায়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল, এই দেখা গেল তো পাতার মধ্যে আবার আড়াল হয়ে যেতে লাগল। বনার ডাকের নকল করতে লাগল ওরা সবাই, না বুঝে এবং তার মতো না পেরেই। বনা ততক্ষণে তীর উঁচু করে গাছের মাথার দিকে স্থির লক্ষে রয়েছে। তীরের ডগাটা সামনে-পিছনে বামে-ডাইনে হেলছে একটু একটু। তারপরই তীর ছুঁড়ল সে, এবং একটা কাঠবেড়ালি পড়ল গাঁথা হয়ে।

ছুটে গেল সবাই, মোহন আগে গিয়ে কাঠবেড়ালিটা তুলে নিলে। লেজটা ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখল ওটাকে, তখনও নড়ছে মাঝে মাঝে। এক দৃষ্টিতে সে কী দেখছিল ওটার মধ্যে সে-ই জানে। অন্য সবাই বনাকে বাহবা দিচ্ছিল।

হঠাৎ কাঠবেড়ালিটাকে দুই আঙুলে ঝুলিয়ে নিয়ে মোহন লম্ফ দিয়ে বনার কাছে পৌঁছাল এবং তার কাঁড়ে সেটা ঠেকাল। বললে, 'বনাদা, তুমি আজ থিকে আমার উস্তাদ হলে, আমাকে শিখাও দিকি ··বল, শিখাবে ত?' বলতে বলতে মোহন মাথা নিচু করে তার পায়ের ধুলো নিলে।

বনা কাঠবেড়ালির সেই রক্তমাখা তীরটা মোহনের কপালে ছোঁয়াল। বললে, 'আয়, তবে শিখা কর...'

কেমন করে কাঁড় ধরতে আর তীর ছুঁড়তে হবে, তার কায়দাগুলো দেখাতে লাগল বনা। বেশ অবহিতভাবে শুনল মোহন, তারপর বনার নির্দেশ অনুসারে টোক অভ্যাস করতে লাগল। অন্যরাও তার দেখাদেখি উৎসাহিত হয়ে উঠল।

শাম্‌লীর কেমন যেন লাগল। তাচ্ছিল্যের মুখভঙ্গি করে ওখান থেকে চলে গেল ও। ঘরে পৌছে দেখলে মা নেই। সুজনের বউ লখী ঘাটে এসেছিল জল আনতে, সে চেঁচিয়ে জানাল যে পচাই তার খোঁজ করছিল, চাল রেখে কোথায় চলে গেছে, বলে গেছে শাম্‌লী যেন রান্না করে রাখে।

'চাল! পচাই চাল কুথা পাবেক?' জিজ্ঞেস করল শাম্‌লী কিন্তু উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে কোঁচড় থেকে গুগলিগুলো মাটির ওপর ফেলল। বেশি তুলতে পারেনি, তার আগেই তারক হালদারের জ্বালায় চলে আসতে হয়েছে ওকে। কিন্তু সেই ঘটনার ছাপটা পর্যন্ত এখন ওর মন থেকে মুছে গিয়েছে, বরঞ্চ ওর মনটা পড়ে রয়েছে বেগুন-বেড়ের দিকে। একটু কান দিলেই কোলাহল শোনা যায়।

'কী হইচে উয়াদের!...' ভাবতে পারল না শামলী। এখন তো অন্ধকার হয়ে গেছে, এখনো কি 'টোক' চলছে?

একটা কাঠের টুকরোর ওপর গরুর গোঁজ পোঁতা বাঁশের মুগুর ঠুকে গুগলি ভাঙতে লাগল শাম্‌লী, আর ওর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল কাঠবেড়ালির ছেঁচা মুণ্ডুটা, মোহন লেজ ধরে সেটাকে দোলাচ্ছে।

গুগ্‌লি ছিঁচতে লাগল শাম্‌লী কিন্তু কাজে ওর মন ছিল না। কোনো রকমে শেষ করে তাড়াতাড়ি সেগুলো চুপড়িতে করে সামনের পুকুরঘাট থেকে ধুয়ে আনল। প্রথমে ভেবেছিল ভাত চড়াবে, কিন্তু চুপড়িটা ঘরের মধ্যে রেখে দরজায় শেকল তুলে দিলে, তাড়াতাড়ি বেড়ের দিকে চলে গেল। মা এসে যা হয় করবেখন।

না, এখন আর তীর কাঁড়ের খেলা চলছে না। হাডুডু খেলা জমেছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, পূর্বদিকে একফালি চাঁদ দেখা দিয়েছে, তারই আবছা আলোয় খেলা জমেছে ভালো। দলে লোকজন বেড়েওছে বলে শাম্‌লীর মনে হল। চারদিকে ঘিরে আছে লোকেরা, দেখছে। মাঝে মাঝেই সাবাশী চিৎকারের মাঝখানে 'মোহন', 'মোহন' শুনা যাচ্ছে। নিঃসাড়ে দাঁড়ানো লোকদের একটা সারির পিছনে এসে দাঁড়াল শাম্‌লী। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খেলাটা দেখল কিছুক্ষণ। এ সব খেলা শাম্‌লীর অচেনা নয়, সে নিজেই আগে কত খেলেছে। কিন্তু মোহন

খেলছে ভাল। একেবারে চাষার ছেলের মতোই। হঠাৎ শাম্‌লীর মনে হল, সে কি তাহ'ল ভুল বুঝেছে? কেন তার মনে সন্দেহ হয় মোহন চাষার ছেলে নয় বলে।

সে যাই হোক, শাম্‌লী ওর খেলার তারিফ না করে পারল না। মোহন ডাক নিয়ে গেলে ওকে কেউ ধরতে পারছে না, পিছলে বেরিয়ে আসছে। একবার তো প্রচণ্ড হাততালি আর হুল্লোড় উঠল। কি, না, ঠিক হাঁটুর ওপরেই বনা সাঁওতাল ওকে জাপটে ধরে শূন্যে তুলে ফেলেছিল। মোহন করলে কি, সেই টানেই জোড়া পায়ে উপরশূন্যে মারলে থুঁডি লাফ। এক পাক ঘুরে মোহন লাইন ছুঁয়ে ফেললে।

আবার উলটো খেলা, অর্থাৎ ধরাব বেলাতেও মোহন কায়দা দেখাচ্ছিল। ওদের বিপক্ষে ছিল ভারী ভারী জোয়ান সব। হিমসিম খাইয়ে দিচ্ছিল। যে খেলুড়ে দু'একবার দাপাদাপি করে গেল ওদিক ঘেঁষে, তার পরেব বার মোহন তাকে ঘোল খাইয়ে ছাড়ল। পটাপট ফেলছিল বিপক্ষদের। শাম্‌লী লক্ষ কবছিল মোহনের কাগদাটা কী। একটু পরেই বুঝতে পারল।

বিপক্ষ দলের খেলুড়ে দম নিয়ে চু-কিৎকিৎ করতে করতে এসে দাপাদাপি করতে লাগল, আর যে মুহূর্তে ছুবলাবার জন্যে হাত ছুঁড়ে দিল, ঠিক সেই মুহূর্তে সেই হাতটাই হ্যাঁচকায় টেনে দিল মোহন। মানে, এও হচ্ছে টালেব খেলা— মারতে হলে মারুনেকে একটু ঝুঁকতে হবেই, দেহের ভরের টাল সৃষ্টি হবে, আর সেটাই তার ছিদ্র, দুর্বল জায়গা। মোহন সেই জায়গাটাতেই মোক্ষম মার দিচ্ছে। সাবাশ! শাম্‌লীর চোখ দুটো বিড়ালার মতো জলতে লাগল।

কতক্ষণ পরে খেলা শেষ হল। অনেকেই চলে গেল, কেউ কেউ ছোট ছোট দলে বসে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত কথা বলতে লাগল। ব্যাপার ঘটল একটা, ওই রকম একটা দলে মোহন কথা বলতে বলতে হঠাৎ শাম্‌লীর দিকে চোখ পড়তেই থমকে গেল, কেমন থতমত খেয়ে গেল ও। ওব সঙ্গীদের এটা চোখ এড়াল না, 'তুর কী হল রে?'

'কী হবেক আবার ···' বলে মোহন মুখ ফিরিয়ে কথা বলতে লাগল।

তাড়াতাড়ি সরে গেল শাম্‌লী, যেন এক পাড়া থেকে ভিন্ পাড়ায় যাচ্ছে, এমনি একটা ভাব মুখের ওপর ঝুলিয়ে। ঠিক বাড়ির দিকে নয়। আজ সকালে যেখানে বনকুঁদরী তুলেছিল সেই জায়গাটায় এসে পড়ল ও। একটা পাকুড় গাছের ছায়ায় দাঁড়াল।

কী আশ্চর্য! মোহনও দু'একজনকে নিয়ে এই দিকে আসছে। সুড়ুৎ করে

বনের দিকে সরে গেল ও, বন্য জন্তুর মতোই এরা নিঃশব্দে চলাফেরা করতে পারে। কিন্তু মোহনরা এদিকে এল না, আর একটা রাস্তা দিয়ে বেঁকে গেল এবং মাঠের ধারে আলের ওপর বসল। ওর সঙ্গে আরো দু'জন আছে, একজন তাদের পাড়ারই ধনা, সে এর মধ্যে হেঁড়ে তৈরি করতে ওস্তাদ হয়েছে।

ওদের সব কথাই শুনতে পাচ্ছিল শাম্‌লী। খেলার কথা নয়, কাস্তে চালানোর কথা উঠল। ধানের গোছ মাটি থেকে উপরে উঠে গেছে, তুমি যদি বেশি উপরে কাস্তে বসালে, নরম জায়গায় সেটা ঘেষ্‌টে যাবে। ঠিক কাটতে চাইবে না। যদি মাটি বরাবর বসাও তাহলে কাটবে হয়তো, কিন্তু মেহনত লাগবে বেশি, ধানগোছ মাটি সব কাটতে হবে। আর যদি মাটি থেকে একটু উপরে যেখানে গোছটা তখনও শক্ত আছে সেইখানে কাস্তে লাগালে, তাহলে ফঁস্‌ করে সুল্লুকে কেটে যাবে। আচ্ছা, কাস্তে দিয়ে ছাগল কাটা যায়? মানুষের গলা? মানুষের গলা কাটতে হলে ঠিক কোনখানে লাগাতে হবে, ঘাড়ের দিকে, না কি সামনে গলনলীর দিকে, না কি পাশের দিকে?

সে নিয়ে নানা রকম মতের হুটোপুটি। শাম্‌লী মুচকে হাসল।

হঠাৎ চমকে উঠল সে। বাঁশের বাঁশির একটা টান, আর—ওমা, সেটা মোহনের হাতেই। অন্য দু'জন খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল, বাজাতে বলল মোহনকে। কিন্তু আশ্চর্য, মোহন ওদের চলে যেতে বলল, সে একাই থাকবে আর বাজাবে। কারণ? যার কাছে সে বাঁশি শিখেছে তার বারণ আছে, রেওয়াজ করার সময় কেউ কাছে থাকবে না। ঠিক মতো শেখা হলে তারপর সবার কাছে পরিচয় দেবে। তার আগে নয়।

'ও মা, উয়ার পেটে এত বিদ্যি···' শাম্‌লী তখনও হাসছে মনে মনে।

অগত্যা চলে গেল ওরা, মোহনকে ওরা জ্বালাতন করে না, ভালোই বাসে।

কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত, শাম্‌লীর মনে হল সেও চলে যাবে কি না। যদি বারণ থাকে—কিন্তু আর একবার ডিগ্‌বাজী খেল ও। মোহন মাঝে মাঝে বাঁশিতে ফুঁ দিচ্ছে আর যারা চলে গেল তাদের পথের দিকে তাকাচ্ছে। একটু নিশ্চিন্ত হয়েই উঠে পড়ল মোহন, আর মাঠের দিকে এগোল।

'মিছা···মিছা কথা···'

এতক্ষণকার প্রশান্তি আর বিশ্বাস কেটে গিয়ে শাম্‌লীর বুকের ভেতরটা রাগে জ্বলে উঠল যেন, 'মহন উয়ার সাঙাৎদের ঠকাইছে, ঠিক!'

মোহন বাঁশিতে ফুঁ দিতে দিতে মাঠের মধ্যে পাঁচ-দশটা জমি এগিয়ে গেল,

তারপর বাঁশি দিলে বন্ধ করে। তারপরই দ্রুত এগোতে লাগল—মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। তারপর আর তাকাল না।

চুপিসাড়ে বেরিয়ে এসে যেখানটায় মোহনরা বসেছিল সেখানে এসে দাঁড়াল শাম্‌লী। পাছে ওকে দেখে ফেলে—যদিও মোহন অনেকটা দূর চলে গেছে—সেইজন্য নিচু হয়ে বসে পড়ল সে। চাঁদের আব্‌ছা আলো তো আছেই। কিন্তু মোহন চলেছে তো চলেছেই। একটা জায়গায় খেজুর-অশত্থ-বট জড়াজঁড়ি হয়েছিল—জায়গাটাকে লোকে তেগাছা বলে—সেইখানে গেলে মোহনকে আর দেখা গেল না। গেল কোথায়, মিলিয়ে গেল না কি ? কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল শাম্‌লী, কিন্তু না, কোথাও নেই। ঠিক সাপের মতন, হিলহিল করে যাচ্ছে, তারপর কোনো গর্তে-ফাটলে গাছের গোড়ায় নিমেষে হাওয়া হয়ে যায় যেমন. এও তেমনি।

অদম্য একটা আবেগ অস্থির করে তুলল শাম্‌লীকে, লোকটা গেল কোথায় ? ও মাঠের মধ্যে ছুটে যেতে চাইল, কিন্তু ভয় যে তাহলে তাকে দেখতে পাবে। হঠাৎ একটা পথ পেয়ে গেল ও, দুপুরে মথুর কৌড়ি আর বনা টুডু দু'জনে মিলে যে সরকারী-কাটা খালের কথা বলছিল, সেদিকে নজর পড়ল ওর। একটু এগিয়েই ঝুপ করে তাতে লাফ দিয়ে পড়ল, আর ছুটল তীরের মতো খালের কোলে কোলে। মেয়েটা খুব চালাক, গায়ের কাপড়টা নামিয়ে দিল একটু. চুলগুলো ঝাঁপ্‌ড়ি-ঝুপ্‌ড়ি করে নিল, যাতে ওকে আব্‌ছা আলোতে মানুষ বলে চেনা না যায়। প্রায় আধক্রোশ দূরে ছিল সেই তেগাছার জট, তার থেকে একটু দূর দিয়ে গেছে খাল। কাছাকাছি এসে সতর্ক হল শাম্‌লী, যদি মোহন তাকে দেখে ফেলে।

কিন্তু তার পরই নিশ্চিন্ত হল সে। মোহনকে দেখতে পেলে, সে তখন আরো অনেকটা চলে গেছে। লাফ দিয়ে খালটার থেকে উঠল শাম্‌লী, বটগাছটার তলায় দাঁড়াল। এতক্ষণে বুঝতে পারল শাম্‌লী, মোহন চলেছে মাঠ পেরিয়ে ব্রাহ্মণভুঁইএর জঙ্গলের দিকে। কেন ? দৃষ্টি স্থির করে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, আর ভাবনার তোলপাড় চলছে। মোহন জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে কেন ?

মোহন মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলের কাছাকাছি হচ্ছে আর আবছার মতো হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার দেখতে পাচ্ছে ওকে। আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। না, জঙ্গলের মধ্যেই ঢুকল ও, নিশ্চয়ই।

সেইখানটায় বসে পড়ল শাম্‌লী। উত্তেজনায় ওর মাথার মধ্যে গরম হয়ে উঠেছে, বুকের ভিতর তোলপাড় করছে। যাবে সে ?—না, সাহস হয় না।

ধীরে ধীরে নিঃঝুমের মতো হয়ে পড়ল শাম্‌লী। কতক্ষণ ঠায় বসে রইল। শুক্ল পক্ষের প্রথম দিককার চাঁদ এখন গাছের আড়ালে পড়েছে। সমস্ত মাঠটা এখন কী রকম দেখায়। আলের পথ আঁকা-বাঁকা, মিলিয়ে যাচ্ছে ছায়ার মতো, ছায়াগুলো লম্বা হয়ে পড়েছে, মানুষের ছায়ার মতো। আরো কারা কি মাঠের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ? কী রকম সব ছায়া-ছায়া মনে হয়।

উঠে দাঁড়াল শাম্‌লী, আবার ছুট লাগাল। এবার উল্টো মুখে, গ্রামের দিকে।

এগার

ঘরে ফিরেই এক কলহ-কিচ্‌কিচির মধ্যে পড়ল শাম্‌লী। মা সিংবাবুদের বাড়ি থেকে কাজ করে ফিরেছে। চলতে ফিরতে খোঁড়াচ্ছে দেখল—কি, না ধান সিদ্ধ করতে করতে নামাবার সময় পায়ে পড়েছে, পুড়ে ফোস্কা হয়ে গেছে। সেই সন্ধ্যার আগে হয়েছে, এখন টাটিয়েছে খুব।

কামিনী ঝামরে উঠল, 'কি লা, তুই ছুঁড়ি যে রাত পহরে ঘরকে এলি, তুর লজ্জা-সরম লাগল নাই ?'

'বেশ করি. তুমার কি ?'

'তুর উদরে পিণ্ডি দিবেক কে ? উলান জ্বালানি তা লয়. জ্বালুন কবলি তা লয়, না, শুধু পাড়া-পাড়া ঠ্যামক-ঠ্যামক করিস ..'

পরিস্থিতিটা মুহূর্তে বুঝে ফেলল শাম্‌লী। পচাই এখনো ঘরে ফেরেনি, দুটো জ্বালানিও ছিল না, তার মা কাজ থেকে ফিরে ওই খোঁড়া পা নিয়ে শুকনো কাঠকুটো সংগ্রহ করেছে. তারপর উনুন জ্বেলে ভাত চড়িয়েছে। স্পষ্টত, পচাই যে চাল এনেছিল সেগুলোই। তবু কিনা ওর মাথায় চণ্ডাল চেপেছিল, সেও হাত নেড়ে বলে উঠল. 'ঠ্যামক করব নাই কেনে, বেশ করব !'

'কী বললি, করব নাই কেনে ! তুই যে জুয়ান মাগী হলি, তুর বিয়া হল নাই, কাঠমদ্দ ইদিক-উদিক তাগ করে আছে. ভয়-ডর নাই ? যদি ছুঁয়ে দেয় ত কী করবি ?'

পচাই বলেছিল, শাম্‌লীকে 'ঘড়ারোগে' ধরেছে—যদিও কথাটা তার নিজের নয়, অন্যের কাছে শোনা -কথাটা মন্দ বলেনি। মায়ের কথার

উত্তরে চোখমুখ আর হাতের বীভৎস ভঙ্গি করে শাম্‌লী বলতে লাগল, 'আ মোর কাঠমদ্দ গ',

'মুয়ে ফুঁকে বিড়ি,
পায়ের কাছে গড়াগড়ি

তুমার কাঠমদ্দর মুয়ে মারি লাথি··' লাথি মারার মতো পা ছিট্‌কে দেখাল শাম্‌লী, সেই তালেই এক পাক ঘুরে স্থির হল। বোধ হয় বিকেলের তারক-প্রসঙ্গ মনে পড়ে গিয়েছিল।

কামিনী মেয়ের তেজ দেখে অবাক, বোধ হয় আজ কিছু বাড়াবাড়ি ছিল। সেও সমান ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, 'মার মার, লাথ মার, খুম মার, তুর তেজ হইচে, তোর গদা পায়ে তেজ হইচে···কিন্তুক তুর নোজ্জা লাগে নাই, তুই যে চারগণ্ডা বছর পার হলি. তুর বিয়া হল ? তুর বাপ নাই, তুই কাজকাম করিস ? তুকে কুন ছঁড়া বিয়া করবেক ? বল তাই '

জোঁকের মুখে নুন পড়ল যেন। এদের মধ্যে কাজ-কাম করতে পারে এমন মেয়েই পাত্রী হিসাবে বাঞ্ছিতা। তবু শাম্‌লী চেঁচিয়ে উঠল, 'করব কেনে, কাজকাম করব নাই, তুর ভাতও খাব নাই·· কাজের লেগে ত পায়ে ধরে সাধছে কত গণ্ডা···'

দু'জনের কথা কাটাকাটি চলছে, তারই মধ্যে শাম্‌লী বাইরে চলে গেল। আশেপাশে কোথা থেকে কয়েকটা পাতা তুলে আনল, আয়াপানের পাতা, সেগুলো ওর মায়ের পায়ে যেখানটায় পুড়ে ফোস্কা হয়েছে, তার ওপর বসিয়ে নেকড়া বেঁধে দিল।

'সর, সরে বস কেঁনে···' বলে নিজেই সেদ্ধ-হওয়া ভাত নামাল, তারই ছিঁচে-রাখা গুগলির বাটি-ভাজা করল পেঁয়াজ-লঙ্কা মিশিয়ে। ভাতের সঙ্গে দুটো আলু দিয়েছিল মা, সেগুলো মেখে নিল। তারপর নিজের ভাগের চারটি ভাত যা হোক মুখে পুরে খেজুর পাতার বড় চ্যাটাইটি পেতে তাতে শুয়ে পড়ল। মা গুড়িয়ে পড়েছিল একটু দূরে, মাটির ওপরই, তাকে ডেকে খাওয়াল না। পচাইও ফেরেনি এখনও। যাক গে, খাবেখন ওরা মায়ে-বেটায়।

অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করতে লাগল শাম্‌লী, যা সাধারণত হয় না। মোহনের কথাই মনে পড়ল আগে। ওই তো, ওই ওখানে ওদের ঘর, উঠোনে দাঁড়িয়ে তাকালেই ওদের বাঁশ-ঝাড় দেখা যায়। গাজন দুলের বউ-বেটা-ঝি কেউ নেই। গাজন লোকটা ছিল ভালো। শাম্‌লী তাকে

জ্যাঠা বলে ডাকত, ভালওবাসত। শাম্‌লীর ছেলেবেলায়, যখন তার বউ বেঁচে ছিল, তখন তাকে কোলে-পিঠে করেছে, বুড়ো-বুড়ি দু'জনেই। শাম্‌লীও এই সেদিন পর্যন্ত গাজনের রান্নাবান্না করে দিয়েছে মাঝে-মধ্যে। এখন মোহন নিজের রান্নাবান্না করে। লখী খুড়িও করে।

সেটা কত দিন হল—এক বছর, না, বোধ হয় আট-দশ মাস হবে। মোহন যতদিন এসেছে, ততদিন দুধে ঘোল ফেললে যেমনটা হয়, সব কেটে গেছে। মোহন কাজকাম করে, চাষীর মতো চাষও করে, মুনিষজনও খেটেছে, কিন্তু শাম্‌লী ওকে দেখতে পারে না, শাম্‌লীকেও এড়িয়ে চলে মোহন। অথচ শাম্‌লী ঘরে-বাইরে, মাঠে-ঘাটে ওর সঙ্গে আঠার মতো লেগে আছে, না গিয়েও পারে না। ওর সন্দেহ হয়—

ধ্যুত্তুরি ছাই। আমার কি। মোহন কি করল না করল তার কি। আজ জলখাবার নিয়ে গিয়েছিল দুপুরের আগে, সব চাষীর লোক আছে, ছোট-ছুটকি আছে, ওর নেই। তাই ওদের ঘর থেকে নিয়ে গিয়েছিল। 'আর যাব নাই কেনে, কুনু দিন লয়…' নিজের মনেই মুখ মুড়ল শামলী।

মোহন কি বাঁশি বাজাতে পারে? পারে না—শাম্‌লী ঠিক জানে সে পারে না। মাঠ পেরিয়ে বনের দিকে কেন গেল স—দিনমানেও নয়, রাত্তির বেলা? ধ্যুত্তুরি, যাক গে।

পাশ ফিরে শুল শাম্‌লী। সেই সময় পচাই এল ফিরে। মাকে ঠেলা দিয়ে তুলল। কুপীটা জ্বেলে শাম্‌লীকে দেখল একবার, সে ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। তারপর ওরা খেতে বসল। মা জিজ্ঞেস করল, 'চাল কুথা পেইছিলি, পচাই? তুই না লি'এলে পেটে জল ঢেলে শুতে হত…'

পচাই মাতব্বরি ভঙ্গিতে বললে, 'আজ সিংবাবুদের চালা নিএ গেছলম নাই? তা দিলেক গোটেক লোট, আট গণ্ডা দিবেক বলেছিল। আর পেলম কিছু, এক বাবু দিল…কিছু লয়।'

শাম্‌লী বুঝতে পারল পচাই চেপে গেল কথাটা। মা কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না, দিব্যি কথা বলে যেতে লাগল। শেষে বললে যে এইরকম কাজ পেলেই পচাই যেন করে।

হঠাৎ বুকের ভেতর কাঁটার মতো লাগল শাম্‌লীর। সে কোনো কাজকাম করে না। এত বড় বুড়া-ধাড়ী মেয়ে হয়েছে সে, এখনো তার বিয়েও হয়নি। কী করবে সে?

মনে মনে হিসেব কষতে লাগল শাম্‌লী। এ তল্লাটে বাগ্‌দী-দুলে-সাঁওতাল

মাহাতো মেয়েরা সব কী করে। অনেকেই ঝি-গিরি করে. ঠিকার কাজ, নয় তো খাই-দাই। সে তো তারক বলে আসছে। ঝাঁটা মাব অমন ঝি-গিরির মুখে। আর আছে জঙ্গলে চুরি করে কাঠ আনতে যাওয়া, সে এক-আধবাব যে শাম্‌লী না গেছে, তা নয়। গণ্ডা কয়েক পয়সা হয় তাতে। তাছাড়া আছে সিংবাবুদের ধানের চাতাল—সে এক বিরাট ব্যাপার। শয়ে শয়ে মণ ধান সেদ্ধ-শুকনো, কলে ভাঙা সব চলে এক সঙ্গে। সেখানে সাঁওতাল মেয়েদেরই ভিড় বেশি। সেখানে মেয়েদের নিয়ে কত কথাই না সে শোনে. কিছুই ভালো লাগে না ওর। অথচ মায়ের ভাত আব কতদিন খাবে সে।

আচ্ছা! বর্ষার মুখে সব মেয়ে-মদ্দ চলে যায অনেক দূরেব দূরের জায়গায়। পায়ে হেঁটে, সড়ক রাস্তায় মোটরে কবে। ধান রোয়া চাষেব কাজের মজুরির জন্য। সে বকম দলে চলে গেলে কেমন হয়? 'কেউ ঠেকা দিতে পারবেক নাই, চলে যাব ঠিক…' নিজেব মনেই ঘাড নাডল শাম্‌লী।

'তুই জেগে আছিস, না ঘুমায় পড়েছিস…' পচাই এসে ওকে ঠেলা দিয়ে খানিকটা সরিয়ে দিলে, তারপব শুয়ে পডল। তা পড়ুক. শামলী কোনো সাড়া শব্দ দিলে না।

'জেগে আছিস ঠিক। রা কাড়না গোটেক. ঘুমালে তুব নাকের ডাক হত নাই ভিন রকম?' পচাইটা খুব চালাক।

শাম্‌লী উত্তব দিলে না, কিন্তু কথাটা মেনে নিয়ে বোঝা গেল। একটু নড়ে-চড়ে শুল ও। বললে, 'পচাই…'

মা এঁটো বাসন ধোবার জন্য পুকুরে গিয়েছিল।

'তাই ক, কেনে… আমি যখন বিকালা এলম, তখন তুই কুথা ছিলি?'

'পচাই, সকালা যখন তুই চালনিএ গেছলি, তখন মহনকে ডেকেছিলি?'

'আমি! আমি ডাকব কেনে, উ-ই ত দেখা কবলেক আমাব সঙ্গে পথেব মধ্যিখানে..'

ওমা, কে মিথ্যে বলছে! মোহন বলেছিল পচাই তাকে ডেকেছিল। এদিকে পচাই বলছিল. 'গুঁজে দিলেক মোব হাতে…' পচাইযেব গলা আটকে গেল।

'বল, বুলছিস নাই কেনে…'

'কী বুলব?'

'তুর হাতে মহন কুন্‌ঠো গুঁজি দিলেক!' আগ্রহে উঠে বসল শাম্‌লী।

'না-না, উসব কিছু লয় কিছু লয়…'

এরপর অনেকটা ধস্তাধস্তি হল কথায় কথায়, অনুনয় আর প্রত্যাখ্যান, . . . তার ফল হল যে পচাই বেমালুম চেপে গেল। এবং পাশ ফিরে সত্যই বোধ হয় ঘুমোতে লাগল।

'তুই বলছিলি কুন বাবু তুকে পয়সা দিয়েছিল, ত দিলেক কেনে?'

'দিলেক, খুশি হই দিলেক...' জড়ানো স্বরে পচাই বললে।

'বল না পচাই, এই পচাই,...কুথাকার বাবু?'

মেদ্‌নিপুরের বাবু, সে মহনের বন্ধু, এ্যা-ছি...' সজোরে ঘুরে পড়ল পচাই, আর ওর বিক্ষিপ্ত হাত দুটো মারের মতো লাগল ঝুঁকে-পড়া শাম্‌লীর মুখে, 'খপদ্দার, আমার পেট থিকে কথা লিতে ফকর-ফকর করবি নাই। তুর কথায় থাকি আমি?'

'তুই মারলি আমাকে, হঁ...' পচাইয়ের মুখে সজোরে চড় কষাল শাম্‌লী। পচাইয়ের কাছ থেকে কথা বের করতে না পেরে যেন খেপে গিয়েছিল মেয়েটা।

দুই লেজফুলো কুনো বেড়ালে লেগে গেল তারপর।

'তুই আমার কথায় থাকবি কেনে? লোকে যে বলে তুকে ঘঁড়া-রোগে ধরেচে, আমি বলি কিছু, তাই?'

'ধরেচে বেশ করেচে, আমাকে ধরেচে...'

এক সময় শাম্‌লীর জড়ান কোনো রকমে কাটিয়ে উঠে বসল পচাই, সঙ্গে সঙ্গে তাকে আছড়াবার মতো করে ফেলে উঠে পড়ল। মুহূর্ত মাত্র, তারপরই ফোঁস করে উঠে দাঁড়াল শাম্‌লী, উস্কো-খুস্কো চুলে প্রেতিনীর মতো দেখাচ্ছিল ওকে। পচাই ঘরের বাইরে ছুটে পালাল, আর শাম্‌লীও ধাওয়া করে নাগাল না পেয়ে একটা ইটের ঢেলা ছুঁড়ে মারল। পচাই অন্ধকারে অঁক্‌ করে একটা শব্দ করল। পচাই পাল্টা একটা ঢেলা ছুঁড়ে অন্ধকারে নিখোঁজ হয়ে গেল, যদিও ঢেলাটা লাগল না শাম্‌লীকে।

'তুদের দু'ট'কে পাঁকে পুঁতে রাখব কেনে, দাঁড়া কেনে তুরা...' খোঁড়াতে খোঁড়াতে পুকুর ঘাট থেকে কুপী হাতে নিয়ে ওদের মা এগিয়ে আসতে লাগল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পরিস্থিতিটা দাঁড়াল এই রকম। ঘরের মধ্যে শাম্‌লী আর মা ঘুমিয়ে পড়েছে, পচাই ফিরে এসে দাওয়ায় বসল। ভিতরে গিয়ে শোবার কথা ভাবল না ও, বারান্দাতেই খালি মাটির ওপর শুয়ে এবং একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু শাম্‌লীর ছোঁড়া ঢেলাটা ছোট হলেও ওর কপালে বেশ লেগেছিল,

... .হল, যন্ত্রণাও হচ্ছিল। ঘুমটা পরিচ্ছন্ন ছিল না। দিনের বেলার সব ঘটনাগুলো স্বপ্নের মধ্যে দেখছিল ও, ছাড়াছাড়া, আবার ভেঙে চুরে।

কখনো দেখলে সিংপুকুরে তফ্রা তুলে পচাই সাঁতার কাটছে। কখনো দেখলে বাসের ছাদে গান হাঁকতে হাঁকতে চলেছে সে। মাছের চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, আঙুলের ফাঁকে গলগল করে রক্ত উঠে আসছে, কিছুতেই থামছে না। মেদিনীপুরে দালালের কাছে মাছের ঝুড়ি যখন পৌছাল তখন মাছগুলো পচতে আরম্ভ করেছে, বরফ দেওয়া সত্ত্বেও। বাজারের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে, সবাই সাজিয়ে বসেছে, বিক্রী করছে। আবার মাছের বাজার। পচা মাছ কেটে মেছোরা বিক্রী করছে। এ মা, এই পচা মাছ আবার খায়! এই মাছগুলোই কি সিংপুকুরের? পচা-পচা-পচা···বাজার সাজিয়ে শহরের লোকেরা ভীষণ ছুটোছুটি করছে। মোটর থামতেই মাথার ওপর দু'হাত তুলে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'মহন-ভোগ খাব, পান্তুয়া খাব···'। দু'বার বলতেই এক ছোকরা গোছের বাবু ওর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলে। একটা কাগজের টুকরো সবার অজান্তে ওর প্যান্টের পকেটে চালান করে দিয়েছিল, পচাইও দিয়েছিল তার কাগজটা। কী লেখা ছিল? একটা টাকা দিয়েছিল সেই বাবুই।

ঘুম ভেঙে গেল পচাইয়ের। মাথার যন্ত্রণাটা বেড়েছে। আঁঃ—শব্দ করল একটা। স্বপ্নের ব্যাপারটা বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে নিলে— এই রকমই হয়েছিল বটে। শাম্লীর কথা মনে পড়ল, আর একটু হলেই বলে ফেলেছিল। একটা দৌত্যের কাজ ওর মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয়েছিল, যদিও পচাই জানত না, কিসের সেই কাজ। তথাপি ও শান্তভাবে মনে মনে স্থির করল, না, শাম্লীকে বলবে না, কাউকেই কিছু বলবে না।

ও আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

বারো

শাম্লীর মায়ের পা রাত্রির মধ্যে বেশ ফুলে উঠল, সকালে উঠে বুঝতে পারল বেশ গা গরম হয়েছে। কিন্তু এসব জিনিসকে ওরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, সিংবাবুদের বাড়িতে গেল যথারীতি কাজ করতে, কিন্তু বিকেলে আর পারল না।

একটু চিন্তিত হয়ে উঠল কামিনী। তার অনেক দিনের ঘর, পচাই জন্মাবার

আগে থেকেই কাজ করছে। কামাই হলে গিন্নী মুখ বাঁকায় সে জন্যেই নয়, তার নিজেরই খারাপ লাগে। অগত্যা শাম্‌লীকেই ভয়ে ভয়ে বললে সে।

যা ভেবেছিল, শাম্‌লী উঠল আগুন হয়ে, 'আমি কাজকাম কবি নাই! আর তুমি যে ছ'মেসে ধরালে তার কি বুল…'

তবু শাম্‌লী গেল বদ্‌লা দিতে, আগেও এক আধবার গেছে। এবারে কিন্তু তাকে বেশ কয়েক দিন ধরেই যাতায়াত করতে হল, শাম্‌লীর মা অনড় হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে রাগে গসগস করছে শাম্‌লী, তার কেবলই মনে হচ্ছে, শেষবেশ তাকে সিংবাবুদের কাজেই লাগতে হল! তারক হালদারকে কাছারি বাড়িতে দেখে সে, কাজ করছে কখনো অন্য কর্মচারীদের সঙ্গে, কখনো খোদ সিংবাবুর সঙ্গে সলা পরামর্শ করছে। কী এত গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর করে তারাই জানে।

বিঘা পাঁচেকের বেশি জমির ওপর সিংবাবুদের মহল। বাইরের মহলে কাছারি. বারান্দার দু'পাশে দু'খানা বড় বড় ঘর, তক্তপোশে গদি পাতা, আলমারিতে, তাকে নতুন-পুরানো কাগজে ঠাসা, তার কতক কাপড়ে পুঁটলির মতো মোড়া, কিছু খোলা। দুপুর বাদ দিয়ে সারা দিনমান তারককে নিয়ে তিন জন কর্মচারী কাজ করে, সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে যায়। এর উত্তর দিকে এক সার চালা, বলদ আর গাইয়ের থাকার জন্য গোয়াল। এসবের পরিচর্যা, লাঙল দেওয়া এই সব পাঁচমিশেলির জন্য চার জন স্থায়ী মাহিন্দার আছে, ঠিকা বাগাল লাগায় যখন যেমন দরকার। চাষের সময় তো লোকজনের গোনাগুনতি থাকে না।

এই গোশালের লাগাও খানিকটা ফয়লাট জায়গা আছে, মাঝে ছাড়া ছাড়া কাঁঠাল আর পেয়ারা গাছ নিয়ে। তার তলায় বড় বড় উনুন, সেখানে ধান সেদ্ধর কাজ চলে। এখানেই পা পুড়িয়েছিল কামিনী। সিংগিন্নী তাকে সেখানেই কাজে লাগিয়ে দিলে।

শাম্‌লী একা নয়, আরো একজন বয়স্কা মেয়ে আছে তার সঙ্গে। ধান সেদ্ধ করে পেল্লায় ডাবাগুলোতে তা ঢালবে, তারপর ঠাণ্ডা জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে সেগুলোকে। সেখান থেকে তুলে হাঁড়িতে আর একবার চাপিয়ে নিয়ে উঠোনে খেজুরপাতার চ্যাটাই মেলে শুকোতে দেবে! তারপর ভানার কাজ।

সিংবাবুদের নিজেদেরই মিল আছে, এ তল্লাটের সব চেয়ে বড় অন্নপূর্ণা রাইস মিল, সিংগৃহিণীর নিজের নামে। কিন্তু মিলের চাল সে বাড়িতে ব্যবহার করে না,

ধান সেদ্ধ-শুকনোর পর বাড়িতেই ঢেঁকিতে ভানিয়ে নেয়। এ জন্য বাড়ির ঝিদের ছাড়াও মাঝে মধ্যে গ্রামের অন্য মেয়েদেরও ডাকতে হয়।

শামলী সেদিন বিকেলে ধান সেদ্ধ করেই কাটিয়ে দিলে। পরের দিন সকালে বাসনের গাদায় হাত দিয়েছে, এমন সময় কর্তা গণপতি ভিতর মহলে এসে হাঁক-ডাক শুরু করে দিলে, 'আঃ, এরা সব গেল কুথা, এক গিরস্ত বাড়ির লোকজন, কাকেও পাবার জো আছে···এই ন্যাপ্‌লা, তোর ঠাক্‌মা গেল কুথা রে '

গিন্নী অন্নপূর্ণা চেহারায় চলনে গণপতির ঠিক উল্টো, পাতলা ফর্সা, পাক ধরা চুলে চওড়া সিঁথি, একেবারে কাছে এসে বললে, 'চিল্লাচ্ছ কেনে, কী বলবে বল।'

গণপতি হাতের পাঁচটা আঙুল মেলে ধরল, তাতে দৃশ্যমান হল তিনটে আংটি, 'তুমার মিলে পাঁচটো মেঝেন কাজে আসে নাই, তুমার পুন্নোনামে মিল শূন্নো যাবেক নাকি, হাঃ-হাঃ·· '

গিন্নী হাসতে গিয়েও চেপে গেল, 'সক্কালবেলা হাসি-মস্করা কেনে বল দিকিনি !'

'লাও বাবা, তাই হল ! তা এখন তুমার ইস্টাট্‌ থিকে দুটো মাগী দাও দিকি, যাক চলে উয়ারা মিলে, চাতালে ধান মিলতে হবেক, শুকনার পরে গুটাতে হবেক···'

'হ্যাঁ গা, কাকে দিব আমি। আমার ইথেনে কাম নাই ?' বলে একবার অবাধ্যের মতো চারপাশে অন্নপূর্ণা তাকিয়ে নিলে।

গণপতি নিজেই নির্বাচন করতে আরম্ভ করল।

'এই শাম্‌লী, তুই এখেনে কেনে রে ?'

উত্তর দিল গিন্নী, 'উয়ার মায়ের বদ্‌লি এস্‌চে। উয়ার মা খঁড়া হইচে পায়ে গরম ধান ফেলে।'

'বটে ? তুই যা। আর একটো, উই, উধারে ওইটো কে, ঝুনির মা·· যা তুরা ঝট করে তুরা চলে যা দিকিনি।'

'এখন লয় বাবু, বাসনগুলা মাজুক আগে, তারপর যাবেক···' গিন্নী ব্যাজার মুখে বললে।

সুতরাং শাম্‌লীকে মিলে যেতে হল। সদর দিয়ে বেরোবার সময় কাছারি-বাড়িতে দেখলে, কতকগুলো লোক জুটেছে, তার মধ্যে তারক হালদারও আছে। তারক ওকে দেখে যেন অবাক হয়েছে এমনিভাবে বলে উঠল, 'কে রে, শাম্‌লী না, তুই বাবুদের কাজে থালে লাগলি বল···'

শাম্লী কোনো উত্তর না দিয়ে পা বাড়াল।

তারক বলতে যাচ্ছিল আরো কিছু, গণপতির গলার আর পায়ের শব্দ পেয়ে থেমে গেল। তার শাম্লী-সম্ভাষণ মালিক শোনেনি বলেই মনে হল। গণপতি বারান্দায় পা দিয়েই তারকের চারপাশের লোকগুলোর দিকে একটা মেজাজী দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। বললে, 'উয়ারা সব কী জন্যে আসল আবার হে?'

এসেছে সব অনেক কারণে। কেউ বন্ধকী খালাস করতে এসেছে, কেউ বন্ধক দিতে। সুদের টাকা জমা দিল কেউ, কেউ কিছু সুদ মকুবের জন্য প্রার্থনা জানাল। এসব এখানকার প্রাত্যহিক কাজ, বেলা দশটা এগারোটা পর্যন্ত এসব মেটাতেই কাটল। তারপর তারক খাতা নিয়ে বসল, বারান্দার থেকে এখন একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে।

বারান্দায় একটা টেবিল, গণপতি যে চেয়ারটায় বসেছিল সেটা একটু পিছিয়ে নিলে, টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান মারল আর অনেকক্ষণ ধরে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

'মিল থেকে লেভির দরুন আজ তক কত চাল জমা দেওয়া হল হে?'

ভিতর থেকে তারক বললে, 'আজ্ঞে, দেখে বলতে হবেক। তা সওয়া দু'শ মণের কম লয়…'

'খালেই দেখ, এখনো তুমার দিতে হবেক অন্তক একশ মণ… বুঝ তারক…'

স্পষ্টত, গণপতি তারককে যত সন্দেহের চক্ষেই দেখুক, তার ওপর নির্ভর না করেও পারে না। বলতে গেলে তারক তার মন্ত্রী আর সেনাপতি দুই-ই। দুঃখের কথা তাকে না শুনিয়েও পারে না। আক্ষেপের সঙ্গে বললে, 'বুঝ তুমি তারক, যেইটো নিজের হাতে না করব সেইটো হবেক নাই। এই মিলের লেভি লিয়েই এখন মেদ্নিফুর ধন্না দিতে হবেক। অথচ তুমাদের ছোট বাবু, আমার কনেষ্ঠ পুত্র গো, শুনি ত মিনিস্টেরের ঘোড়ায়ও চড়েন আর মাজিস্টেরের হাতিও মারেন। তিনি ত একটু তদ্বির করলেই পারেন…'

'আজ্ঞে হঁ, তা পারেন, পুত্রের কত্তব্য…

'আর কত্তব্য! বুঝালে তারক, আমার এই সব ইস্টাট মিলায় যাবেক ধুঁয়ার মতন, চোখ বুজ্লেই হল …'

'আজ্ঞে না, ছোট বাবু আছেন, বড় বাবু আছেন…'

'আরে, ধুর্…' বলে গণপতি বাকি সিগারেটটা শেষ করতে লাগল।

গণপতির দুঃখ আছে ছেলেদের নিয়ে। তারক সেটা বুঝল, মালিকের দিকে তাকাল একবার, কিন্তু আর কিছু বলল না

গণপতির দুই পুত্র, নরেন্দ্র আর সৌরীন্দ্র। নরেন্দ্র মেদিনীপুর কলেজে পড়েছে, বি-এ পাশ। কিন্তু চেহারা যেমন মেজাজও তেমনি নিস্তেজ, বিবর্ণ। বেকার নয়, বাপের এস্টেটের বহুমুখ কর্মধারায় সে একটাতেই সাধ্য মতো আত্মনিয়োগ করেছে—চাষের কাজে। ছোট ছেলে এই কাছাকাছি শালবনি হাই স্কুলেই পড়ত, কিন্তু গণ্ডি পেরোয়নি। তার চেহারা আর মেজাজ পৈতৃক ধারার, কিন্তু আর্থিক ক্ষেত্রে বড় ছেলের মতো বাপের অনুগামী নয়। সে প্রথম শুরু করে শালবনি-খড়্গপুর ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা দিয়ে, এখন কত রকম ব্যবসা আর এজেন্সির সে মালিক, তার হিসেব কেউ জানে না। এখন সে খড়্গপুরেই তার পরিবার নিয়ে থাকে।

গণপতি সিংহের দুঃখ, তার বড় ছেলে তার সমস্ত বিষয় রক্ষা এবং চালনা করতে পারবে না, তার সে ক্ষমতাই নেই, আর ছোটর ক্ষমতা সত্ত্বেও এদিকে কোনো লক্ষই নেই, সে আসবে না।

তারক তাকে বোঝায়, 'ছোট বাবু ঠিক আসবেন ···ধরেন গাছের মগ ডাল, কিন্তু গোড়ার উপরেই সেইটো দাঁড়ায় থাকে, ছোট বাবুর খড়্গফুরে মগ ডাল রইচে, কিন্তু ধরেন কেনে, এই চাঁদসোল গেরামের মাটি থিকেই ত সেইটো বেরাইচে ..'

গণপতি মাথা নাড়ে, 'তুমি ডালপালার কথা বললে বটেক, কিন্তু ডালের গড়ায় ফঁপ্‌রা লাগে হে, ডাল খসে পড়ে···'

সেদিন বিকেলে তারক হালদার গণপতিকে নিভৃতে পেয়ে বললে, 'আজ্ঞে, বাবু, আপনাকে বললে আপনি রাগ করেন, সেই অস্তরটো (চোরাই রাইফেল) লিয়ে লেন, আপনাকে বলা আমার কত্তব্য। ব্রাহ্মণভুঁইর জঙ্গলের খবর জানেন? শুনলম জঙ্গলের পাশ বরাবর মিলিটারির গাড়ি ঘুরাফিরা করে গেছে '

হো-হো করে হেসে উঠল গণপতি, 'তুমি ভয় খেঁয়ে গেলে হে, তারক। ভয় তুমার কাকে বল দিকি, মিলিটারিকে, না কি, ছিঁচ্‌কে ডাকাতকে?'

'আজ্ঞে, ঝোপে-ঝাড়ে বাঘ লুকায় থাকে, বলা যায় না ··'

'ভয় তুমার আছে বটে হে, তারক পাড়াঘরে আঁদালে-কেঁদালে তুমার অনেক বাঘ আছে বটেক।'

ইঙ্গিতটা বুঝল তারক, কিন্তু সেদিক দিয়ে গেল না। বললে, 'আজ্ঞে, বাবু, আপনার পাড়াতেই আমি থাকি, ঘরে একলাই থাকি, বাবুর হাতে একটো রাইফেল থাকলে আমাদের বুক বাড়ে!'

'বুলেচ বটে, বুলেচ ঠিক···বাঘের কথা, শুন তবে ··'

গণপতির অট্টহাস্য রূপান্তরিত হল আত্মতৃপ্ত প্রশান্ত গর্বে, 'আমার ঠাকুর্দা রামেশ্বর সিং···সাতটো বাঘ মেরেছিল ' তিন আংটি সমেত ডান হাতের পাঁচটা আর বাঁ হাতের দুটো আঙুল মেলে দেখাল গণপতি। 'ঠাকুমার মুখে শুনা সব বিত্তান্ত। সে সব জঙ্গল এখন আর নাই, বুঝালে। ওই ব্রাহ্মণভুঁইর জঙ্গল··· সাত ক্রোশ ছিল তার দৌড়, তেমন শালগাছ আর আছে না কি, সব সাবাড়। •ওই জঙ্গল চুঁড়ে বেড়াইছিল ঠাকুর্দা। ত হল কি, সেই বাঘটোকে কেউ কাবু করতে পারছিল নাই, এমনি ছিল নিঃসাড়ে তার চলাফিরা। ত ঠাকুর্দা লোকজন লিয়ে দু'দিন দু'রাত কাটাল ওই জঙ্গলে···তিন দিনের দিন বিকালা ফিরে আসবেক ত একটো লালা পেরাইচে। লালার ধারে এসেচে ত বাঘ ওই একবারে ঠাকুর্দার সামনে·· ত ভুল করল ঠাকুর্দা। তেনার সেই সাতটো বাঘ উদ্ধার করা বন্দুক, টটা ভরাই ছিল·· তাক কর তাই। কিন্তু করলেক কি·· দু'দিন ঘুরে রাগ হয়েছিল খুব, বন্দুকটো দিয়ে পিটাতে আরম্ভ করল বাঘটোর পিঠে। পয়লা ঘা, দুসরা ঘা পিঠে পড়তেই বন্দুক গেল ভেঙে। ঠাকুর্দা করলেক কি, বাঘটো লাফ দিতেই দু'হাতে তার গলা ধরল চেপে, সঙ্গে লোকজন, তাদের হাতেও বন্দুক লাঠি, কিন্তু ঠাকুর্দা আর বাঘ, দু'জনে যেমন চরখি ঘুরতে লাগল। বুঝো দেখ মানুষটোর শক্তি কেমন। লোকের হাতের অস্তর রইল হাতে · শেষে বাঘটা ফেলে দিল ঠাকুর্দাকে। গলায় কামড়ায় ধরলেক। তখন উয়ারা বাঘের পিঠ বরাবর গুলি ছুঁড়েছিল। বাঘ মরেছিল, কিন্তু ঠাকুর্দাও শেষ। ওই তেনার শেষ। যুদ্ধ করে মরল।'

তেরো

সিংবাবুদের বাড়ি থেকে অন্নপূর্ণা রাইস মিল প্রায় ক্রোশ খানেক দূরে বাঁকুড়া-খড়্গপুর পাকা রাস্তার কাছাকাছি। বেশ কিছুটা দূর থেকে ধানভানা কলের একটানা ধাতব ঘসঘস শব্দ শোনা যায়। ধান ভানাই কিন্তু মিলের সমস্ত ব্যাপার নয়। বিরাট এক চাতাল। চাতালের এক দিকে মিল, অন্যদিকে ধান সেদ্ধ করবার সারবন্দী পাকা চুল্লী, সেদ্ধ ধান ভিজোবার গভীর পাতকো, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেই ধান তুলবার বিরাট কাঠরা আর কপিকল। সামনের সারির ঘরগুলো ধানের গুদাম—পিছন দিকেও আছে, অফিস ঘর, আবার ঢুকবার মুখে বৈঠকখানার মতো বসার জায়গা।

শাম্‌লী সেখানে যেতেই তাকে ভাপানো ধান চাতালে মেলার কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল। সেদ্ধ ধান গাদায় ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে, ভাপ উঠছে হুসহুস করে, বেলচে দিয়ে কেউ সেই গাদাটা একটু ভেঙে দিচ্ছে, তারপর বুরুশ দিয়ে চৌরশ করে মেলে দিচ্ছে চাতালে। বুরুশ ঠেলা আর টানা দুইই। বুরুশের কাঠের পাত ধানের গাদায় ডুবিয়ে কাঠের হাতল ধরে ঠেলছে একজন আর সামনে দড়ি বেঁধে টানছে দু'জন। সেই রকম একটা বুরুশ টানছে শাম্‌লী—সে এবং আর একজন। বিধবা, প্রৌঢ়া, মেয়েটাকে সে এর আগে দেখেনি, না কি চেনা-চেনা মনে হয়।

একটু পরেই ঘেমে চান করে গেল শাম্‌লী। গরম ভাপ-ওঠা ধান চারদিকে, তার ওপর পা দিয়েও যেতে হচ্ছে, অবশ্য এত গরম নয় যে ফোস্কা পড়ে যাবে, কিন্তু বোধ হয় সে অনভ্যস্ত বলেই একটা বিচ্ছিরি জ্বালার মতো লাগছে। ক্রমে সেটা অসহ্য মনে হয়। গাদার ওপর ধান ঢাললে হুস করে ভাপ উঠে যাচ্ছে, শাম্‌লী সেটা চোখে দেখছে আর ওর নিজের মাথাই গরম হয়ে উঠছে।

পাশের মেয়েটা মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল তার দিকে। তার চাউনিটা কী রকম যেন, অস্বস্তি লাগে। এক সময় মেয়েটা ফ্যাক করে হেসে ফেলল, 'তুই মেয়াটো কুন্‌ঠো ?'

কেন যেন একটু থতমত খেয়ে গেল. বললে, 'শাম্‌লী, তুমি কুন্‌গো ?'

'আমি কুন্‌ঠো ! খি-খি · আমাকে চিনলা নাই ? চিনবি-চিনবি, ননা কায়েতনীর কি আর সিদিন আছে, উ নাম গেছে এখন আমার নাম দুলির মা, খি খি···' বলে আর হাসে. কেবলই হাসে বুড়া ধাড়ী মেয়েটা, গা দুলিয়ে দুলিয়ে, 'দেখ শাম্‌লী. তুর পা দুটো সোন্দর কেনে, বাঁশ্‌নি বাঁশের কেঁড়ের পারা. বাবুরা পেলে ফুল-চন্দন দি' পূজা করবেক ··' শাম্‌লী তার খাটো শাড়িটা তুলে কোমরে গুঁজেছিল. উঠে গিয়েছিল হাটুর ওপর পর্যন্ত, বিদ্যুৎবেগে শাড়িটা নামিয়ে দিল সে।

'রাগ করলা মেয়া ? তুই আমার নাত্‌নীর মতন, তাই মস্করা করলম ··'

শাম্‌লী বলল না কিছু, নিজের কাজ করে যেতে লাগল। ওর হাত পা আড়ষ্ট, মাথার মধ্যে ঝিম ধরছে। সব চেয়ে অসহ্য লাগছে এই চারদিকের এতগুলো মনিষ্যির চিৎকার। 'মানিজার' অভয় সরকার হাঁকডাক করে সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছে, গাল দিচ্ছে, ছুটে যাচ্ছে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। মেয়েদের চিল্লানি বেশি, যেমন সংখ্যাতেও, একটু চুপ করে কাজ করতে পারছে না। সাঁওতাল মেয়েরা কোমরে জড়াজড়ি করে পায়ে পায়ে ধান ছড়াচ্ছে, হাসছে, সাঁওতালি গানও গাইছে। মোট কথা, দুপুরের পর যখন ছাড়া পেল শাম্‌লী,

তখন সে আধমরা হয়ে গেছে, ঠিক শারীরিক পরিশ্রমে নয়, কিন্তু কী রকম যেন।

মাঝখানে ডুলির মার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, বেরোবার মুখে আবার হাসি দিয়ে আটকাল শাম্‌লীকে—ঘামে-ময়লায়-পরিশ্রমে মুখ-হাত-পা কদাকার কিন্তু হাসতে পারে ঠিক—'তুর নাম বললি শাম্‌লী, ত কুন পাড়ায় যাবি? কার বিটী বটিস?'

বেশি কিছু এড়াবার জন্যই তৎক্ষণাৎ শাম্‌লী বললে, 'আমার বাপ সনা মাহাত ..'

'ই-ই, কী বললি...' একটা ঢেউ-এর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে কোমরে জড়িয়ে ধরল শাম্‌লীর, 'আ গ', তুই বলিস কী! অনেক দিন দেখি নাই তাই চিনতে নারলম তখন...তুর বাপ যে আমাকে দিদি বলত, তুর মাও বলত, তুর ছোট ভাইটোর আঁতুড়ে আমি ছিলম নাই? হঁ রে, উ কত বড় হইচে, হঁ? তুর মার সঙ্গে কি আমার কম গলায় গলায়...'

শাম্‌লী অবাক হল, বিরক্তও হল, ডুলির মার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ও ভাবল, আর তাকে এড়াতে পারবে না।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল ডুলির মা, 'খালে ই সম্পক্ক যে উলটি-পালটি গেল .. তা হউ কেনে, পাড়াঘরে উ অমন হয়...তুই আমার লাত্‌নী, খি-খি...'

ডুপুরের খাওয়াটা মালিকের বাড়িতেই হল। বিকেলে যখন শাম্‌লী ফিরে এল তখন তার মাথা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে। দূর থেকে বুঝতে পারল, ধানের কল এবেলা চলছে না। আঃ, নিজের অজান্তেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে ও। মিলে ঢুকেও দেখলে, এ বেলা লোকজন অনেক কম। কিন্তু ঢুকেই ডুলির মার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে একটা পরিস্থিতিতে।

অফিস ঘরের বাইরে বারান্দায় একটা চেয়ার পাতা ঠিক তক্তপোশের গায়ে। তাতে নাদুস-নুদুস প্রৌঢ় 'মানিজার' অভয় সরকার আরাম করে বসেছে। সকালবেলার সেই তেজ আর দাপাদাপি নেই। ডুপুরের স্নানাহারের পর বেশ আরামে আধবোজা চোখে বসে আছে, একট কাঠি দিচ্ছে কানে। চারটে মেয়ে আছে তার সঙ্গে। তার গা ঘেঁষে বসেছে তক্তপোশের ওপর ডাইনে-বায়ে ডুটো মেয়ে, একটা সাঁওতাল একটা ডুলে—সেটাকে শাম্‌লী চেনে, তার নাম সখী। সাঁওতাল মেয়েটা তারই বয়েসী, কিন্তু সখী ভরযুবতী। আদর নিচ্ছে অভয়বাবু। সখী তার ডান হাতটা রেখেছে অভয়ের কোলে, ডুলির মা তার মাথার খাটো করে ছাঁটা আধপাকা চুলে বিলি কাটছে, সাঁওতাল মেয়েটা অভয়ের হাত থেকে

খড়কেটা নিয়ে নিজেই তার কানে দিতে লাগল, চতুর্থ জন কিছুই করছে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদের দেখছে আর মাঝে-মধ্যে কথায় যোগ দিচ্ছে।

শাম্‌লী ঢুকতে ওরা কেউ সচকিত হল না, ওকে দেখল কিন্তু লক্ষই করল না। শাম্‌লীও উদ্দেশ্যহীনভাবে চাতালটার ওপ্রান্তে চলে গেল, নির্দেশ পেলেই কাজ আরম্ভ করবে। এ বেলার কাজ ওবেলায় মেলে দেওয়া ধানগুলো জড়ো.করে গাদা দেওয়া, পরের দিন সেগুলো মিলে যাবে। •

'লাও গ', বেলা গেল, কাম করবে নাই তুমরা ?' ডুলির মা-ই প্রথম বারান্দা থেকে নেমে এল। সোজা শাম্‌লীর কাছে এসে ফিসফিস করে বললে, 'রাসলীলে কেমন দেখলে, লাত্‌নী ?'

'তুমাদের সব মেয়াগুলান আর পুরুষগুলান এমনি ধারা কেনে !'

'আস্তে বল, লাত্‌নী, সব অমনি ধারা ত তুই কেমন ধারা ? তুই কি করবি লো...'

'তুমাদের মানিজার বাবু, ভদ্দনোক !'

'ভদ্দনোক ত, বটেক ত। এই যে তুই এলি, তুর দিকে চাইল ?'

না, চায়নি, শাম্‌লী ভাবল।

'মেয়া যেমন, পুরুষ তেমনি করবেক, করবেক নাই ?'

হঠাৎ রাগে গরগর করে উঠল শাম্‌লী, 'পাডাঘরে এত মেয়া আছে, সব ছেনাল ? বললেই হল... তুমিও তাই বট ?'

এবার খিলখিল করে হেসে উঠল ডুলির মা। রাগ করল না, বলল, 'তুর মাকে শুধাস, লাত্‌নী, সিংবাবুর বাড়িএ কাজকাম করে, যৈবনকাল ঠিঙে আছে গ'...'

শাম্‌লী কটমট করে তাকিয়ে রইল, রেগে ও কিছু বলতে পারল না। সরে গেল তারপর, এড়িয়ে যেতে চাইল ডুলির মাকে। নিজের মায়ের সম্বন্ধে কিছু ভাবতে পারল না শাম্‌লী। ডুলির মা বোধ হয় পালটা জবাব দিয়েছে। তাকে শাম্‌লীর ওই রকম কথা বলা উচিত হয়নি।

সন্ধ্যার মুখে কাজ শেষ করে ফিরছিল ও, একলাই। একটা পুকুর ধারে খিলখিল মেয়েলি হাসির শব্দে চমকে উঠল। একটা খেজুর গাছের তলায় সখী, ডুলির মা, আর সেই অন্য মেয়েটা বসে আছে। একটা মাটির ভাঁড় রয়েছে সামনে, শাম্‌লীর চিনতে অসুবিধে হল না, পাতার খিলি-ঠোঙায় ওরা পচুই খাচ্ছে।

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল শাম্‌লী, তারপর এগিয়ে গেল। ওর মাথায় কী রকম রোখের মতো চেপেছে।

শাম্‌লীকে প্রথমটা ওরা দেখেনি। ডুলির মা ওকে দেখেই আদর করে ডাকল, 'এস লাত্‌নী, আমরা দু'ট' অসের কথা কইছিলম ·' সেই তখনকার খোঁচাখুঁচির চেতনা তার কণ্ঠস্বরে একটুও নেই।

শাম্‌লী বসল ওদের সঙ্গে। রসের কথা অনেক শুনল। গণপতি সিং, মানিজার বাবু, তারক হালদার, সব—অনেক মেয়ের কথা। কোন ছেলেটা তার বাপের নয়। যৌবনে সিংমশায়ের দোষ ছিল, এখন নেই। মানিজার বাবু উপরি-উপরি। কিন্তু তারক হালদার—রক্তচোষা বাঘের চোখ, যে মেয়ের ওপর পড়েছে, তার রক্ষা নাই। সে না কি গুমোর করে, কোনো মাগী তার হাত ফস্‌কায়নি। একবার শাল জঙ্গলে দুলেদের একটা বউকে পেয়েছিল, বউটাও শক্ত, লড়াই করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেনি। মেয়েটা ছিল খাঁটি সোনা, অপমানে জলে ডুবে মরেছিল ওই সিংপুকুরের জলে।

কেঁপে উঠল শাম্‌লী, সিংপুকুরে সেদিনের কথা মনে পড়ল তার।

চোদ্দ

শাম্‌লীর মা কামিনীর গা গরম একটু কমেছে, পায়ের ফোস্কাটা গলে গিয়ে ঘা হয়ে গেছে কিন্তু। শুকোতে দেরি লাগবে, টেনে টেনে একটু হাঁটতে পারে এই পর্যন্ত।

সেদিনও শাম্‌লীকে বদ্‌লির কাজে যেতে হয়েছে। মিলে নয়, আবার সিংবাবুদের বাড়িতেই। সকালে বাসন মাজা, ঘর ন্যাতা দেওয়া, গোয়ালের কাজ করেছে। ওদের কাছারির কাজকর্ম যেমন চলে গণপতি আর তারকের হাত দিয়ে তেমনি চলছিল। কাজের জন্য বাইর-ভিতর করতে হয়েছে শাম্‌লীকে কয়েকবারই। শাম্‌লী নিজেই কয়েকবার তাকিয়ে দেখেছে তারককে, কতকটা নতুন চোখে, ডুলির মা'রা যা বলেছিল। লোকটার গায়ে না কি দারুণ জোর—দেখে কিন্তু তা মনে হয় না। কিন্তু তারক, ওর সঙ্গে অন্যান্য দিনের মতো কথা বলবার চেষ্টা করেনি, বরঞ্চ মুখ ঘুরিয়ে না দেখার ভান করেছে।

বিকেলে শাম্‌লীর আসতে দেরি হল, প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি। এ বেলা তার কাজ ধান ভাপানোর। পরশু যে ধান সেদ্ধ করে ভিজতে দিয়েছিল, সেগুলো হাঁড়িতে তুলে পাতার জ্বালে আবার ভাপাতে হবে।

'মা গ', ছুক্‌......' কাজটায় চরম বিরক্তি ধরে গেছে শাম্‌লীর, চাতালে

কাজ করার পর থেকে। দেখলেই মনে হয়, তারও সারা গায়ে আর মাথায় ভাপ উঠছে। তবে রক্ষা এই, তার সঙ্গে কাজ করছে আরো দুজন মেয়ে।

সন্ধ্যা হল। ওরা তিনজনে ধান ভাপাচ্ছে, আর ভিতরের বারান্দায় মেলে দিয়ে আসছে। সকালে হলে সারা দিনের রোদে শুকনো হতে সুবিধে হত, কিন্তু কী সব কাজের জন্য গিন্নী বারণ করেছিল, এখন তো গ্রীষ্মের সময়, রাত্রেও ঠিক শুকোবে। সে যাক গে। প্রথম দিকে ওরা তিনজনে কথাবার্তা, গল্পগুজব করেছিল, ক্লান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে সে সব থেমে গেছে, এখন তিন-জনে তিন জায়গায় বসে যে যার কাজ করছে, চুপচাপ।

জায়গাটা কাছারি বাড়ির পাশে, কোণের দিকে, কাঁঠাল-পেয়ারা গাছের তলায়। কাছারি বাড়িতে সারা বিকেল ধরেই কেউ ছিল না। একটু আগে কর্তা গণপতি সিং কোথা থেকে বাড়ি ফিরেছে, হাতমুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে তার সেই চেয়ারটায় এসে বসল। লম্বা, লোটানো ধুতি, গায়ে হাফশার্ট, বেশ দশাসই চেহারা।

'তুরা সব কী কচ্ছিস রে, ধান ভাপাচ্ছিস, ভাপা কেনে···' হাঁক দিয়ে কথাগুলো বলে সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। ওদের এক চাকর হারিকেন এনে টেবিলের ওপর রাখতে যাচ্ছিল, গণপতি বললে, 'সবায় ঘরের ভিতর রাখ, চোখে লাগবেক ·'

আলোটা পাশের একটা ঘরে রেখে গেল চাকরটা। গণপতি এরপর নীরবে, বোধ হয় নিশ্চিন্ত মনে আরামে সিগারেট টানতে লাগল।

শাম্‌লী আর মেয়ে দুটো উনুনের আগুনের আলোয় মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল কিন্তু কিছু বলল না। কর্তাও চুপচাপ। একদিক থেকে ওরা এখন গিন্নীর অধীন, আর পারতপক্ষে গণপতিও গিন্নীর আওতায় নাক গলায় না, না বলে কয়ে। কিন্তু শাম্‌লীর ভালো লাগল না, এতক্ষণ তো জায়গাটা খালি ছিল আর নিশ্চিন্তে কাজ করছিল ওরা। আবার উড়ে এসে জুড়ে বসল। একটু পিছন ফিরে বসল ও, চোখ রাখল কালো হাঁড়িটার মাথায়। ভাপ উঠছে।

শাম্‌লীর নিষ্ফল আক্রোশও ওই ভাপের মতোই তার সারা শরীর পেঁচিয়ে যেন মাথা দিয়ে উঠছে। সবার ওপর খেপে গেছে সে, সবাই যেন তার শত্রুতা করছে।

মায়ের পেটে দু'তিন দিন কিছু পড়েনি, সেই নিয়ে আজ তাকে বেহদ্দ গাল দিয়েছে কামিনী। বোঝে শাম্‌লী, কিন্তু সে কী করবে? আজ ফেরার সময় গিন্নীর কাছ থেকে চাল চেয়ে নিয়ে যাবে চারটি, যদি দেয়। তারপর

মায়ের সম্বন্ধে কালকে তুলির মায়ের সেই ইঙ্গিত—গা জ্বালা করতে থাকে শাম্‌লীর। সত্যি-মিথ্যে কে জানে, মরুক গে। কিন্তু তার ওপর মায়ের আক্রোশ কেন ?

ওই এক ফোঁটা পচাই—কাউকে যদি সে বুঝতে পারে! আজ কার সঙ্গে মারামারি করে চোখ-কপাল ফুলিয়ে এসেছে। এত করে শাম্‌লী জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু কিছুতেই বলল না। একরোখা, চাপা। সেদিন চালানির ব্যাপারে কিছু একটা গোপন রহস্য আছে. বলতে গিয়েও চেপে গিয়েছিল পচাই। শত্রু!

কতকগুলো শুকনো পাতা উনুনে ঠেলে দিল শাম্‌লী, দপদপ করে জলে উঠল, আর তার আলোকে তাপে অন্ধকারে কাঁঠাল-পেয়ারা গাছের পাতাগুলো কাঁপতে লাগল, অন্ধকারে ভূতের নাচ যেন। একবার মুখ ফিরিয়ে দেখলে শাম্‌লী, বারান্দার কর্তা বসে আছে, এই আগুনের আলোটাও যেন তার চারধারে দপদপ করে কাঁপছে।

আবার মুখ ফেরাল শাম্‌লী এবং অনেকগুলো পাতা এক সঙ্গে ঢুকিয়ে দিল। শাম্‌লী ঠিক বুঝতে পারে না, ওর চারধারে কিছু যেন হচ্ছে। মোহন সেদিন বনের দিকে গেল কেন? মোহন তার সঙ্গে কথা বলে না, কিন্তু তার জন্য সে কী না করে। যার যেটুকু কথা বলে মোহন, সব দেয়ালের আড়াল দেওয়া, কিছুই স্পষ্ট হয় না। প্রথম থেকে এই শত্রুতা চলেছে, রেষারেষি। মরুক গে।

হঠাৎ চমকে উঠল, ওরা তিনজনেই। বারান্দার দিকে তাকাল ওরা। গায়ে কালি-ঝুল মেখে, মুখের ওপর চুল ঝুপড়ি-ঝাপড়ি করে দুজন কর্তার দু'পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আরো দুজন, দুজনেরই মুখে মুখোশ, একজন ওর সামনে এসে দাড়াল, অন্যজন পিছনে। পিছনের জন চেয়ারের পিঠে দু'দিকে হাত রেখে।

'অ-মাঁ-গোঁ··ডাকাত··' উচ্চারণ করেই একটা কাজের মেয়ে সেখানে ভিরমি খেয়ে পড়ল। অন্যজন অস্ফুট চিৎকার করে অন্দর মহলের দিকে ছুটে গেল।

শাম্‌লীও উঠে দাঁড়াল, ও বোধ হয় কাঁপছিল. কিছু করবার মতো ওর চেতনা ছিল না। ওর চোখের দৃষ্টিটা বারান্দায় আঠাতে আটকে গিয়েছিল যেন।

কর্তা একবার এদিক একবার ওদিক তাকাচ্ছিল, উনুনের কম্পমান আলোতে

তার চোখের শাদা দেখা যাচ্ছিল। মুখ দিয়ে এক সময় কথা বেরোল তার, যেন অনেকটা বাধা পেরিয়ে, কফ বসে গেলে যেমন ঘড়ঘড় করে তেমনি—

'কে তুমরা, কী চাও?'

'আমরা তোমার শত্রু…'

'কেনে?…কী করেছি আমি…'

'ঠিক আমাদের শত্রু নও তুমি, ব্যক্তিগত ভাবে। তুমি সমাজের শত্রু, তুমি জোঁক, কেবলই রক্তশোষণ করেছ…'

'আমি কার কী করেছি?'

'তুমি মহাজন, তুমি সুদখোর, তুমি চালানা, তোমা[illegible] ডা[illegible]লা চারদিকে ছড়ানো, শোষণের জাল মেলেছ…'

শামলীকে কেউ যেন মাথায় ধাক্কা মারল, [illegible] লো[illegible]টাই বলছে, গলার স্বর বিকৃত করে, কিন্তু গলার স্বর যেন ওর চেনা, [illegible] গলার স্বর নয়, যেন কথার ধরন।

'আমার কী দোষ, আমার পৈতৃক ব্যবসা, এই চলে আ[illegible]'

'তোমার জোঁকের প্রাণ, [illegible]ক শুষে মোটা হয়েছ, সেই রক্ত [illegible] দেব আমরা…'

বিদ্যুৎবেগে কোমরের [illegible] গোঁজা ধানকাটা ঝকঝকে [illegible] বের করে লোকটা। পাশের দুজন [illegible] হাত চেপে ধরল। সামনের [illegible] টেবিলটা কাত করে ঠেলে ধরল একটু। পিছনের লোকটা [illegible] হাতে [illegible] মাথাটা পিছনে হেলিয়ে ধানের গোছে কাস্তে দেবার মতো [illegible] বসাল, তার [illegible] টানল। কয়েক বার। তারপর ছেড়ে দিল। সরে গেল একটু চার জনেই। প[illegible]ক্ষণেই বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ঠিক অন্ধকার নয়, একটু দূরেই কাকজ্যোৎস্নার মতো। শামলী দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করছিল ওদের। কোথায় মিলিয়ে গেল ওরা। তবু শামলীর মনে হল একটা লোক সামনের ওই শিমুল গাছটার আড়ালে যেন দাঁড়িয়ে [illegible] দেখছে।

ভিতরে তখন কোলাহল উঠেছে, ভয়ার্ত চিৎকারের, কান্নার, দুপদাপ শব্দের।

'ডাকাত, ডাকাত…' ভিতর থেকে চিৎকার করতে লাগল। শাঁখ বাজাতে আরম্ভ করল দুর্বল কাঁপা শব্দে।

প্রথমে বাইরের বারান্দায় এল গণপতির এক মাহিন্দার, আলো আর লাঠি নিয়ে। তারপর তার বড় ছেলে নরেন, ওদেরই বন্দুকটা সমেত। তারপর এল গিন্নী। তারপর ঝি-চাকর, বাগাল, অন্য লোকজন।

'বাবা গো, ই কী হল · ' নরেন কাতরে উঠে প্রথম বলতে পারল।

'ওগো, আমার কী হল গো...' গিন্নী আছড়ে পড়ল মাটিতে।

শ্যামলী এগিয়ে গেল পায়ে পায়ে। দেখলে, কর্তার বাঁ হাতটা টেবিলের ওপর পড়ে আছে আলতো করে, ডান হাতটা পাশে ঝোলানো। গলাটা পিছনে মুড়ে ভেঙে দিয়েছে, চোখ দেখা যাচ্ছে না, মুখটা হাঁ-করা। এখনও রক্ত ঝরছে, তবে তার তেজটা কম। সমস্ত শাদা শার্ট রক্তে ডুবে গেছে, ধুতির একটা ধার দিয়ে রক্ত নেমে এসে মাটিতে মিশল।

শ্যামলী পা ফেলছে, ফিরে যাচ্ছে ও। চলে যাচ্ছে ঘরের দিকে। শিমূল গাছটা পেরোবার সময় দেখলে, না, কেউ নেই, যা তার মনে হয়েছিল। কিন্তু ঘরে পৌঁছোবার একটু আগে একটা জামগাছের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল শ্যামলী। গাছটার ওদিকে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'কে গ'...' ডাকতে চাইল, কিন্তু স্বর বেরোল না।

কী করবে? কালো মাথাটা স্পষ্ট দেখা যায়। পথের ওপর এখানে-ওখানে ইটের টুকরো পড়ে থাকে। ঠায় দাঁড়িয়ে ডান পায়ের দু' আঙুলে চেপে একটা তুলে নিল হাতে। টিল ছোঁড়াতে অব্যর্থ শামলীর হাত। টিলে সাঁই করে ছুঁড়ে। শব্দ করে ভেঙে পড়ল।

ও মা—ছুটে গেল শামলী। কাকতাড়ুয়ার মাথার হাড়ি। যেতে আসতে এটাকে কতবার দেখেছে সে। ভুলে গিয়েছিল। এখন জামগাছের আড়ালে কাকতাড়ুয়ার দেহটা দেখা যাচ্ছিল না, কালো হাঁড়িটাকে মাথা মনে করে ভয় পেয়েছিল। অবাক কাণ্ড।

ঘূর্ণি

পনেরো

এরপর মাস ছয়েক সময় কেটে গেছে, আষাঢের প্রথম, আর দু'এক দিন পরেই অম্বুবাচী। চাঁদসোল গ্রামের যে প্রান্তে গণপতি সিং-এর বাড়ি, তার একেবারে অপর প্রান্তে সাঁওতালদের বসতি। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সাঁওতালেরা, কিন্তু এখানটাতেই বেশি ঘর। এদের একটা বড় উৎসব বড়ম পুজো, তাকে সালুই পুজোও বলে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই পুজোটা হয়ে যাওয়ার রীতি, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই অম্বুবাচীর পর হতে পারবে না।

এ বছর পুজোটা হবে না এই রকমই ঠিক ছিল. কিন্তু অম্বুবাচী যতই এগিয়ে আসছিল, সাঁওতালদের ছেলে-ছোকরারা ততই চঞ্চল হয়ে উঠছিল। সাঁওতাল নয় এমন চাষী-সদ্‌গোপ-বাগদী অনেক আছে, তারাও এই বন্ধ হয়ে যাওয়াটা ঠিক পছন্দ করেনি। কিন্তু সাঁওতালদের ধর্মের ব্যাপার, তারাই বুঝবে, তাই বিমর্ষ হলেও তারা উচ্চ-বাচ্য করেনি। কিন্তু মথুর কৌড়ি সে রকম লোক নয়, এদের পাড়ার কাছে তার ঘর সে জন্যেও বটে, আর খুব আমুদে লোক সে জন্যেও এদের সঙ্গে তার যোগ খুব বেশি. যদিও তার বউ গিরিবালা সাঁওতালদের সঙ্গে তার মেলামেশা পছন্দ করে না। মথুর কৌড়ি সেদিন দুপুরের পরে তাদের উঠোনে বাবুই দড়ির পাকানো খাটিয়ায় এসে জাঁকিয়ে বসেছিল পাড়া ঝেঁটিয়ে দল জুটিয়ে। সে ওদের বলতে চায়, 'তোরা যে পূজা বন্ধ করে দিলি, এইট' তোদের ধরম হবেক, কি তোদের বড়ম বাবা সইবেক, বল তোরা · '

উঠোনটার চার দিকেই অনেকগুলো ঘর, এক এক সাঁওতালের। কোনোটা খড়ের, কোনোটা তালপাতার ছাওয়া। বাঁশের বেড়া, খুঁটি, সব মাটির দেয়াল আর বারান্দা। শিবু হেমরাম চটা পাকিয়ে বারান্দায় বসে টানছিল, আর তার পাশে খুঁটি ধরে দাড়িয়েছিল লুস্‌কি, হাতে একটা সানকি নিয়ে। লুস্‌কি বুড়িটা বনার মা, যে বনার সাকরেদ হয়েছিল মোহন তীরকাঁড়ের শিক্ষার জন্য। মোড়ল লখাই টুডুর মৃত্যুর পর এখন তার স্ত্রী লুস্‌কি বুড়ি সাঁওতালদের মোড়ল হয়েছে।

সে বললে, 'তুই বুলছিস বটে, কিন্তু পূজা হবেক কি করে, পূজা হবেক নাই·· '

কয়েকজন সঙ্গে সঙ্গে তার সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়ল।

'হবেক নাই কেনে···' মথুর চার দিকে চোখ চারিয়ে জোর গলায় বলে উঠল, 'আলবাৎ হবেক !'

লুস্‌কি আবার বললে, 'হবেক কি করে, আমাদের মরদ-কামিনদের হাতে টাকা-পয়সা নাই, কাজকাম নাই···'

কথাটা সত্যি। গণপতি সিংয়ের মৃত্যুর পরে তার খেতখামার, রাইস মিল সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আশপাশের গ্রাম থেকে মালিকরা ভয়ে পালিয়েছে, সেখানেও কাজ নেই। মরদ আর কামিনরা অনেকেই গ্রাম ছেড়ে দূরে চলে গেছে কাজের সন্ধানে। গ্রাম ছেড়ে কাজের সন্ধানে যাওয়া এদের একেবারে অচেনা নয়, কিন্তু সেটা যায় ওরা ফাল্গুন-চৈত্র থেকে শুরু করে, ঠিক চাষের মুখে ফিরে আসে। এবারে অনেকেই ফিবে আসেনি।

এক কামিন বললে, 'মনের মতন হেঁড়িয়া হবেক নাই, পিঠা-মিষ্টি হবেক নাই. পয়সা কুথা ?'

মথুর কৌড়ি আশঙ্কাটা একেবারে অস্বীকাব করতে পারল না, কিন্তু বললে, 'হবেক, ঠিক হবেক, তোরা কাজে লেগে যা, দেখ'ব বড়ম বাবা সব ঠিক করে দিবেক।'

'তুই বল উদের··' বনার মা লুসকি শিথিল কণ্ঠে বললে, 'আমি বুলতে লারব।'

যারা একটু কমবয়সী মবদ-কামিন তাদের ইচ্ছে যে উৎসব হোক, কিন্তু ঠিক এইখানে কথা বলতে পারছিল না। মথুর সেটা বুঝে লুস্‌কিকে বললে, 'তুই না বললে হবেক কেনে, তুই বনার বাবা মরে গেলে এদের মোড়ল হইছিস · ত তোকে বলতে হবেক। আমি বলি শুন · এই, আমাকে একটা চটা দে ত রে···'

শিবু লম্বা ধরনে পাকানো বিড়ির মতো একটা কাঁচা চটা এগিয়ে দিলে। সেইটে ধরিয়ে মথুর বললে, 'আমি মানলম তোদের কথা, তোদের টাকা-পয়সা নাই, ত যা আছে তাই কর। নম-নম কবে কর। বলে পাঁচ সিকে না জুটলে পাঁচ পয়সা দিবি···আর ভেবে দেখ, তোদের সামতালদের সবাই যে মুনিষ খাটিস কি ধানকলে কাম করিস তা লয়, তোদেরও জমিচাষ আছে, কারো আছে নিজের দু'চার বিঘা, কেউ করিস ভাগে, ত চাষের কাম আছে বটেক, ত যদি চাষের আগে বড়ম-বাবাকে খুশি না করলি ত ফসল হবেক কেনে ?'

'হঁ, এইটি' তুই ঠিক বললি···' মোড়লনীর বিপক্ষেই শিবু মত দিয়ে বসল। তখন মরদ আর কামিনরা নিজেদের মধ্যেই তাদের ভাষায় তর্কবিতর্ক আরম্ভ করে দিলে।

একটা ছোঁড়া গামছার খুঁটে কোঁচড় বানিয়ে মুড়ি খাচ্ছিল, মথুর তাকে হেঁকে

বললে, 'এই, তোদের ঘর থেকে মুড়ি দে আমাকে, আন চারটে, ঠাকুমাকে বলগে··' পরে চারদিকে তাকিয়ে বললে, 'তোদের সঙ্গে বকে বকে আমার খিদে পেয়ে গেল।'

ছোঁড়াটা ছুটে যেতে গিয়েও থমকে গেল এবং তার নিজের মুড়ি খাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল। লুসকি বললে, 'উদের মুড়ি হবেক নাই, তুই আমাদের ঘরে যা কেনে।'

লুসকি মুড়ি এনে দিতেই মথুর খেতে আরম্ভ করল, এইভাবে খাওয়াটা ওর নতুন নয়।

বড়ম পুজো হবে না—এই সিদ্ধান্ত বদলে দিতে অনেক সময় এবং সাধ্য-সাধনা লাগল। তখন মথুর বললে, 'তোদের বাপের কাছে বলি দিবি ত? "হুট" ছাড়িস নাই যেন। জানিস ত, তোরা সামতালেরা শিকারী জাত, তোদের সাল্ই বাবার হাতে তীর-কাঁড়, আর সাল্ই মার শাখা-সিঁদুর। মিশ-কালো বড়-সড় পাঁঠা দিবি। আর তোরা কামিনরা শাঁখা পরবি, সাজবি, নাচ করবি, মাদল বাজবেক, সাতখান গাঁ দলমাদল হবেক, হাঃ-হাঃ ··' কথক হিসেবে মথুর বেশ পাকে, ওদের মধ্যে উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গেল।

'হুঁ-হুঁ, হুঁ তুই ঠিক বুলছিস।'

'বড়ম পূজা হবেক, ফি বছর হয়, ইবার হবেক ' এক যুবক হাত ঝিনকে নাচের মতো পা ঠুকে বলে উঠল।

মনে হল মথুর কৌড়ি তার প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ সফল হয়েছে।

একটা মেয়ে দলের পিছন থেকে সরে গিয়েছিল, সে থালায় করে আরো চারটি মুড়ি-পেঁয়াজ-লঙ্কা নিয়ে এল, 'এইগুলান খা কেনে, মথুরদাদা···' ওর চোখে খুশি আর কৃতজ্ঞতার চিহ্ন।

'আরে, না-না, আর খেতে পারব নাই·· আচ্ছা, দে চারটিখানি ·'

মেয়েটা কিন্তু সবগুলোই ঢেলে দিলে।

লুসকি বললে, 'তুই আগে দু কচা মুড়ি জল খেতিস। তুই খেতে লারিস এখন '

'বুড়া হয়ে গেলম নাই! এই দেখ চামড়া ঝুলে পড়েছে···' মথুর হাসতে হাসতে কৌতুকের ভঙ্গিতে নিজের গাল খুঁচে দেখাল। স্পষ্টত, ওদের বড়ম পূজায় উৎসাহিত করতে পেরে সে নিজেও খুব খুশি হয়ে উঠেছিল। খাটিয়ার ওপর ঠ্যাং তুলে আসনপিঁড়ি হয়ে বসল মথুর, নতুন করে খাওয়ায় উদ্যোগী হতে গিয়ে গল্পও জমিয়ে তুললে।

'খাওয়ার কথা বললি ত বলি শুন। আমার ঠাকুদ্দার বাপ ছিল গোবিন্দ কৌড়ি, গোটেক পাঁচসেরি পাঁঠা এক সঙ্গে খেতে পারত। আমাদের ই গাঁয়ে তিন পুরুষেব বাস, ঠাকুদ্দা এসেছিল বাঁকুড়ো জেলার ভেদোসোল থেকে, গরুর পাল লিয়ে, ঘেসো জমির খোঁজে। ত বলি শুন সেই ঠাকুদ্দার কথা। ছেলের শ্বশুরঘর গেছে, আদ্ধেক রাত তখন, বিকালা ঘরের কাজকাম সেরে সাঁঝের বেলা বেরাইছিল। গিরস্ত ঘরে সবাই তখন ঘুমাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে ত আঁধার রাতের কালা পাথর, কপাটে ধাক্কা মারছে ত মারছে, কপাট খুলছে নাই ··'

দশাসই চেহারা মথুর কৌড়ির, ওর লম্বা লম্বা হাত ঘুরছে, চোখ ছোট হচ্ছে বড হচ্ছে, সাঁওতালেরা মুগ্ধ আগ্রহে শুনছে ওর কথা।

'ঠাকুদ্দার ভীমের মতন চেহারা ছিল, মারলেক জোরে লাথ, আর একটু হলেই ভেঙে যেত, মডমড় করে উঠল কপাট, কিন্তু ভাঙল নাই, ভিতর থিকেই খুলে দিলেক, কি না, চারজন জুয়ান-বুডা লাঠি লিয়ে দাঁডায় আছে। কি, না, আমরা ভেবেছিলম ডাকাত '

সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষরা হেসে উঠল, তার রেশ থামতে গেল কিছু সময়।

'ই দিকে বিযাই এস্ছে ঘবে, আদর-খাতির চাই। বিয়ান বললেক, তা বিয়াই, আজ রেতে মুডি-টুডি চলবেক, না ভাত চডাব? তা ঠাকুদ্দা কী বললেক জানিস, বললেক, দেহট' তেমন ভাল নাই, ভাতই চডান, কম কবে, এই পুয়া চোদ্দটেক চাল চডাবেন হাঃ-হাঃ···বুঝলি তোরা, চোদ্দ পুয়া চাল, দেহ খাবাপ, তাই সাডে তিন সের চালের ভাত খাবেক, হাঃ-হাঃ·· '

আবার একটা হাসির ঝটাপটি উঠল।

শিবু হেমরামের খুডা একটা পরিষ্কাব করে মাজা কাঁসার বাটিতে করে মথুরেব সামনে এনে ধরল, শাদাটে ঘোলের মতো জিনিসটা। সাঁওতালদের হেঁডিয়া।

'খাবি ত?'

'খাব নাই কেনে, কত খেয়েছি তোদের ঘরে, খাইনি?'

সবাই সমর্থনসূচক ঘাড নাডল।

ষোলো

সাঁওতাল পাড়া থেকে বেরিয়েই খোলা মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে পড়ল মথুর কোড়ি। বাঁদিকে পাড়ার ভিতর দু'পা গেলেই তার নিজের ঘর, ডান দিকের মাঠ পেরিয়ে বড় আলপথটা ধরলেই অন্নপূর্ণা রাইস মিলের দিকে যাওয়া যায়। একটু দ্বিধায় পড়ে গেল মথুর। নিজের ঘরে গেলে বউ খিচখিচি লাগিয়ে দেবে, সে নিশ্চয়ই দেখেছে তাকে সাঁওতাল পাড়ার মধ্যে ঢুকতে, গোচালার ধারে দাঁড়িয়েই তো দেখা যায়। ওই রকম চলছে, সেও সাঁওতাল পাড়ায় আসা ছাড়তে পারবে না, বউও বলতে ছাড়বে না।

অন্যমনস্কভাবে মাঠের মধ্যেই পা বাড়াল মথুর। পূর্ব দিকে প্রথম বর্ষার ঘন কালো মেঘ সমস্ত আকাশটা ছেয়ে ফেলেছে—পাড়ার মধ্যে এতক্ষণ সে বুঝতে পারেনি। নিচে গ্রামের গাছপালার মাথাগুলো বাতাসে একটুখানি নড়ে উঠেছে। বকেরটা বক একটা মেঘের ওপর দিয়ে উড়ে গেল শাদা ডানা মেলে। পশ্চিমের আকাশটা এখনও মেঘে ঢাকেনি। তার নিস্তেজ আলো এসে পড়েছে মথুর কোড়ির মুখে। একটু যেন বিষণ্ণ। যখন সে কথা বলে না, কিংবা কারুর সঙ্গে কোনো বিষয়ে পরামর্শ করবার দেওয়ার নেই, তখন তার মুখের সেই প্রাণবন্ত ভাবটা যেন শুকিয়ে মরে যায়। মাথের দাঘ দেহ, ফর্সা কিন্তু রং-চটা, কাঠামোর চওড়া-মোটা হাড় শক্তির পরিচায় দেয়—মাঠের মধ্যে লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলে বেশ পুরুষের মতো পুরুষ মনে হয়। এরা পরিশ্রমী, বার্ধক্যে মাথার চুলে পাক ধরলেও এদের সেই মর্যাদা যায় না। লোকে দেখলে সমীহ করে।

মাঠের মাঝ বরাবর রতন দিগারের সঙ্গে দেখা হল, একেবারে কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত তার সম্বন্ধে মথুর সচেতন হতে পারেনি। রতনই বলে উঠল, 'মথুরদাদা, কুথা যাবে গ', মুখখানি শুকায় আমসি হই গেছে, কী ভাবছিলে গ'?'

অসতর্ক ছিল বলে একটু চমকে উঠল মথুর, কিন্তু হেসে বললে, 'এই যাচ্ছি ইদিকে, তুমি কুথা, রতন?' বলে পা বাড়াল ওকে পেরিয়ে, যেন যেতে যেতেই উত্তরটা শুনে নেবে।

'একটু দাঁড়ি' যাও, মথুরদাদা, ই কথার একট' উত্তর দি' যাও, তুমার মুখের কথা লাখ কথার কথা।'

'কী বল দিকি…' কুঞ্চিত চোখে ফিরে দাঁড়াল মথুর কৌড়ি।

'যাচ্ছিলম উপাড়াকে পাঁচ সের বীচ ধানের জন্যে, তা যেতে যেমন পা সরে নাই। চাষবাস কি ইবছর হবেক? কেউ এখন পয্যন্ত লাঙল লামালেক নাই গ' ই মরা গাঁ উচ্ছন্নে যাবেক, মথুরদাদা, রকমে আদ্ধেক লোক গাঁ ছেড়ে চলে গেছে নাই? জান ত সব…'

'থালেই দেখ, গাঁয়ের হাল হইচে কেমন।'

'তাই ত বলছি, যাচ্ছি বটে বীচ ধানের জন্যে, কিন্তু ফসল কি হবেক? ই গাঁয়ে শনির দিষ্টি পড়েছে নাই। শুন কেনে, আমার লিজের ত এক ছটাক জমি নাই, তুমি জান। মণ্ডলদের দু' বিঘা জমি ভাগে করি, আর বাবুদের পাঁচ বিঘা জমি ' হঠাৎ গলায় যেন আটকে গেছে এমনি করে থেমে গেল, ভীত চোখে তাকাতে লাগল রতন। কিন্তু মথুর জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছে দেখে বলে ফেলল, 'উনিদের মাঠকে-মাঠ জমি ত ভাঁ-ভাঁ করছে, লাঙল পড়ছে নাই, সার রইছে নাই, ই গাঁট' মড়াচির হই গেল যে গ' '

মথুর করুণভাবে হাসল, ঘাড় নাড়ল, মনে মনে স্বীকার করে নিলে কথাটা। গণপতি সিংয়ের মৃত্যুর কয়েক দিনের মধ্যেই ঘটনাগুলো ঘটছিল। পুলিসের এবং সরকারী লোকের প্রাথমিক তদন্ত এবং আনাগোনার পরই গণপতির স্ত্রী পিত্রালয়ে, আর তার বড় ছেলে নরেন্দ্র কলকাতায় চলে গেছে বলে শোনা যায়। ছোট ছেলে সৌরীন্দ্র পুলিসের সঙ্গে নিজের গাড়িতে করে দু'একবার এসেছিল, তারপর সব চুপচাপ। সিংবাড়ি তালাবন্ধ। অসংখ্য শিরা-উপশিরায় যে কাজের ধারা চলত, তা শুকিয়ে গেছে, তার একটা ডগায় রতন বাগ্‌দীর অবস্থান, সে সিংদের পাঁচ বিঘে জমি ভাগে চাষ করত, সেও আজ শুকিয়ে গেছে।

মথুরের মুখের হাসি মিলাল না, চিন্তা করতে করতে বললে, 'হোক গে মড়াচির, তুমার ত মণ্ডলদের দু' বিঘা ভাগে রইচে, তাই চাষ কর কেনে। ভূ-মাটি, সে কি তুমার বাঁজা পড়ে থাকবেক না কি। অঁক্‌ ··'

হঠাৎ কী হল মথুরের, যেন হ্যাঁচ্‌কায় ওখান থেকে ছিট্‌কে গেল ও। হনহন করে মাঠের আল ধরে চলে গেল, আর বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে রইল রতন।

মথুর কৌড়ির ঠাকুর্দারা দু' ভাই, কিষ্ট কৌড়ির দুই ছেলে, তাদেরও প্রত্যেকের দুই ছেলে। অর্থাৎ মথুররাও দু' ভাই, তার অন্য ভাই থাকে ক্ষীরপাইয়ে। কিন্তু মথুর কৌড়ির বেলাতেই তাদের বংশধারার ব্যতিক্রম হয়েছিল।

তার ছেলে ছিল একটাই, বংশী। গোপবৃত্তি ওদের পুরুষানুক্রমিক পেশা। আঠারো বছরের বংশী, বাচ্চা শালের মতো চেহারা, সে দেখবার মতো। গরুর পাল নিয়ে সে গিয়েছিল মাঠে, পড়েছিল ঝড়ের মধ্যে, তাকে ফিরে আসতে হয়নি। বজ্রাঘাতে পাঁচটা গরু আর বংশী মরে পড়েছিল—অনেক রাত্রে গিয়ে মথুর বয়ে এনেছিল ছেলেটাকে। তার আর ছেলেপিলে নেই, হয়ও নি। তার বউ গিরিবালা সেই শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি, 'নির্বংশ' হওয়ার কথাটা তারও আঁতে খোঁচা মারে। বউকে সে বোঝায়, 'কেনে, আমার ভাইয়ের ত বেটাবেটী আছে, তারাই পিণ্ডি দিবেক···' আর তাই বলে নিজেও সান্ত্বনা পায়। রতন দিগারকে যে সে বলেছিল, ভূমাটির বাঁজা থাকার কথা, সেইটে ওর বেদনার জায়গায় সজোরে ঘা মেরেছিল।

মাঠটা পেরিয়ে বড় রাস্তাটা ধরতে তার পায়ের গতি একটু শ্লথ হল। রাইস মিলের দিকে এগোচ্ছিল ও। এক সময় মিলটা পেরিয়ে গেল। কতকগুলো সওদা সে বরাবর ছিরু মুদির দোকানেই করে থাকে, একটু দূর হলেও। আজ তার কেনা-কাটার কিছু ছিল না, তবু সেখানেই যাচ্ছিল ও। তার দোকানটা বাঁকুড়া-মেদিনীপুর-খড়্গপুর পাকা সড়কের ওপর, চণ্ডীতলায়, জায়গাটা একটা ছোটখাটো গঞ্জের মতো হয়েছে।

মিলের কাছ দিয়ে যাবার সময় দেখলে, সামনে একটা লোকও নেই, আগে সব সময়ই গমগম্ করত। সদরের বড় দরজাটা বন্ধ, দেখলেই মনে হয় অনেকদিন খোলা হয়নি। কিন্তু দক্ষিণ দেয়ালের পাশে আসতেই ভেতরে একটা কোলাহল শুনতে পেলে, এগোতে গিয়ে বাড়তে লাগল সেটা। খানিকটা থাকার পর দেওয়ালটা বাঁশ আর করোগেট টিন দিয়ে তৈরি হয়েছে। সেইখানে আসতেই বুঝল ভেতর থেকে হল্লাটা আসছে। রাস্তা থেকে নেমে দুই টিনের মাঝখানের ফাঁকে চোখ রাখল ও। চাতালে দশ-পনেরোটা ছোট-বড় ছেলে জুটেছে, দেয়াল টপকে ঢুকে থাকবে, চিকা-হাডুডু খেলতে লেগেছে। 'ছুঁচা, চামচিকার গুষ্টি ·' মন্তব্য করে আবার পথের ওপর ফিরে এল মথুর। মনে মনে হাসল ও। আর ঠিক তখনই ওর মনে হল, রতন বাগ্দীর কাছ থেকে অমনি করে চলে আসাটা তার ভালো হয়নি।

পাকা সড়কের কাছে চণ্ডীতলায় এসে গেল মথুর কৌড়ি। এটা একটা বাস-স্টপ, চাঁদসোল থেকে বাইরে যাবার ঘাট। এখানে সেই রাডার-ডিটেকশন-টাওয়ার তৈরি হচ্ছে, যেটা মাছের চালানিতে যাবার সময় পচাইরা দেখেছিল। মথুরও ওখানে না থেমে চলতে চলতে চোখের ওপর হাতের তেলো রেখে

টাওয়ারের চূড়োটা দেখলে। নিচে যে বনিয়াদ অসমাপ্ত ছিল সেটা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। শুনেছে যে যন্ত্রটা শীগ্রিই কাজ করতে আরম্ভ করবে।

'তারপর, মথুরদাদা, কী মনে করে · ' দোকানী ছিরু ওকে সমাদরে ডাকলে।

আর একজন বললে, 'তুমাদের চাঁদসোলের খপর কী বল দিকিনি। সিংবাবুর খুনের কিনারা হল কিছু ?'

'কাকা, তুমি এখেনট'য় বস কেনে···' ঝাঁপের নিচে বেঞ্চিটায় যারা বসেছিল, তাদের একজন পাশে জায়গা করে দিনে।

সতেরো

এই দুটো মাস চাঁদসোল গ্রামের ভিতরে গুমোট, নিঃশ্বাসহীন অবস্থা। লোক চলে যাচ্ছে, যারা আছে তারাও ভয়-খাওয়া, পরস্পরকে বিশ্বাস করে না, চোখের দিকে তাকায় আর দেখে যে সেখানে একই প্রশ্ন, কিন্তু চোখ নামিয়ে নিয়ে চলে যায়। 'কাজ আছে, বাবু···' বলে কেটে পড়ে।

কিন্তু এই গঞ্জটা গ্রামের লাগাও হলেও পাকা সড়কের ওপর, যেখান দিয়ে নাকি বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। বিশেষ করে এই মুদী দোকানটায়—পাশেই একটা চা-মুড়িমুড়কি-বাতাসার দোকানও আছে গল্প জমে, পরচর্চা, পরনিন্দা, গ্রাম্য দলাদলি আর রাজনীতির কথা কিছুই বাদ যায় না। মুদি দোকানের মালিক ছিরুও বেশ অভিজ্ঞ ব্যক্তি, মথুরেরই মতো, সেই বিয়াল্লিশী আমলে একবার ঝোঁকের বশে জেলে গিয়েছিল। তারপর সে রাজনীতি ছেড়েছে, কিন্তু তার ওঠাপড়ার সঙ্গে একেবারে অপরিচিত নয়।

তাই এরা যখন তাকে সমাদরে ডেকে নিলে, তখন মথুর কিছুক্ষণ আগেকার ঘটনাগুলো ভুলে গেল। ওর মজলিসী ভাবটা মাথা তুলতে আরম্ভ করল। বেঞ্চিটায় বসে ছিরুর দেওয়া একটা বিড়িতে টান মেরে দোকানের ভিতরে-বাইরে কারা আছে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে।

'মথুরদা, গাঁয়ের খপর কী বল দিকি, তুমি মাতব্বর লোক, তুমার কাছ থেকেই সব পাওয়া যাবেক, হুঁ···'

অন্যেরা সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়ল আর শব্দ করল।

'গাঁয়ের খপর কী আর দিব-বল ··' মথুর ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'আজ দুফরে গেছলম সামতালপাড়া, সিখেন থিকেই আসছি, সোজা! উয়ারা ইবারে বড়ম

পূজা করবেক নাই, ত আমিও ছাড়ব নাই। শেষে রাজী করালম, তবে এলম।'

'থালে একটা রাত বেশ আসছে বল, পচুই আর মাংসের চাট···'

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন যোগ করলে, 'নাচগান আর মাদলের ধিতাং ধিনা ·· থালে চাঁদসোলের মড়াচিরে ফুল ফুটছে বল!'

চকিত হয়ে উঠল মথুর, একটু আগে মাঠের মধ্যে রতন দিগার মড়াচির কথাটা উল্লেখ করেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একবার চমকে উঠতে হল তাকে, চায়ের দোকান থেকে উঠে এসে এক ছোকরা কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'গণপতি সিংকে খতম করল কোন দল, আপনি তো এক মোড়ল লোক, আপনার কাকে সন্দেহ হয়?'

প্রশ্নের হঠকারিতায় চমকে উঠল সবাই, কেননা গল্পগুজব হলেই সকলে বুঝত এ প্রশ্ন নিষিদ্ধ। কিন্তু মুহূর্ত পরেই মথুর কৌড়ি জোরালো কিন্তু ধরা-ধরা গলায় হেসে উঠল, গলার শির ফুলিয়ে। তারপর বললে, 'পুলিস দারগা-মাজিস্টর, তা কমসে কম দশবিশ বার ই গ্রামে এল, শ'য়ে শ'য়ে লোককে শুধাল, ওই কথা, তুমি কিছু জান? কাকে তুমার সন্দ হয়? তা সিংগিন্নী, সিংপো বল, আর ছোট-লোক চাষাভুষা বল, সবাই বলে, জানি নাই। থালে দেখ, আমারই বা কাকে সন্দ হবেক?' বলে থামল মথুর, চারদিকে তাকিয়ে নিলে, ওর চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে, 'আর মনের কথা যদি বল, থালে আমি তুমাকে বলব, শালা, তুমি খুনে, আর তুমি আমাকে বলবে, শালা, তুমি খুনে '

ওর বলা শেষ হল না, সবাই হেসে উঠল, হাসতেও থাকল কিছুক্ষণ।

'বুঝ থালে ··' মথুরের গম্ভীর কণ্ঠস্বর, বোঝা গেল ওর আরো কিছু বলার আছে। সবাই থেমে গিয়ে মনোযোগী হল আবার।

'ই শুধু আজকের বেত্তান্ত লয়, কেউ কুনু দিন কাকেও বলবেক নাই, এই হল ই তল্লাটের মানুষের কথা। ই দেশটা কী জান · চলে যাও উত্তুরে বিষ্টুফুর-বাঁকুড়ো, আরো উত্তুরে বীরভুঁই, আর দক্ষিণে ময়নাগড়-বিনফুর · সব বাগদী-সামতাল-মল্লদের ভুঁই, এই সিদিন পয্যন্ত ছিল ইসব · বাপ-ঠাকুদ্দা-খুড়া-জ্যাঠা সব ঠগী-ঠ্যাঙাড়ে, ঘর করছে এক সঙ্গে, চাষ করছে এক জমিএ, এক খামারে ধান-কপি-কলাই তুলছে কিন্তু কিছু বলছে নাই কেউ কাকেও। শুধাবেক নাই, চিনবেক নাই। রেতের আঁধার যদি হল ত সব আড়াল পড়ে গেল, কেউ কারো মুখ দেখবেক নাই। কে কুথা গেল-রইল ঘরের মশা-মাছি জানবেক নাই। সকাল হল ত আবার যেমনকে তেমন। হয় লয় শুধাও কেনে উয়াকে, উই যে ছিরু বাবু বসে আছে দোকান ঘরের গদির উপর, পথের পাশে দোকান, হ্যা-

হ্যা···বয়েসকালে হয়ত দিনের বেলায় চলছে মুদির বেচাকেনা, সাঁঝের বেলায় ঝাঁপ ফেললেক ত ফেললেক, হয়ত রেতের বেলা এই পাকা সড়কের উপরেই ফেললে ঠক্‌রা জাল, বল কেনে, আমি নিজে ঠকে শিখেছি···বল কেনে ছিরু · '

টেনে টেনে হাসতে লাগল ছিরু, 'হুঁ, ওই রকমই দেশটা' ছিল বটেক।'

'মানে, আপনি এক কালে ঠ্যাঙাড়ে ছিলেন?' সেই ছোকরা ছিরু মুদীকে প্রশ্ন করল, তার কণ্ঠে বিস্ময় আর কৌতূহল।

'অ্যাই-অ্যাই···' মথুর কৌড়িও এবার টেনে টেনে হাসতে লাগল, ছিরুব প্রতিধ্বনির মতো। 'তুমরা এই না শুনলে গ', ঠ্যাঙাড়ে কথা কয় না, গুরুর দিলাসা আছে নাই?'

আবার হাসল সবাই। মথুর বললে, 'তবে সে মানুষ নাই, বীর নাই, তেজী জুয়ান নাই, তখন ছিল বাঘ-সিংহ, এখন সব ছাগল-শিয়াল।'

ছিরু খানিক বিষন্ন স্বরে এবং যেন স্মৃতিচারণ করছে এমনিভাবে বললে, 'কেনে এমনিধারা সব হল বল দিকিনি, মথুরদাদা ·

সেই ছোকরা কিন্তু বলে উঠল, 'ছাগল-শিয়াল হয়েছে বটে, তবে সেই ছাগল-শিয়ালেই সিংহকে খতম করছে, দুঃখ কি!'

মথুর বললে, 'বেড়ে, বেড়ে বলেছ হে ছোকরা ·

ঠিক সেই সময় মেঘ ডেকে উঠল গুড়গুড় করে, আব বাতাস উঠল গাছপালার মধ্যে সরসরিয়ে। আকাশের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার চোখ ফিরিয়ে নিলে সবাই, একবার মথুর কৌড়ি আবার সেই ছোকরার দিকে তাকাল। ইচ্ছে যে গল্পটা চলুক। পরক্ষণেই ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামল।

আঠারো

বৃষ্টিটা বেশ জোরেই নেমেছিল। সেই ছোকরার সঙ্গে আরো অনেকে চলে গেছে বৃষ্টি মাথায় করেই, খদ্দেররা তো ছিলই না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে খানিকক্ষণ হল। বৃষ্টির জন্য মনে হচ্ছে রাত অনেকখানি। ছিরু মুদি দোকানের ঝাঁপটা আদ্ধেক নামিয়ে দিয়েছে, ভেতরে জ্বলছে কেরোসিনের চৌকো লণ্ঠন, গরুর গাড়ির গাড়োয়ানেরা যেরকমটা ব্যবহার করে। এখন দোকানের ভিতর—ছিরু মুদি, মথুর কৌড়ি ছাড়া আরো দুজন, এরাও মাঝে-মধ্যের খরিদ্দার, এখন আড্ডাধারী।

ছিরু ইতস্তত করে এক সময় মথুরকে সম্বোধন করে বললে, 'দাদা, বল ভাঁড় বের করি একট', এখেনেই আছে…'

ব্যাপারটা বুঝে হেসে উঠল মথুর, 'না হে, আজ লয়, সামতাল পাড়ায় আজ এক বাটি হেঁড়ে খেয়েছি, আর সহ্য হবেক নাই, তবে তুমাদের চলুক।'

অন্য দুজন খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল, প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে বললে, 'না না, সেইট' আবার হয় না কি, মথুরদাদা পেসাদী না করে দিলে ··'

ছিরু উঠে গিয়ে দোকানের পিছনে মালঝালের আড়াল থেকে একটা হাঁড়ি বের করলে, মহুয়া ফুলের বাখর মেশানো পচুই। মাটির ছোট খুরিতে করে ওদের কথামতো মথুর কৌড়িকে প্রথম দিলে, তারপর নিজেদের ভাগ নিল।

এখন পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ বদলে গেল। বাইরে অবিরাম জলের ঝিরঝিরে শব্দ। বাতাসে লণ্ঠনের শিখা কাচের আড়ালে কাঁপছে, আর ওদের মুখে ছায়া নাচছে পতপত করে, চোখগুলো ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

মথুরকে আবার গল্প করার মেজাজ পেয়ে বসল, শ্রোতারাও উৎসুক। প্রকৃতপক্ষে মথুরের মুখে নানা ধরনের গল্প ওরা আগেও শুনেছে, এখনও শুনতে ভালোবাসে, তাতে পুনরাবৃত্তি হলেও ওদের খারাপ লাগে না।

ছিরু হঠাৎ বলে উঠল, 'তুমি তখন ঠিক বলেছিলে, মথুরদাদা, সেসব দিনকাল আর নাই, সে মানুষও নাই!'

'ভূমাটিও নাই সেরকম, তাই বল ··' মথুর বললে।

'কী রকম বল দিকি, মথুরদাদা?'

'তখন ছিল না কি এই রকম এত মাঠঘাট, রাস্তাসড়ক! তখন শুধু বন আর বন, এক পাল মোষ আর দু' পাল গরু তাড়িয়ে ঠাকুদ্দা কিষ্ট কৌড়ির বাপ গোবিন্দ কৌড়ি এসেছিল ইখেনে। সে সব ঘাসের জঙ্গলই কী রকম, এক মানুষ দু' মানুষ উঁচা, ত তার মধ্যে বাঘ লুকায় থাকবেক। কত বাঘে-মোষে লড়ায়ের কথা শুনেছি ঠাকুদ্দার মুখে, মানুষই তখন লাঠি হাতে বাঘের সামাল দিতে পারত!'

বিচিত্র সব কথা। ধীরে ধীরে একটা অন্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে উঠল। এ অঞ্চলের লোকেরা লড়াই করেছে, মানুষের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, বন্য পশুর সঙ্গে। মেরেছে, মরেছে। এ যুগের নীতিবোধের সঙ্গে তখনকার নীতিবোধের মিল নেই।

'তবে আমি বলছি শুন, ছিরু, মুখে ছাগল-শিয়াল যাই বলি, সেই তাদেরই

ত বংশ ইয়ারা, এই তুমার মাহাতো-সামতাল-বাগদী, এই আমরা রাজপুত…'
মথুর তখন নির্বংশ হবার বেদনা ভুলে গিয়েছিল।

'আচ্ছা, মথুরদাদা, তুমি যে তখন বলছিলে, তুমি ঠক্‌রা জালে পড়েছিলে একবার, ত সেইট' বল দিকি…'

'কে বললেক আমি ঠক্‌রা জালে পড়েছিলম ' চোখ বড় বড় হয়ে উঠল মথুরের, 'আমাকে জালে ধরবেক এমন বাপের বেটা কেউ আছে?'

'সেইট' ঠিক, তা ঠিক…' ওরা এক বাক্যে স্বীকার করলে, মথুরের চওড়া বুকের পাটা আর সুগঠিত দীর্ঘ বাহুর দিকে তাকিয়ে।

'বুঝলে ছিরু, তখন আমার ধরগা ভর বয়স, লাঠি ধরতে পারতম, হালের ছঁড়ার মতন লাঠি লয়, বাপের কাছে শিক্ষা, আশেপাশে পাঁচট' গাঁয়ে নামডাক ছিল। তখন আমাদের ছিল গরুর বাথান, এখন আমার দু'গণ্ডা গরু নাই, তখন কুড়ি মাপে গণতে হত, যাকগে উসব। গেছি সেদিন শালবনিতে, শহরে দুধের ব্যবসা ছিল, তিন মাসের টাকা বাকি পড়েছিল, বাবা বললেক, লিয়ে আয়। গেলম টাকা আনতে, ত দুই মহাজনই টাকা দিলেক, পাঁচ শ দু'কুড়ি টাকা হল, করকরে রূপার টাকা, তুমরা এ্যা-ছি করবে, ই আবার টাকা, কিন্তু সে হল গে এখন বিশ হাজার টাকার সমান! গামছায় বেঁধে ঝোলায় ভরে সাইকেলে উঠব ত এক মহাজন বললেক, উয়াদের ঘরে কী সব ফিষ্টি-টিষ্টি আছে, খেয়ে যেতে। বললম, রাত হয়ে যাবেক যে গ'। তা হউক রাত, থাকতে হবেক। তা শুন, খাওয়ার গন্ধ পেলে আমি সাঁটকে গেছি, বুঝলে হে, হাঃ-হাঃ…. তা খেলম, বাবু, মাংসের একট' জাম্বাটি, আমাদের পুরখা-পুরুষ চার সেরী ভাত খেতে পারত, ত আমি সেদিন খেইছিলম দু বালতি, ভাত, হাঃ-হাঃ.. '

'মহাজন বললেক, মথুর, রাতে আর ঘর যেও নাই, পথের আবস্থা আজকাল ভাল লয়, ত আমি বললম, যাব। সাইকেলে উঠে পোঁ-পোঁ করে চালাচ্ছি। দেহট' একটু ভার-ভার লাগছে, খাওয়ার পর যাচ্ছি কি না। ত হল কি, সব পথট' এলম, ঠিক এখেনট'য়, এই বাঁকট'র একটু উদিকে, বল যে ঘরের কপাটের কাছে এক রকম, কী রকম গন্ধ-গন্ধ পেলম, এগাব কি এগাব নাই…কিছু একট' আছে লিশ্চয়…ত দেখবার জন্যে আর একটু এগাইছি, আড়বাতি পড়ল পথে। বুঝলে নাই? জঙ্গলের ভিতর থেকে পথের উপর সরু আলো পড়ল। কে যায়?—হাঁকল…যাস্‌ শালা:, গলাট' কচি, দুধের ছেলে, ঈশ্বর বামুনের বড় বেটা। আমি হাঁকলম, গোপাল, তুই ইখেনে, বনের বাইরে আয়। উত্তর দিলে, মথুরকা, তুমি! চলে যাও। বললম, আয় তুই বার

হয়ে, কী করছিস এখেনে? বললেক, ঠক্‌রা জাল পেতেছি। বার আমি হব নাই, তুমি চলে যাও কেনে। ত এলম চলে!' বলে মথুর টেনে টেনে হাসতে লাগল, ওরাও হাসিতে যোগ দিলে।

উনিশ

এরপর আরো কিছুটা সময় কেটে গেছে। মথুর কৌড়ি এখন গ্রামের পথে একা একা ঘরে ফিরছে। বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। রাত্রে গ্রামে চলাফেরা করতে ওর ভয় নেই। এই দু' মাস ধরে গাঁয়ের লোক সন্ধ্যার আগে যে যার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে, ওর সে বালাই ছিল না। 'আমাকে মারবেক কুন বাপের বেটা আছে, আসুক দিকি' মথুর বলে। এমনভাবে ও চলাফেরা করে, যাতে মনে হয় সমস্ত এলাকাটাই ওর পৈতৃক সম্পত্তি। গর্ব আছে, বুকে সাহস আছে।

গ্রামের পথে মথুর যখন ফিরছে তখন সমস্ত দুপুর বিকেল আর সন্ধ্যে ধরে যে সমস্ত কথা ও শুনেছে আর বলেছে, সেই সব মনে হতে লাগল। পুরনো কালের কথা, ওর পূর্বপুরুষের কাহিনী। নিজের ছোট বেলায় যা ও দেখেছে, তারও আগে বাপের আমলে, ঠাকুর্দার আমলে -এই সব জায়গায় বড় বড় ঘাসের বন, সে কী বিরাট শাল মহুয়ার জঙ্গল। মানুষ তখন খেতে পারত। গায়ে জোর ছিল।

হঠাৎ পা পিছলাবার মতো হল, একটা জায়গায় নালা পেরোতে গিয়ে। সামলে নিলে। ঠাণ্ডা বাতাসে পচুইয়ের নেশার আমেজটা কেটে আসতে লাগল। এখানকার সবাই পুরুষানুক্রমে হেঁড়িয়া, পচুই খেয়ে আসছে, এরা মাতাল হয় না। পরিমিতভাবে খেলে শরীর ভালো থাকে। কাজের শক্তি পাওয়া যায়।

বৃষ্টি থেমে গেছে, বাতাসে সোঁদা গন্ধ। মাটির ডাক উঠছে, মাটির মানুষরা সেটা অনুভব করে। আষাঢ় মাস, কিন্তু অন্য বছরের মতো চাষের ধুম পড়ে যায়নি। বৃষ্টি তো শুরু হল -মথুর বুঝতে পারে এটা গরমির বৃষ্টি নয়, বর্ষা শুরু হয়ে গেছে।

কিন্তু যতই ঘরের কাছাকাছি আসতে লাগল মথুর, ততই ওর মনটা সচকিত হয়ে উঠল। বউটার মাথায় ছিট আছে। ছেলে মরে গেছে, এক মাত্র ছেলে— মথুর সেটার দুঃখ বোঝে না তা নয়, কিন্তু প্যানপ্যানানি সহ্য করতে পারে না। তার নিজেরই বুকের মধ্যে কষ্টের মতো আছে। গ্রামের সবার সঙ্গে,

বিশেষত সাঁওতালদের সঙ্গে তার মেলামেশা বউ পছন্দ করে না—সে নিয়ে খিটিমিটি লেগেই আছে। গোচালাটার কাছে এসেই ও একটু দাঁড়িয়ে পড়ল। খোলা চালাটা, গরুগুলো সব ঠিক জায়গায় আছে দেখতে পেলে। সাতটা গরু, তার মধ্যে চারটে দুধাল, বাছুরও আছে, আর আছে একটা মারকুট্টে ষাঁড়, মথুরের খুব প্রিয়। সে দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল মথুরের—নিজের দারিদ্র্যের জন্য। তাদেরই কুড়ি-কুড়ি গরু ছিল, মহিষ ছিল!

কিন্তু ঘরে ঢুকেই চমকে উঠল মথুর। বউয়ের ভিরকুটি শুরু হবে তার জন্য তৈরিই ছিল সে, কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য রকম, কেউ কোথাও নেই। বউটা গেল কোথায়? আলো জেলে মথুর এঘর-ওঘর দেখল, গোয়ালটা দেখে এল আর একবার, নাম ধরে ডাকল কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। তখন লাঠি আর আলো নিয়ে পাড়ায় খোঁজ করবার জন্য বেরোল। দরজায় শেকল লাগাতে যাচ্ছে, পিছনে পায়ের শব্দে ফিরে দাঁড়াল ও, গিরিবালা ভিজে জবজবে হয়ে ফিরে আসছে।

'বড়কী, কুথা গেছলি তুই, ভিজেছিস কেনে?' গরগর করে উঠল মথুরের গলা।

লণ্ঠনের আলোতে দেখা গেল, ভয়ে গিরিবালার চোখের তারা কাঁপছে, যদিও সে বুড়ি হয়ে গেছে, মাথার চুলে পাক ধরেছে। ভয়ে, হয়তো ভিজে ঠাণ্ডায় গিরিবালার গলাটা কাঁপা-কাঁপা মনে হল, 'বলছি, বলছি, দোর ছাড় দিকি আগে, ঘরে ঢুকে কাপড়ট' পালটাই…'

ভিতরের বারান্দায় কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল মথুর, কিন্তু তার চোখ দুটো জ্বলছিল। গিরিবালা ঘরের ভিতর থেকে শুকনো কাপড় পরে এসে ওর সামনে দাঁড়াল, ওর চোখের দিকে একবার তাকিয়েই মুখ নিচু করল, হাসল এক রকম করে—ভয়-পাওয়া কিন্তু আরো কিছু যেন ছিল।

'তুমি কিছু বলবে নাই বল আগে, বল…' কাঁচুমাচু স্বরে বললে গিরি।

'ঠিক করে বল, শুনব ত আগে…'

গিরি বলতে আরম্ভ করল কিন্তু মথুর প্রথমটা তার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছিল না।

'আজকে অষ্টমীর দিন, লয়?'

'হঁ, হবেক বা, তার হইচে কী?'

এর পরের কথাটা বলতে গিয়ে গিরির গলা ভার হয়ে এল, চোখের জল বাধা মানল না। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, 'তুমার মনে আছে, যেখেনে বজ্জপাত

হইছিল, সেই যে গ', তেগাছার উদিকটায়, যেখেনে বংশী, আমার মরণ হল নাই ··' আর পারছিল না গিরি, কিন্তু না বললেও নয়। সে জানাল, মাঠের যেখানে বংশী মরেছিল, সন্ধ্যের পর সেখানেই গিয়েছিল। কে ওকে বলেছে, শুক্ল পক্ষের অষ্টমীর রাত্রে সেখানে গিয়ে ছেলের কথা মনে মনে ভাবতে হয়, মাটি তুলে নিয়ে পেটে বুলোতে হয়, তাহলে ছেলে ফিরে আসে। বৃষ্টি হয়েছে, সেটা নাকি আরো ভালো লক্ষণ।

এক রকম ডিগবাজি খেয়ে গেল মথুর, কী আশঙ্কা করেছিল সে আর এই কী ব্যাপার। হা হা করে হেসে উঠল সে। বউকে হাত ধরে বুকে টেনে নিল, পাগলামি করল, তারপর আবার একটু দূরে বসিয়ে দিল, নিজেও বসল মুখোমুখি।

'বডকী, সত্যি তাই হয়? কে বলেছে তোকে···হবেক, হবেক, বংশী ফিরে আসবেক আবার···' বুক ভরে শ্বাস নিলে ও।

কতক্ষণ পরে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল মথুর, বললে, 'তুই রান্না চড়া দিকি, আমি আসছি এক্ষুনি···'

হ্যাবাচাকা গিরিকে কোনো কৈফিয়ত না দিয়েই হনহন করে বেরিয়ে গেল মথুর, এবারে লাঠি আর আলো না নিয়েই।

অনেকটা পথ, কিন্তু এক লহমায় বিকেলের সেই রতন দিগারের ঘরে এসে মথুর হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করে দিলে। এবার রতনকেই হকচকিয়ে দিলে ও।

'তুমি পাঁচ সের ধান পেইচ, রতন?'

'না, কাল যেতে বলেচে, কেনে বল দিকি?'

'তুমি শুধাইছিলে নাই চাষ করবে, কি করবে নাই? চাষ ঠিক করবে তুমি, ভূ-মাটি কি বাঁজা থাকবেক, হঁ?'

একথা তো বিকেলেই বলেছিল মথুর, তাই রতন ঠিক বুঝতে পারছিল না, এখনকার বলার পার্থক্যও ওর ধরতে পারার কথা নয়।

'শুন রতন, সিংবাবুদের জমি, মাঠের আদ্ধেক খালি পড়ে আছে। উয়ারা ফিরবেক কি ফিরবেক নাই ভগমান জানে। তাই বলে চাষ হবেক নাই? ভূমাটি হাসবেক নাই? আমার ত জমিজিরেত নাই, তা তুমি ত পাঁচ বিঘা চাষ করতে, হুকুম হোক না হোক, লেগে যাও। আমাকে শুদ্ধ লাও, দুজনে চাষ ত করি, তারপর যা হয় হবেক, কী বল?'

'কিন্তু ধর কেনে, কেউ যখন করছে নাই···'

'রাখ তুমি, ডর কিসের! মথুর কৌড়ি ডর করবেক কুনটোকে, মালিকের

ভাগ মালিককে দিয়ে দিব, বাস·· বাকি তুমার আর আমার। কি বল?'
রতনের বুকে বল ছিল না, সে মিহি স্বরে সম্মতি জানাল।

কুড়ি

এর দু'এক ঘণ্টা আগে, যখন সবে বৃষ্টি ধরে আসছিল, তখন সিংবাড়িতে ওদের পুরনো সর্দার মাহিন্দার লক্ষ্মণ দিগার আর এক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছিল।

গণপতি সিংকে যখন হত্যা করা হয়, তখন লক্ষ্মণ বাড়িতে ছিল না। তার আর ছেলেপিলে ছিল না, একমাত্র মেয়ে দুলালী ছাড়া। বউকে নিয়ে তার শ্বশুর-বাড়ি গিয়েছিল তার তত্ত্ব করার জন্য। ফিরে এল ঘটনার দুদিন পরে, সকালে। পথে আসতে আসতেই রবারবিতে সমস্তই শুনেছিল সে, 'সে কাউকে কিছু না বলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সিংবাড়ির গোশালার এক পাশে চাকরবাকরদের থাকবার ঘর, তারই একটা পেয়েছিল ও। গণপতির বাবা-কর্তার আমলের লোক সে, বয়সে গণপতির থেকে বড়। ছেলেবেলায় বালক-রাখাল হিসেবে ঢুকেছিল, তারপর সমস্ত জীবনটা এখানে কাটিয়েছে।

সিংগিন্নী, নরেনবাবু, আত্মীয়কুটুম্ব সবাই চলে গেছে, কেবল রয়ে গেছে লক্ষ্মণই। তাকেও চলে যেতে বলেছিল সবাই, কখন কেটে রেখে যাবে রাত-বিরেতে—সে কথাতেও কান দেয়নি লক্ষ্মণ। তার বউ বলেছিল জামাইবাড়ি যেতে।

'জামাইঘর পরের ঘর, ই আমার লিজের ঘর, কত্তার বাপ আমাকে দিয়েগেছে। আমি কুথাও যাব নাই·' বলেছিল সে। তারপর এত দিন রয়ে গেছে।

সেদিন রাত্রে বৃষ্টি থামতে লক্ষ্মণ টিনের 'লম্ফ'টা নিয়ে দরজা খুলে গোয়াল-চালার দিকে এগোচ্ছিল। হঠাৎ বৃষ্টি এসে পড়াতে তখনো যে কটা গরু অবশিষ্ট ছিল তাদের জাবনা দেওয়া হয়নি, এখন দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু দু'এক পা গিয়েই থমকে গেল ও, কাঁঠাল গাছের তলায় যেখানে ধান সেদ্ধ হবার উনুন, সেখানে কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল ওর, কিন্তু পরক্ষণেই স্থির করল নিজেকে। ভালো করে ঠাওর করে দেখল। একে টিমটিমে আলো, তায় বাতাস দিচ্ছে, ঠিক বোঝা যায় না, তবে মানুষ বটে।

'কে, কে তুমি উথেনে···' কেউ সাড়া দিল না, কিন্তু বড়বাড়ির দোতলায় ধপাস করে কী পড়ার শব্দ হল। আবার চমকে উঠল লক্ষ্মণ। সেই সময়

আলোটাও গেল নিবে। আন্দাজে পাশের দিকে সরে গেল সে, বিকেল বেলায় যেখানে কোদাল রেখেছিল সেখানে পৌঁছে সেটা হাতে তুলে নিলে।

'কে তুই, রা কাড়িস নাই কেনে, শালার বেটা খুন করতে এস্‌ছিস, আয় কেনে, এই কদাল দিয়ে ঘিলু ফাটায় দিব আয় শালা, মনে করেছিস কত্তার মতন বসে বসে গলা বাড়ায় দিব, হুঁ ' লক্ষ্মণের স্বর উত্তেজিত কিন্তু যে কেউ লক্ষ করলে বুঝত গলার স্বরে ওর শক্তিহীন দেহটা থরথর করে কাঁপছে।

'ও গো, তুমি পালায় এস না গো, পালায় এস না গো ' বুড়ি পিছনে কোথাও, সম্ভবত ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে চিঁচিঁ করছিল।

'লক্ষ্মণদা, আমি গ' আমি, লারাণ জেলে…' অন্ধকারের থেকে বললে।

'কে লারাণ জেলে ?'

'ই গাঁয়ের লয়, পাশের গাঁয়ের লারাণ জেলে, তুমাদের (মানে, সিংবাবুদের) মাছ চাষ মাছ ধরা করি আমি। তুমার দিব্বি, কদাল টদাল ফিরে মারবে নাই · গলার রাও চিনতে পারলে নাই গ' ?'

লক্ষ্মণ অস্ফুটে শব্দ করল একটা, বোঝা গেল চিনতে পেরেছে।

'তা, তুমি কেনে এসছ ? বল আগে · কাকেও বিশ্বাস নাই, লরলোকে এখন লোক খায় '

অন্ধকারে সব একটু চুপচাপ, তারপর লারাণ কাঁচুমাচু স্বরে বললে, তুমার কাছেই এস্‌ছিলম লক্ষ্মণদা। তা তুমি আগে লম্ফটা জ্বাল. ঠাওর কর আমাকে, তুমার ঘরে একটু বসতে দাও, দুট' কথা কইতে এস্‌ছিলম আর কি. কেউ ত কথা কয় নাই আজকাল '

'হুঁ-হুঁ, তুমরা ঘরে এস কেনে, বাপু, উখেনে আর থাকতে হবেক নাই · ' বুড়ির গলাটা এবার পরিষ্কার। ফস করে একটা দেশলাই জেলে বললে, 'লম্ফট' কুথা ফেললে না কি, লিয়ে এস।'

একুশ

লক্ষ্মণের ঘরের মেঝেতে বসেছে দুজনে, দুজনেই সমান বুড়ো, গায়ের চামড়া লোল হয়েছে, পাকা চুল, তবে লক্ষ্মণের গায়ের রঙ একটু সাফার দিকে, আর লারাণ বেশি লম্বা, একটু শক্ত। বুড়ি লারাণকে চারটি মুড়ি খেতে বলেছিল, সে খায়-নি, তখন কোণের দিকে বুড়ি তার ত্যালাই-কাঁথার ওপর গিয়ে শুয়েছে, পিটপিট

করে তাকাচ্ছে ওদের দিকে। তাদের ঘরে আবার যে লোক এসে বসেছে সেটাই যেন সে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

'তারপর, কী খপর বল দিকি, লারাণ, তুমি রেতের বেলায় এস্‌ছ কেনে?' মনে হল লক্ষ্মণ খুবই ক্লান্ত, একটু আগেকার উত্তেজনা ওর বুড়ো হাড়ে ধাক্কা মেরেছিল।

'দিনের বেলাকে কতবার এস্‌ব বলে মেনেছি, কিন্তুক কী জান, পাড়ার লোক সব অন্য রকম সন্দ করে, বলবে সিংবাড়িএ যায় কেনে, তুমি যথাত্ত বলেছ, লরলোকে লরলোক খায়··· ত পরানট' আকুলিবিকুলি করে, তাই রেতের বেলায় এলম···'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লক্ষ্মণ ওর দিকে তাকাল, ঘোলাটে চোখ, তার ওপর টিমটিমে আলো পড়েছে, ওর সেই চাউনির মানে বোঝা গেল না।

লারাণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে উঠল, 'লক্ষ্মণদা, কী রকম বুঝছ বল দিকি, বাতাস উল্টা দিকে ঘিরবেক কিছু? ই যে আর সহ্য করা যাচ্ছে নাই।'

লক্ষ্মণ তবু যেন কিছু বুঝতে পারছে না এমনিভাবে তাকিয়ে রইল। লারাণ জিজ্ঞেস করলে, 'আছা, সিংবাবুদের সব গেল কুথা বল দিকি? এত সব চাষের জমিজায়গা, আষাঢ মাস পডে গেল, সব কি গোভাগাড হয়ে থাকবেক?'

'হঁ, সব যাবেক, ত তুমার আমার কী, বল·'

'না, তাই বলছিলম···' থতমত খেয়ে থেমে গেল লারাণ।

তখন লক্ষ্মণই যেন খানিকটা উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'সাতগণ্ডা আর দুট' গরু ছিল, গাই-বলদ, ত ব্যাপার দেখ, যদ্দিন খড়কুটা ছিল টেনে টেনে খাআলম, মিল বন্ধ, কুঁড়া নাই, কুথা পাব, মাসটাক পরে দিলম সাতট'কে ছেড়ে, তারপর আরো দু'ট'কে ছেড়েচি, সেগুলা যে কুথা গেছে জানি নাই· তুমি বল দিকি, কী করে চালাই আমি।'

বুড়ি বললে, 'আমাদের খরাকী দিবেক কে, গাঁটে যা ছিল তাই খাচ্ছি আমরা, তায় গরুকে খাআব কী, আমাদেরই না খেয়ে মরতে হবেক···'

'ইযার কি কুন্থ পিতিবিধান নাই, অঁ?' লারাণের কণ্ঠস্বরে কাতরতা ফুটে উঠল।

লক্ষ্মণ বললে, 'শুনি ত অনেক রকম কথা। গিন্নীমা না কি আসবেক, মিলট' চালু করবেক, গরমেণ্ট' নাকি চাপ দিইচে, বলছে মিল চালু না করলে বাজেপ্ত করে লিবেক, আর ইয়ারা দু'ভাই ভিত্‌রে ভিত্‌রে ভাগাভাগি করে লিইচে

সব। জমিজমা বড়র ভাগে পড়েছে, ত বড়বাবু ভয়তরাসে মানুষ, ই গাঁয়ে তিনি আর আসবেক নাই। থালেই বুঝ সব যাবেক!'

'কেনে, বড়বাবু যদি না এসেন, ত সরকার-গমস্তা আছে, তারা ব্যবস্থ করতে পারবেক, বলে খঁড়া ত খঁড়া, চল ত চল, একবার চালু হলে ··'

'সেইট' হবেক নাই, লারাণ, সেইট' হবেক নাই, সব সরকার-গমস্তার চাকরি জবাব দিই দেছে গিন্নীমা।'

'কেনে, সবাইকে ত দেখি, তারক বাবু '

'থু-থু, এক লম্বর বদমাইস, লুচ্চা, উই ত বাবুকে খেলে, বুঝলে লারাণ, আছি ত এখেনে, কচি কাচা ঝি-বাউ'ল বাবুদের ঘরে এস্‌বার জো নাই, ত উয়ার লজর পড়ল·· ত গিন্নীমা মুয়ের উপরে বলে দিলেক ' বলতে বলতে গর্বিত হয়ে উঠল লক্ষ্মণ, 'গিন্নীমা আমার ঠটকাটা মানুষ, দিলেক জঁকের মুয়ে মুন, ল্যাজ গুটায় পালাল। বাইরে যেয়ে শাসাইছিল, ইয়ার পিতিশোধ সে লিবেক তবে ছাড়বেক। তারপর তার খপর জানি নাই, ভাই, গেরামে আছে কি যমালায় গেছে '

সে খবরটা লারাণই সরবরাহ করল, তারক হালদার গ্রামেই আছে এবং স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে এসেছে, চাষাভুষাদের সঙ্গে খুব ভাব। শুনে লক্ষ্মণ মন্তব্য করল, 'উটা'ই একটা বুট চাল উয়ার, সাধু হইচে, ভণ্ড সন্ন্যিসি ··' নিশ্বাস ফেলে আবার বললে, 'যাক গা, মরুক গা, আমি ভাবি, লারাণ, উই লরকের কীট, উটা'কে বাবু এত লাই দিলেক কেনে। ছিল কারণ কিছু, কি বল?'

'হঁ, তা বটেক।'

'কিন্তু তুমি কেনে এস্‌ছিলে বললে নাই ত কিছু?'

উত্তরে লারাণ তার দুঃখের কথা জানাল। মাস দু'তিন ছাড়া ছাড়া সিংপুকুরে মাছ ধরে চালান দেওয়া হয়, এখন তার সময় পেরিয়ে গেছে। বিশেষ করে আষাঢ়ে একবার মাছ ধরে নিয়ে তারপর পোনা ছাড়া হয়। এইসব ভাবছিল সে, মনের মধ্যেই গুমরোচ্ছিল, কিন্তু দু'দিন আগে অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে, সেটাই লারাণকে যেন পাথর বানিয়ে দিয়েছে।

'থালে তুমি এতক্ষণ বল নাই কেনে, পেটের ভিত্‌রে রেখে দিইছ, আমি শুধু বকরবকর করলম ·' বিরক্ত সংশয়ী চোখে তাকাল লক্ষ্মণ, মনে হল লারাণের চোখে একটু ধূর্ততা দেখতে পেল।

'না, তাই বলছি···' মুহূর্তের জন্য চোখ দুটো পিটপিট করতে লাগল লারাণের কিন্তু সেটা ঝেড়ে ফেলে সে বলে গেল, 'বুঝালে লক্ষ্মণদা, এই পরশুর আগের

দিন, বিকাল বেলা পুখুরের ধার দিয়ে ঘুরে গেলম, মাছে ঘাই মারছে, বুড়ি কাটছে, দেখে পরানিট' ঠাণ্ডা হয় · কিন্তুক সকালা উঠে দেখি কি, দরজার সামনে একট' রুই মাছ, সেরটাক হবেক। ও হরি, পাড়ায় ঘুম ভেঙে সব হট্টগোল লেগে গেছে দেখলম, সব ঘরের সামনেই কুম্হু না কুম্হু মাছ · আমি দেখেই চিনলম সিংপুখুরের মাছ গেলম ছুটে, পুখুর ধারে, যা ভেবেছিলম তাই, সারা রাত মাছ ধরেছে আর সবাইকে বিলি করে গেছে, কেমন সন্দ হল, পাড়ায় এসে ঘুরে দেখলম একটুন, দেখলম দু'চারট' জাল ভিজা-ভিজা '

লক্ষ্মণ তার সংশয় ভুলে গেল, 'বল কী লারাণ, ইয়ার মধ্যে তুমার পাড়ার লোক আছে?'

'নিচ্চয়, ই আমি বেটার দিলাসা দিই বলতে পারি। কিন্তুক দেখ লক্ষ্মণদা, ই ঠিক চোরের কাজ লয়, ইয়ার মধ্যে অন্য মাথা আছে!'

এখন লক্ষ্মণকেই বিমূঢ় দেখায়, 'তাই ত মনে লেয়, কি বল দিকি।'

লারাণ মাথা নাড়তে লাগল, 'ইসব কী হচ্ছে বুঝাতে লারছি · ' তারপর ফিসফিস করে যোগ করল, 'আচ্ছা, সিংবাবুকে যারা মেরেছে, তারাই কি ইসব করছে, তুমার কী মনে লেয়?'

না, এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর ওদের ধারণার মধ্যে আসছে না।

বাইশ

শাম্‌লীর মা কামিনীর পায়ের ঘা পচে গেছে। হাঁটুর নিচে থেকে সমস্ত পা-টা ফোলা, আলগা পড়ে রয়েছে, কোনো জায়গায় পুঁজ বেরিয়ে সেখানেই শুকিয়ে থাকে, কোনো জায়গায় কাঁচা রক্ত পড়ে। বুড়িটার কখনো জ্বর হয় কখনো কমে, কেউ দেখবার নেই। এই দু'মাসের ওপর হল, কুঁড়ের মধ্যে পড়ে থাকে, হাত, অন্য পাটা আর দেহ কাঠির মতো শুকনো—কখনো খেতে পায় কখনো পায় না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে মরেনি। দিন পাঁচেক হল সাঁওতালদের লুস্‌কি ওর চিকিৎসা আরম্ভ করেছে। কতকগুলি 'জড়ি'—শুকনো শিকড় বা লতা—আর পাতা দিয়ে গেছে, মাটির হাঁড়িতে জলে ফুটিয়ে সেই জল ঠাণ্ডা করে ছেঁকে নিতে হবে, তারপর সেই জল দিয়ে পা ধোয়াতে হবে। লুস্‌কি নিজে দু'দিন করে গেছে, এখন শাম্‌লী করে। চলছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিছু ফল বোঝা যাচ্ছে না।

পচাই আর শাম্‌লী—তাদের মা শয্যাশায়ী হবার পর থেকে—কেন্দ্রচ্যুত

ছিটকে পড়ার মতো হয়েছে। ঘরে এলে—যখন সংঘাতও বাধে না, তখন যেন দূর থেকে দুজন দুজনকে বাঁকা চোখে দেখে।

কাস্তে ঘ্যাচ-ঘ্যাচ করে গণপতি সিংএর গলা কেটেছে এটা নিজের চোখে দেখেছিল শাম্‌লী। তার রক্ত সমস্ত গা আর কাপড়চোপড় বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল। আসবার সময় ঢিল মেরে কাকতাড়ুয়ার মাথাটা ভেঙে খোলামকুচি করে দিয়েছিল সে।

তার পর থেকে সব কিছুকেই সে যেন মনে মনে কুটিকুটি করতে থাকে। ক'দিন থেকেই তার মাথায় ভাপ ওঠে, সেই মিলের চাতালে সেদ্ধ ধান মেলে দেওয়ার কাজের পর থেকে। তার ওপর এই পরিস্থিতি। মাঝে মাঝেই উপোস করতে হয় তাকে, এটা অপরিচিত না হলেও এখন তার মাত্রা বেশি। সিংবাড়িতে আর যায় না সে, সিংবাড়ি তো বন্ধ হয়েই গেছে। তারক হালদার বউ এনে ঘর করছে, এর মধ্যে তাকে আর একবার ডেকে পাঠিয়েছিল খাইদাই ঝির কাজ করবার জন্য, সে যায়নি। লোকটাকে সে আর বড় দেখে না। শুনেছে তার চাকরি গেছে, এখন নিজের জমিতে চাষবাস নিয়েই থাকে।

দুজন মনিষ্যির প্রসঙ্গে ওর মাথায় পোকার মতো ঝিঁঝি লাগিয়ে দেয়। মোহনের সঙ্গে সে আর কথা বলে না, মোহনও তাকে দেখেও দেখে না। ওই ওদিক দিয়ে গরু তাড়িয়ে সে মাঠে যায়, মাছ ধরে, সুতো কাটে, বাঁশি বাজায়—মুশকিল এই, সব কটাই চোখে পড়ে বা কানে শোনে।

আগে যে শাম্‌লী গাজন তুলের ঘরে যেত, কি মাঠে জলখাবার নিয়ে যেত, এখন আর তা করে না। মোহনের একটা ব্যাপার তার মনের মধ্যে পাক দিয়ে নিংড়োতে থাকে যেন। সেই এক রাত্রে সে ব্রাহ্মণভুঁইর জঙ্গলে গিয়েছিল কেন? তারপর আর যেতে দেখেনি—অবশ্য সে লক্ষও করে না। সন্ধ্যের পর সে কি ঘরেই থাকে? বাঁশির সুর ভেসে আসতে শুনেছে সে ঘর থেকে, সাঁওতালি সুর, তার ঘর থেকেই বাজায়, কিন্তু অনেক রাত্রে। সন্ধ্যার পর এতটা রাত্রি সে কি ঘরেই ছিল? একটা অদম্য কৌতূহল তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে চায় যেন —কিন্তু মরুক গে, তার কি?

আর একজন হচ্ছে ওর ছোট ভাই পচাই। ছোঁড়াটা যেন কী রকম হয়ে উঠেছে। ওকে দেখে কখনো বাঁশ কাটা ঘর তৈরির বাচ্চা যোগাড়ে মুনিষ খাটতে, কখনো সে টো-টো করে বামুনপাড়া-সাঁওতালপাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, আজকাল সাঁওতালদের মতো তীরকাঁড় তার হাতে, আগে রাত্রে অন্তত ঘরে শুতে আসত, আজকাল প্রায়ই আসে না। তারপর প্রায়ই না কি সে মটরে

করে মেদিনীপুর-খড়গপুর যায়, সেবার সিংবাবুদের চালানিতে গিয়েছিল, এখন কী জন্যে যায়, কে পাঠায় ওকে? ছোঁড়াটা খেতে পায় ঠিকই, বেশ বড়সড় হচ্ছে, ঘরে খাবার নাই সে জানে, বরঞ্চ মাঝে-সাঝে চালটা-ডালটা এনে দেয়, তারও রুজি-রোজগার আছে! সে সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করলে না-হক ভাষায় শাম্‌লীকে গাল দেয়– আগে সেক্ষেত্রে এড়িয়ে যেত কেবল। কিন্তু একটা জিনিস শাম্‌লীর মনে হয়- সন্দেহের মতো লাগে- মোহনের সঙ্গে পচাইএর কোথাও যোগ আছে, দুজনের খুব ভাব। যেন তাকে টেক্কা দেবার জন্যই জুটি। কিন্তু ওদেরকে এক সঙ্গে দেখেও না যে।

শাম্‌লী নিজে শাকগুগলি তোলে, বুনো মূল তুলে আনে, গেরস্ত বাড়িতে ধান ভেনে দেয়, গাঁয়ে সে রকম বাড়িও কম, তবে এখন মিল বন্ধ হয়ে যাওয়াতে ঢেঁকির খোঁজ পড়েছে। তবু দুবেলা খাবার মতো সাশ্রয় হয় না তাব নিজেরই, তার ওপর মা আছে।

কিছুদিন হল, মিল চাতালের সেই দুলির মার সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছে। প্রৌঢ়া মেয়েটার দোলানি চালচলন আর হাসি-মস্করা তার ভালো লাগে না। কিন্তু মেয়েটাও অভাবী, পেটের ধান্দায় গ্রাম আর গ্রামের বাইরেও তাকে ঘোরাফেরা করতে হয়, মিল বন্ধ হয়ে যাওয়াতে এই রকম অনেক মেয়েকেই নাকানিচুবানি খেতে হচ্ছে।

গ্রামান্তরে যাবার সময় দুলির মা প্রায়ই শাম্‌লীকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। ওদের অভ্যস্ত একই ধানভানা, সেদ্ধশুকনোর কাজ, নয়তো কখনো 'কাজ'-বাড়িতে সাময়িক ঝিগিরি। লাত্‌নী সম্পর্কটা ধরে রেখেছে সেই প্রথম দিন থেকে, সেই সূত্রে তাকে 'অস'-এর ইঙ্গিতও করে ঠাট্টায় পরিহাসে, কিন্তু তাকে আবার অভিভাবিকার মতো আগলেও রাখে।

একদিন একটু দূরেই যেতে হয়েছিল তাদের। কথায় কথায় শাম্‌লী জিজ্ঞেস করেছিল, 'আচ্ছা, ঠাকুমা, এই যে সিংবাবুকে মারলে কে, কারা সব ইয়ার পিছনে আছে, তুমার কী মনে লেয়?'

ওকে ঝটিতি থামিয়েছিল দুলির মা, 'চুপ চুপ, উকথা মুয়ে লিতে আছে? কাকপক্ষীও রা কাড়ে নাই…'

'ঠাকুমা, তুমি এত ল্যাজে-গোবরে কেনে, ডর লেগে গেল অমনি! আমরা ত গাঁয়ের ঠিঙে অ্যাত্‌ দূরে আছি, কে শুনছে তুমার কথা!'

খ্যা-খ্যা করে হাসল দুলির মা, রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়েই, তারপর হাসি থামিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করল।

'লাত্‌নী, যাই ত সব ঠেঁয়ে, সব জাগায় ওই কথা, মৌচাকের গুনগুনানি, তুমি যাও ত চুপ করে গেল, ত এই তুমাকে বললম, ই একট' কিছুমিছু হবেক, সিংবাবু সবশেষ লয় তা তুমার-আমার কী, আমরা সব ছোটনোক, ঘরের বার জাত-খুআনা মাগি · ' জিব কাটল ঢুলির মা, কথাটার অন্য অর্থ আছে, 'তুমাকে বলি নি, লাত্‌নী, মাইরি, তুমার গা ছুঁয়ে বলছি '

ম্লানভাবে হাসল শাম্‌লী, 'আচ্ছা, আমরা সব ছোটনোক, ভদ্দনোকেরা কী বুলছে ?'

'তাদেরই ত যত ভাবনা, ডর লেগেছে, সামাল-সামাল ! হয় তারা পগার পার, ল্যাজ গুটাই পালাইছে, লয় ত ভোল পাল্‌টিছে।'

শাম্‌লী শেষ কথাটার মানে বুঝল না।

'ভোল পাল্‌টিছে বুঝলে নাই ? ধর তুমারগে সিংবাবুর ডান হাত তারক বামুন, মুখপড়া বজ্জাত, বেজম্মা, মুখপড়া সাতজন্ম কচি বউট'কে বাপের ঘরে ফেলে রাখলেক, আর এখন আদর করে ঘরে লি'এস্‌ছে, ভিজে বেড়ালট', কেনে বল দিকি ?'

শাম্‌লী কোনো উত্তর করল না, কিন্তু কান পেতে থাকল।

'শুন থালে, বাবুদের ঘরে-ঘরেই শুনতে পাই, ই গাঁয়েই শুধু লয়, ইখেনে যেমন সিংবাবুকে কেটেছে, তেম'ন উই যে গ', সাতবাখরি না কি কী বলে, সেখেনে এক মহাজনকে কেটেছে, এক লুচ্চাকে কেটেছে। সেই হইছে তারক বামুনের ভয়, তাই বউ লি'এসে সাধু সেজে বসেছে, খি-খি, ত আমার চক্ষুকে ভুলাবেক মুখপড়া, উয়ার চাউনি দেখেই শিকুরে-বেড়াল চিনি, খি-খি '

হঠাৎ শাম্‌লী জিজ্ঞেস করলে, সেও যেন মুখরা হয়ে উঠতে চায়, 'আর মানিজার বাবু, তুমাদের ধান-কলের ?'

আবার রাস্তার ওপর থেমে গেল ঢুলির মা, গা দুলিয়ে হাসতে আরম্ভ করল, 'মানিজার বাবু ? আমার লাগর। আমার লাগরের কথা আমাকেই শুধাইছ, মুখপড়া সব ত্যিয়াগ দিয়ে সন্নিসি হইচে, এই দু'ট' মাস গেল, মুখপড়ার টিকি দেখলম নাই গ', হ্যা-হ্যা, মুখপড়া মিন্‌সে !'

তেইশ

বড়ম পূজার দিন সাঁওতালপাড়ায় সকাল থেকেই নানা ধারায় উৎসব এগিয়ে চলতে লাগল। মেয়েরা পিঠেপুলির চাল কোটা ডাল বাটা শুরু করল। লুস্কি মোড়লনী সন্ধ্যেবেলায় যে পূজা হবে তার জন্য তৈরি হতে লাগল— বেশ বড়সড় কালো পাঁঠা একটা যোগাড় হয়েছে, বনা টুডুই সেটা বলি দেবে। ক'দিন থেকে হেঁড়িয়া আর পচুই যথাসম্ভব তৈরি হয়েছে, সময় অল্প বলে পর্যাপ্ত হয়নি, ওদের মনের খুঁতখুঁতি যাচ্ছে না।

আর এক দল, সে দলে মেয়ে আছে তবে পুরুষই বেশি, সব ছেলে-ছোকরা আর জোয়ান, জঙ্গলে গেল শিকার করতে। আগে বন ছিল অনেক বেশি, এখনকার মতো চারদিক সাফসুরুত হয়ে এত পাড়া বসেনি। এখন ওদের যেতে হল ব্রাহ্মণভুঁইর জঙ্গলে, যার ওদিক পর্যন্ত গেলে—লোকে সাতক্রোশী বললেও অতটা নয়—কাঁসাই নদী পাওয়া যায়। সারা দিন ওরা আজ শিকার করে কাটাবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই, কী করে যেন পচাইও ওদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, তাতে তার নিজের বা সাঁওতালদের কারুরই কোনো খটকা লাগেনি। কিন্তু শাম্‌লীও যে শিকারের সময় ওদের সঙ্গে বনের মধ্যে সারাটা দিন ঘুরে বেড়াবে— ওর চেনা দুই সাঁওতাল মেয়ের ডাকে, সেটা ওরা বুঝতে পারেনি এবং পচাই রীতিমতো ফুঁসে-উঠেছিল। ভাইবোনের সহজ রেষারেষিটা এখন এক রকম শত্রুতায় পরিণত হয়েছিল। দেখা হলে বা সামান্য কথাতেই দাঁত বের করা কুকুরের মতো ওরা গর্জাতে থাকে, যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা একে অন্যকে কুটিকুটি করে ফেলবে।

জঙ্গলে ঢোকার মুখে পর্যন্ত সমস্ত দলটা এক সঙ্গেই ছিল। তারপর একটু এগোতে না এগোতেই ছাড়া-ছাড়া হয়ে গেল বিভিন্ন ছোট-ছোট দলের মধ্যে, তাতে পচাই আর শাম্‌লীও আলাদা হয়ে গেল, বোধ হয় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল দুজনেই। শাম্‌লীর দল হল ফুল্‌মি আর এলমুনির সঙ্গে, মেয়ে দুটো ওর আগেকার খেলার সঙ্গী, প্রায় সমবয়সী।

ফুল্‌মি পরিহাস করে জিজ্ঞেস করলে, 'তুই আমাদের সঙ্গে এলি কেনে, তুই কী করবি ?'

শাম্‌লী পাল্‌টে জিজ্ঞেস করলে, 'তোরা কী করবি ?'

পূজা করবেক নাই, ত আমিও ছাড়ব নাই। শেষে রাজী করালম, তবে এলম।'

'থালে একটা রাত বেশ আসছে বল, পচুই আর মাংসের চাট...'

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন যোগ করলে, 'নাচগান আর মাদলের ধিতাং ধিনা ·· থালে চাঁদসোলের মড়াচিরে ফুল ফুটছে বল!'

চকিত হয়ে উঠল মথুর, একটু আগে মাঠের মধ্যে রতন দিগার মড়াচির কথাটা উল্লেখ করেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একবার চমকে উঠতে হল তাকে, চায়ের দোকান থেকে উঠে এসে এক ছোকরা কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'গণপতি সিংকে খতম করল কোন দল, আপনি তো এক মোড়ল লোক, আপনার কাকে সন্দেহ হয়?'

প্রশ্নের হঠকারিতায় চমকে উঠল সবাই, কেননা গল্পগুজব হলেই সকলে বুঝত এ প্রশ্ন নিষিদ্ধ। কিন্তু মুহূর্ত পরেই মথুর কৌড়ি জোরালো কিন্তু ধরা-ধরা গলায় হেসে উঠল, গলার শির ফুলিয়ে। তারপর বললে, 'পুলিস দারগা-মাজিস্টর, তা কমসে কম দশবিশ বার ই গ্রামে এল, শ'য়ে শ'য়ে লোককে শুধাল, ওই কথা, তুমি কিছু জান? কাকে তুমার সন্দ হয়? তা সিংগিন্নী, সিংপো বল, আর ছোট-লোক চাযাভুষা বল, সবাই বলে, জানি নাই। থালে দেখ, আমারই বা কাকে সন্দ হবেক?' বলে থামল মথুর, চারদিকে তাকিয়ে নিলে, ওর চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে, 'আর মনের কথা যদি বল, থালে আমি তুমাকে বলব, শালা, তুমি খুনে, আর তুমি আমাকে বলবে, শালা, তুমি খুনে '

ওর বলা শেষ হল না, সবাই হেসে উঠল, হাসতেও থাকল কিছুক্ষণ।

'বুঝ থালে ··' মথুরের গম্ভীর কণ্ঠস্বর, বোঝা গেল ওর আরো কিছু বলার আছে। সবাই থেমে গিয়ে মনোযোগী হল আবার।

'ই শুধু আজকের বেত্তান্ত লয়, কেউ কুনু দিন কাকেও বলবেক নাই, এই হল ই তল্লাটের মানুষের কথা। ই দেশট' কী জান · চলে যাও উত্তুরে বিষ্টুফুর-বাঁকুড়ো, আরো উত্তুরে বীরভুঁই, আর দক্ষিণে ময়নাগড়-বিনফুর · সব বাগদী-সামতাল-মল্লদের ভুঁই, এই সিদিন পযান্ত ছিল ইসব · বাপ-ঠাকুদ্দা-খুড়া-জ্যাঠা সব ঠগী-ঠ্যাঙাড়ে, ঘর করছে এক সঙ্গে, চাষ করছে এক জমিএ, এক খামারে ধান-কপি-কলাই তুলছে কিন্তু কিছু বলছে নাই কেউ কাকেও। শুধাবেক নাই, চিনবেক নাই। রেতের আঁধার যদি হল ত সব আড়াল পড়ে গেল, কেউ কারো মুখ দেখবেক নাই। কে কুথা গেল-রইল ঘরের মশা-মাছি জানবেক নাই। সকাল হল ত আবার যেমনকে তেমন। হয় লয় শুধাও কেনে উয়াকে, উই যে ছিরু বাবু বসে আছে দোকান ঘরের গদির উপর, পথের পাশে দোকান, হ্যা-

হ্যা···বয়েসকালে হয়ত দিনের বেলায় চলছে মুদির বেচাকেনা, সাঁঝের বেলায় ঝাঁপ ফেললেক ত ফেললেক, হয়ত রেতের বেলা এই পাকা সড়কের উপরেই ফেললে ঠক্‌রা জাল, বল কেনে, আমি নিজে ঠকে শিখেছি···বল কেনে ছিরু · ’

টেনে টেনে হাসতে লাগল ছিরু, ‘হুঁ, ওই রকমই দেশটা’ ছিল বটেক।’

‘মানে, আপনি এক কালে ঠ্যাঙাড়ে ছিলেন?’ সেই ছোকরা ছিরু মুদীকে প্রশ্ন করল, তার কণ্ঠে বিস্ময় আর কৌতূহল।

‘অ্যাই-অ্যাই···’ মথুর কৌড়িও এবার টেনে টেনে হাসতে লাগল, ছিরুর প্রতিধ্বনির মতো। ‘তুমরা এই না শুনলে গ’, ঠ্যাঙাড়ে কথা কয় না, গুরুর দিলাসা আছে নাই?’

আবার হাসল সবাই। মথুর বললে, ‘তবে সে মানুষ নাই, বীর নাই, তেজী জুয়ান নাই, তখন ছিল বাঘ-সিংহ, এখন সব ছাগল-শিয়াল।’

ছিরু খানিক বিষণ্ণ স্বরে এবং যেন স্মৃতিচারণ করছে এমনিভাবে বললে, ‘কেনে এমনিধারা সব হল বল দিকিনি, মথুরদাদা · ’

সেই ছোকরা কিন্তু বলে উঠল, ‘ছাগল-শিয়াল হয়েছে বটে, তবে সেই ছাগল-শিয়ালেই সিংহকে খতম করছে, দুঃখ কি!’

মথুর বললে, ‘বেড়ে, ব্লেড়ে বলেছ হে ছোকরা · ’

ঠিক সেই সময় মেঘ ডেকে উঠল গুড়গুড় করে, আর বাতাস উঠল গাছপালার মধ্যে সরসরিয়ে। আকাশের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার চোখ ফিরিয়ে নিলে সবাই, একবার মথুর কৌড়ি আবার সেই ছোকরার দিকে তাকাল। ইচ্ছে যে গল্পটা চলুক। পরক্ষণেই ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামল।

আঠারো

বৃষ্টিটা বেশ জোরেই নেমেছিল। সেই ছোকরার সঙ্গে আরো অনেকে চলে গেছে বৃষ্টি মাথায় করেই, খদ্দেররা তো ছিলই না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে খানিকক্ষণ হল। বৃষ্টির জন্য মনে হচ্ছে রাত অনেকখানি। ছিরু মুদি দোকানের ঝাঁপটা আদ্ধেক নামিয়ে দিয়েছে, ভেতরে জলছে কেরোসিনের চৌকো লণ্ঠন, গরুর গাড়ির গাড়োয়ানেরা যেরকমটা ব্যবহার করে। এখন দোকানের ভিতর—ছিরু মুদি, মথুর কৌড়ি ছাড়া আরো দুজন, এরাও মাঝে-মধ্যের খরিদ্দার, এখন আড্ডাধারী।

ছিরু ইতস্তত করে এক সময় মথুরকে সম্বোধন করে বললে, 'দাদা, বল ত ভাঁড় বের করি একটু', এখেনেই আছে…'

ব্যাপারটা বুঝে হেসে উঠল মথুর, 'না হে, আজ লয়, সামতাল পাড়ায় আজ এক বাটি হেঁড়ে খেয়েছি, আর সহ্য হবেক নাই, তবে তুমাদের চলুক।'

অন্য দুজন খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল, প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে বললে, 'না না, সেইট' আবার হয় না কি, মথুরদাদা পেসাদী না করে দিলে…'

ছিরু উঠে গিয়ে দোকানের পিছনে মালব্যালের আড়াল থেকে একটা হাঁড়ি বের করলে, মহুয়া ফুলের বাথর মেশানো পচুই। মাটির ছোট খুরিতে করে ওদের কথামতো মথুর কৌড়িকে প্রথম দিলে, তারপর নিজেদের ভাগ নিল।

এখন পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ বদলে গেল। বাইরে অবিরাম জলের ঝিরঝিরে শব্দ। বাতাসে লণ্ঠনের শিখা কাচের আড়ালে কাঁপছে, আর ওদের মুখে ছায়া নাচছে পতপত করে, চোখগুলো ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

মথুরকে আবার গল্প করার মেজাজ পেয়ে বসল, শ্রোতারাও উৎসুক। প্রকৃতপক্ষে মথুরের মুখে নানা ধরনের গল্প ওরা আগেও শুনেছে, এখনও শুনতে ভালোবাসে, তাতে পুনরাবৃত্তি হলেও ওদের খারাপ লাগে না।

ছিরু হঠাৎ বলে উঠল, 'তুমি তখন ঠিক বলেছিলে, মথুরদাদা, সেসব দিনকাল আর নাই, সে মানুষও নাই!'

'ভূমাটিও নাই সেরকম, তাই বল··' মথুর বললে।

'কী রকম বল দিকি, মথুরদাদা?'

'তখন ছিল না কি এই রকম এত মাঠঘাট, রাস্তাসড়ক! তখন শুধু বন আর বন, এক পাল মোষ আর দু' পাল গরু তাড়িয়ে ঠাকুদ্দা কিষ্ট কৌড়ির বাপ গোবিন্দ কৌড়ি এসেছিল ইখেনে। সে সব ঘাসের জঙ্গলই কী রকম, এক মানুষ দু' মানুষ উঁচা, ত তার মধ্যে বাঘ লুকায় থাকবেক। কত বাঘে-মোষে লড়ায়ের কথা শুনেছি ঠাকুদ্দার মুখে, মানুষই তখন লাঠি হাতে বাঘের সামাল দিতে পারত!'

বিচিত্র সব কথা। ধীরে ধীরে একটা অন্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে উঠল। এ অঞ্চলের লোকেরা লড়াই করেছে, মানুষের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, বন্য পশুর সঙ্গে। মেরেছে, মরেছে। এ যুগের নীতিবোধের সঙ্গে তখনকার নীতিবোধের মিল নেই।

'তবে আমি বলছি শুন, ছিরু, মুখে ছাগল-শিয়াল যাই বলি, সেই তাদেরই

ত বংশ ইয়ারা, এই তুমার মাহাতো-সামতাল-বাগদী, এই আমরা রাজপুত…'
মথুর তখন নির্বংশ হবার বেদনা ভুলে গিয়েছিল।

'আচ্ছা, মথুরদাদা, তুমি যে তখন বলছিলে, তুমি ঠক্‌রা জালে পড়েছিলে একবার, ত সেইট' বল দিকি…'

'কে বললেক আমি ঠক্‌রা জালে পডেছিলম ' চোখ বড বড় হয়ে উঠল মথুরের, 'আমাকে জালে ধরবেক এমন বাপের বেটা কেউ আছে?'

'সেইট' ঠিক, তা ঠিক…' ওরা এক বাক্যে স্বীকার করলে, মথুরের চওড়া বুকের পাটা আর সুগঠিত দীর্ঘ বাহুর দিকে তাকিয়ে।

'বুঝলে ছিরু, তখন আমার ধরগা ভর বয়স, লাঠি ধরতে পারতম, হালের ছঁড়ার মতন লাঠি লয়, বাপের কাছে শিক্ষা, আশেপাশে পাঁচট' গাঁয়ে নামডাক ছিল। তখন আমাদের ছিল গরুর বাথান, এখন আমার দু'গণ্ডা গরু নাই, তখন কুড়ি মাপে গণতে হত, যাকগে উসব। গেছি সেদিন শালবনিতে, শহরে দুধের ব্যবসা ছিল, তিন মাসের টাকা বাকি পড়েছিল, বাবা বললেক, লিয়ে আয়। গেলম টাকা আনতে, ত দুই মহাজনই টাকা দিলেব, পাঁচ শ দু'কুডি টাকা হল, করকরে রুপার টাকা, তুমবা এ্যা-ছি করবে, ই আবার টাকা, কিন্তু সে হল গে এখন বিশ হাজার টাকার সমান! গামছায় বেঁধে ঝোলায় ভরে সাইকেলে উঠব ত এক মহাজন বললেক, উয়াদের ঘরে কী সব ফিষ্টি-টিষ্টি আছে, খেয়ে যেতে। বললম, রাত হয়ে যাবেক যে গ'। তা হউক রাত, থাকতে হবেক। তা শুন, খাওয়ার গন্ধ পেলে আমি সাঁটকে গেছি, বুঝলে হে, হাঃ-হাঃ …. তা খেলম, বাবু, মাংসের একট' জাম্বাটি, আমাদের পুরখা-পুরুষ চার সেরী ভাত খেতে পারত, ত আমি সেদিন খেইছিলম দু বালতি, ভাত, হাঃ-হাঃ ..'

'মহাজন বললেক, মথুর, রাতে আর ঘর যেও নাই, পথের আবস্থা আজকাল ভাল লয়, ত আমি বললম, যাব। সাইকেলে উঠে পোঁ-পোঁ করে চালাচ্ছি। দেহট' একটু ভার-ভার লাগছে, খাওয়ার পর যাচ্ছি কি না। ত হল কি, সব পথট' এলম, ঠিক এখেনট'য়, এই বাঁকট'র একটু উদিকে, বল যে ঘরের কপাটের কাছে এক রকম, কী রকম গন্ধ-গন্ধ পেলম, এগাব কি এগাব নাই…কিছু একট' আছে লিশ্চয়…ত দেখবার জন্যে আর একটু এগাইছি, আড়বাতি পড়ল পথে। বুঝলে নাই? জঙ্গলের ভিতর থেকে পথের উপর সরু আলো পড়ল। কে যায়?—হাঁকল…যাস্ শালাঃ, গলাট' কচি, দুধের ছেলে, ঈশ্বর বামুনের বড় বেটা। আমি হাঁকলম, গোপাল, তুই ইখেনে, বনের বাইরে আয়। উত্তর দিলে, মথুরকা, তুমি! চলে যাও। বললম, আয় তুই বার

হয়ে, কী করছিস এখেনে? বললেক, ঠকুরা জাল পেতেছি। বার আমি হব নাই, তুমি চলে যাও কেনে। ত এলম চলে!' বলে মথুর টেনে টেনে হাসতে লাগল, ওরাও হাসিতে যোগ দিলে।

উনিশ

এরপর আরো কিছুটা সময় কেটে গেছে। মথুর কৌড়ি এখন গ্রামের পথে একলা ঘরে ফিরছে। বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। রাত্রে গ্রামে চলাফেরা করতে ওর ভয় নেই। এই দু' মাস ধরে গাঁয়ের লোক সন্ধ্যার আগে যে যার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে, ওর সে বালাই ছিল না। 'আমাকে মারবেক কুন বাপের বেটা আছে, আসুক দিকি ' মথুর বলে। এমনভাবে ও চলাফেরা করে, যাতে মনে হয় সমস্ত এলাকাটাই ওর পৈতৃক সম্পত্তি। গর্ব আছে, বুকে সাহস আছে।

গ্রামের পথে মথুর যখন ফিরছে তখন সমস্ত দুপুর বিকেল আর সন্ধ্যে ধরে যে সমস্ত কথা ও শুনেছে আর বলেছে, সেই সব মনে হতে লাগল। পুরনো কালের কথা, ওর পূর্বপুরুষের কাহিনী। নিজের ছোট বেলায় যা ও দেখেছে, তারও আগে বাপের আমলে, ঠাকুদার আমলে—এই সব জায়গায় বড় বড় ঘাসের বন, সে কী বিরাট শাল মহুয়ার জঙ্গল। মানুষ তখন খেতে পারত। গায়ে জোর ছিল।

হঠাৎ পা পিছলাবার মতো হল, একটা জায়গায় নালা পেরোতে গিয়ে। সামলে নিলে। ঠাণ্ডা বাতাসে পচুইয়ের নেশার আমেজটা কেটে আসতে লাগল। এখানকার সবাই পুরুষানুক্রমে হেঁড়িয়া, পচুই খেয়ে আসছে, এরা মাতাল হয় না। পরিমিতভাবে খেলে শরীর ভালো থাকে। কাজের শক্তি পাওয়া যায়।

বৃষ্টি থেমে গেছে, বাতাসে সোঁদা গন্ধ। মাটির ডাক উঠছে, মাটির মানুষরা সেটা অনুভব করে। আষাঢ় মাস, কিন্তু অন্য বছরের মতো চাষের ধুম পড়ে যায়নি। বৃষ্টি তো শুরু হল—মথুর বুঝতে পারে এটা গরমির বৃষ্টি নয়, বর্ষা শুরু হয়ে গেছে।

কিন্তু যতই ঘরের কাছাকাছি আসতে লাগল মথুর, ততই ওর মনটা সচকিত হয়ে উঠল। বউটার মাথায় ছিট আছে। ছেলে মরে গেছে, এক মাত্র ছেলে—মথুর সেটার দুঃখ বোঝে না তা নয়, কিন্তু প্যানপ্যানানি সহ্য করতে পারে না। তার নিজেরই বুকের মধ্যে কষ্টের মতো আছে। গ্রামের সবার সঙ্গে,

বিশেষত সাঁওতালদের সঙ্গে তার মেলামেশা বউ পছন্দ করে না—সে নিয়ে খিটিমিটি লেগেই আছে। গোচালাটার কাছে এসেই ও একটু দাঁড়িয়ে পড়ল। খোলা চালাটা, গরুগুলো সব ঠিক জায়গায় আছে দেখতে পেলে। সাতটা গরু, তার মধ্যে চারটে দুধাল, বাছুরও আছে, আর আছে একটা মারকুট্টে ষাঁড়, মথুরের খুব প্রিয়। সে দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল মথুরের—নিজের দারিদ্র্যের জন্য। তাদেরই কুড়ি-কুড়ি গরু ছিল, মহিষ ছিল!

কিন্তু ঘরে ঢুকেই চমকে উঠল মথুর। বউয়ের ভিরকুটি শুরু হবে তার জন্য তৈরিই ছিল সে, কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য রকম, কেউ কোথাও নেই। বউটা গেল কোথায়? আলো জ্বেলে মথুর এঘর-ওঘর দেখল, গোয়ালটা দেখে এল আর একবার, নাম ধরে ডাকল কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না তখন লাঠি আর আলো নিয়ে পাড়ায় খোঁজ করবার জন্য বেরোল। দরজায় শেকল লাগাতে যাচ্ছে, পিছনে পায়ের শব্দে ফিরে দাঁড়াল ও, গিরিবালা ভিজে জবজবে হয়ে ফিরে আসছে।

'বড়কী, কুথা গেছলি তুই, ভিজেছিস কেনে?' গরগর করে উঠল মথুরের গলা।

লণ্ঠনের আলোতে দেখা গেল, ভয়ে গিরিবালার চোখের তারা কাঁপছে, যদিও সে বুড়ি হয়ে গেছে, মাথার চুলে পাক ধরেছে। ভয়ে, হয়তো ভিজে ঠাণ্ডায় গিরিবালার গলাটা কাঁপা-কাঁপা মনে হল, 'বলছি, বলছি, দোর ছাড় দিকি আগে, ঘরে ঢুকে কাপড়ট' পালটাই…'

ভিতরের বারান্দায় কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল মথুর, কিন্তু তার চোখ দুটো জ্বলছিল। গিরিবালা ঘরের ভিতর থেকে শুকনো কাপড় পরে এসে ওর সামনে দাঁড়াল, ওর চোখের দিকে একবার তাকিয়েই মুখ নিচু করল, হাসল এক রকম করে—ভয়-পাওয়া কিন্তু আরো কিছু যেন ছিল।

'তুমি কিছু বলবে নাই বল আগে, বল…' কাঁচুমাচু স্বরে বললে গিরি।

'ঠিক করে বল, শুনব ত আগে…'

গিরি বলতে আরম্ভ করল কিন্তু মথুর প্রথমটা তার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছিল না।

'আজকে অষ্টমীর দিন, লয়?'

'হঁ, হবেক বা, তার হইচে কী?'

এর পরের কথাটা বলতে গিয়ে গিরির গলা ভার হয়ে এল, চোখের জল বাধা মানল না। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, 'তুমার মনে আছে, যেখেনে বজ্রপাত

হইছিল, সেই যে গ', তেগাছার উদিকটায়, যেখেনে বংশী, আমার মরণ হল নাই ··' আর পারছিল না গিরি, কিন্তু না বললেও নয়। সে জানাল, মাঠের যেখানে বংশী মরেছিল, সন্ধ্যের পর সেখানেই গিয়েছিল। কে ওকে বলেছে, শুক্ল পক্ষের অষ্টমীর রাত্রে সেখানে গিয়ে ছেলের কথা মনে মনে ভাবতে হয়, মাটি তুলে নিয়ে পেটে বুলোতে হয়, তাহলে ছেলে ফিরে আসে। বৃষ্টি হয়েছে, সেটা নাকি আরো ভালো লক্ষণ।

এক রকম ডিগবাজি খেয়ে গেল মথুর, কী আশঙ্কা করেছিল সে আর এই কী ব্যাপার। হা হা করে হেসে উঠল সে। বউকে হাত ধরে বুকে টেনে নিল, পাগলামি করল, তারপর আবার একটু দূরে বসিয়ে দিল, নিজেও বসল মুখোমুখি।

'বডকী, সত্যি তাই হয়? কে বলেছে তোকে···হবেক, হবেক, বংশী ফিরে আসবেক আবার···' বুক ভরে শ্বাস নিলে ও।

কতক্ষণ পরে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল মথুর, বললে, 'তুই রান্না চড়া দিকি, আমি আসছি এক্ষুনি· ·'

ভ্যাবাচাকা গিরিকে কোনো কৈফিয়ত না দিয়েই হনহন করে বেরিয়ে গেল মথুর, এবারে লাঠি আর আলো না নিয়েই।

অনেকটা পথ, কিন্তু এক লহমায় বিকেলের সেই রতন দিগারের ঘরে এসে মথুর হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করে দিলে। এবার রতনকেই হকচকিয়ে দিলে ও।

'তুমি পাঁচ সের ধান পেইচ, রতন?'

'না, কাল যেতে বলেচে, কেনে বল দিকি?'

'তুমি শুধাইছিলে নাই চাষ করবে, কি করবে নাই? চাষ ঠিক করবে তুমি, ভূ-মাটি কি বাঁজা থাকবেক, হঁ?'

এ কথা তো বিকেলেই বলেছিল মথুর, তাই রতন ঠিক বুঝতে পারছিল না, এখনকার বলার পার্থক্যও ওর ধরতে পারার কথা নয়।

'শুন রতন, সিংবাবুদের জমি, মাঠের আদ্ধেক খালি পড়ে আছে। উয়ারা ফিরবেক কি ফিরবেক নাই ভগমান জানে। তাই বলে চাষ হবেক নাই? ভূমাটি হাসবেক নাই? আমার ত জমিজিরেত নাই, তা তুমি ত পাঁচ বিঘা চায করতে, হুকুম হোক না হোক, লেগে যাও। আমাকে শুদ্ধ লাও, দুজনে চাষ ত করি, তারপর যা হয় হবেক, কী বল?'

'কিন্তু ধব কেনে, কেউ যখন করছে নাই · '

'রাথ তুমি, ডর কিসের! মথুর কৌড়ি ডর করবেক কুনটোকে, মালিকের

ভাগ মালিককে দিয়ে দিব, বাস · বাকি তুমার আর আমার। কি বল ?’

রতনের বুকে বল ছিল না, সে মিহি স্বরে সম্মতি জানাল।

কুড়ি

এর দু’এক ঘণ্টা আগে, যখন সবে বৃষ্টি ধ' আসছিল, তখন সিংবাড়িতে ওদের পুরনো সর্দার মাহিন্দার লক্ষ্মণ দিগাব আর এক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছিল।

গণপতি সিংকে যখন হত্যা করা হয়, তখন লক্ষ্মণ বাড়িতে ছিল না। তার আর ছেলেপিলে ছিল না, একমাত্র মেয়ে দুলালী ছাড়া। বউকে নিয়ে তাব শ্বশুর-বাড়ি গিয়েছিল তার তত্ত্ব করার জন্য। ফিরে এল ঘটনার দুদিন পরে, সকালে। পথে আসতে আসতেই রবাববিতে সমস্তই শুনেছিল সে, এসে কাউকে কিছু না বলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সিংবাড়ির গোশালার এক পাশে চাকরবাকরদের থাকবার ঘর, তারই একটা পেয়েছিল ও। গণপতিব বাবা-কর্তাব আমলের লোক সে, বয়সে গণপতির থেকে বড। ছেলেবেলায় বাগাল-রাখাল হিসেবে ঢুকেছিল, তারপব সমস্ত জীবনটা এখানে কাটিয়েছে।

সিংগিন্নী, নরেনবাবু, আত্মীয়কুটুম্ব সবাই চলে গেছে, কেবল রয়ে গেছে লক্ষ্মণই। তাকেও চলে যেতে বলেছিল সবাই, কখন কেটে রেখে যাবে রাত-বিরেতে—সে কথাতেও কান দেয়নি লক্ষ্মণ। তার বউ বলেছিল জামাইবাড়ি যেতে।

‘জামাইঘর পরের ঘর, ই আমার লিজের ঘর, কত্তার বাপ আমাকে দি’গেছে। আমি কুথাও যাব নাই··’ বলেছিল সে। তারপর এত দিন রয়ে গেছে।

সেদিন রাত্রে বৃষ্টি থামতে লক্ষ্মণ টিনের ‘লম্ফ’টা নিয়ে দরজা খুলে গোয়াল-চালার দিকে এগোচ্ছিল। হঠাৎ বৃষ্টি এসে পড়াতে তখনো যে কটা গরু অবশিষ্ট ছিল তাদের জাবনা দেওযা হয়নি, এখন দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু দু’এক পা গিয়েই থমকে গেল ও, কাঁঠাল গাছের তলায় যেখানে ধান সেদ্ধ হবার উনুন, সেখানে কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল ওর, কিন্তু পরক্ষণেই স্থির করল নিজেকে। ভালো করে ঠাওর করে দেখল। একে টিমটিমে আলো, তায় বাতাস দিচ্ছে, ঠিক বোঝা যায় না, তবে মানুষ বটে।

‘কে, কে তুমি উখেনে···’ কেউ সাড়া দিল না, কিন্তু বড়বাড়ির দোতলায় ধপাস করে কী পড়ার শব্দ হল। আবার চমকে উঠল লক্ষ্মণ। সেই সময়

আলোটাও গেল নিবে। আন্দাজে পাশের দিকে সরে গেল সে, বিকেল বেলায় যেখানে কোদাল রেখেছিল সেখানে পৌঁছে সেটা হাতে তুলে নিলে।

'কে তুই, রা কাড়িস নাই কেনে, শালার বেটা খুন করতে এস্ছিস, আয় কেনে, এই কদাল দিয়ে ঘিলু ফাটায় দিব আয় শালা, মনে করেছিস কত্তার মতন বসে বসে গলা বাড়ায় দিব, হুঁ' লক্ষ্মণের স্বর উত্তেজিত কিন্তু যে কেউ লক্ষ করলে বুঝত গলার স্বরে ওর শক্তিহীন দেহটা থরথর করে কাঁপছে।

'ও গো, তুমি পালায় এস না গো, পালায় এস না গো' বুড়ি পিছনে কোথাও, সম্ভবত ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে চিঁচিঁ করছিল।

'লক্ষ্মণদা, আমি গ' আমি, লারাণ জেলে…' অন্ধকারের থেকে বললে।

'কে লারাণ জেলে?'

'ই গাঁয়ের লয়, পাশের গাঁয়ের লারাণ জেলে, তুমাদের (মানে, শিবাবনের) মাঠে চাষ মাছ ধরা করি আমি। তুমার দিব্বি, কানাইদাও ফিরে মারবে নাই গলার রাএ চিনতে পারলে নাই গ'?'

লক্ষ্মণ অস্ফুটে শব্দ করল একটা, বোঝা গেল চিনতে পেরেছে।

'তা, তুমি কেনে এস্ছ? বস আগে… কারেও বিশ্বাস নাই, লরলোকে এখন লোক খায়'

অন্ধকারে সব একটু চুপচাপ, তারপর লারাণ কাঁচুমাচু স্বরে বললে, 'তুমার কাছেই এস্ছিলম লক্ষ্মণদা। তা তুমি আগে লম্ফটা জ্বাল, ঠাওর কর আমাকে, তুমার ঘরে একটু বসতে দাও, দুটা কথা কইতে এসছিলম আর কি, কেউ ত কথা কয় নাই আজকাল'

'হ-হুঁ, তুমরা ঘরে এস কেনে, বাপু, উখেনে আর থাকতে হবেক নাই।' বুড়ির গলাটা এবার পরিষ্কার। ফস করে একটা দেশলাই জেলে বললে, লম্ফটা কুথা ফেললে না কি, লিয়ে এস।'

একুশ

লক্ষ্মণের ঘরের মেঝেতে বসেছে দুজনে, দুজনেই সমান বুড়ো, গায়ের চামড়া লোল হয়েছে, পাকা চুল, তবে লক্ষ্মণের গায়ের রঙ একটু সাফার দিকে, আর লারাণ বেশি লম্বা, একটু শক্ত। বুড়ি লারাণকে চারটি মুড়ি খেতে বলেছিল, সে খায়-নি, তখন কোণের দিকে বুড়ি তার ত্যালাই-কাঁথার ওপর গিয়ে শুয়েছে, পিটপিট

করে তাকাচ্ছে ওদের দিকে। তাদের ঘরে আবার যে লোক এসে বসেছে সেটাই যেন সে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

'তারপর, কী খপর বল দিকি, লারাণ, তুমি রেতের বেলায় এস্‌ছ কেনে?' মনে হল লক্ষ্মণ খুবই ক্লান্ত, একটু আগেকার উত্তেজনা ওর বুড়ো হাড়ে ধাক্কা মেরেছিল।

'দিনের বেলাকে কতবার এসব বলে মেনেছি, কিন্তুক কী জান, পাড়ার লোক সব অন্য রকম সন্দ করে, বলবে সিংবাড়িএ যায় কেনে, তুমি যথাত্ত বলেছ, লরলোকে লরলোক খায়··· ত পরানট' আকুলিবিকুলি করে, তাই রেতের বেলায় এলম···'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লক্ষ্মণ ওর দিকে তাকাল, ঘোলাটে চোখ, তার ওপর টিমটিমে আলো পড়েছে, ওর সেই চাউনির মানে বোঝা গেল না।

লারাণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে উঠল, 'লক্ষ্মণদা, কী রকম বুঝছ বল দিকি, বাতাস উল্টা দিকে ফিরবেক কিছু? ই যে আর সহ্য করা যাচ্ছে নাই।'

লক্ষ্মণ তবু যেন কিছু বুঝতে পারছে না এমনিভাবে তাকিয়ে রইল। লারাণ জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা, সিংবাবুদের সব গেল কুথা বল দিকি? এত সব চাষের জমিজায়গা, আষাঢ় মাস পড়ে গেল, সব কি গোভাগাড় হয়ে থাকবেক?'

'হঁ, সব যাবেক, ত তুমার আমার কী, বল··'

'না, তাই বলছিলম···' থতমত খেয়ে থেমে গেল লারাণ।

তখন লক্ষ্মণই যেন খানিকটা উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'সাতগণ্ডা আর দুট' গরু ছিল, গাই-বলদ, ত ব্যাপার দেখ, যদ্দিন খড়কুটা ছিল টেনে টেনে খাআলম, মিল বন্ধ, কুঁড়া নাই, কুথা পাব, মাসটাক পরে দিলম সাতট'কে ছেড়ে, তারপর আরো দু'ট'কে ছেড়েচি, সেগুলা যে কুথা গেছে জানি নাই· তুমি বল দিকি, কী করে চালাই আমি।'

বুড়ি বললে, 'আমাদের খরাকী দিবেক কে, গাঁটে যা ছিল তাই খাচ্ছি আমরা, তায় গরুকে খাআব কী, আমাদেরই না খেয়ে মরতে হবেক···'

'ইয়ার কি কুনু পিতিবিধান নাই, অঁ?' লারাণের কণ্ঠস্বরে কাতরতা ফুটে উঠল।

লক্ষ্মণ বললে, 'শুনি ত অনেক রকম কথা। গিন্নীমা না কি আসবেক, মিলট' চালু করবেক, গরমেণ্ট' নাকি চাপ দিইচে, বলছে মিল চালু না করলে বাজপ্ত করে লিবেক, আর ইয়ারা দু'ভাই ভিত্‌রে ভিত্‌রে ভাগাভাগি করে লিইচে

সব। জমিজমা বড়র ভাগে পড়েছে, ত বড়বাবু ভয়তরাসে মানুষ, ই গাঁয়ে তিনি আর আসবেক নাই। থালেই বুঝ সব যাবেক!'

'কেনে, বড়বাবু যদি না এসেন, ত সরকার-গমস্তা আছে, তারা ব্যবস্ত করতে পারবেক, বলে খঁড়া ত খঁড়া, চল ত চল, একবার চালু হলে '

'সেইট' হবেক নাই, লারাণ, সেইট' হবেক নাই, সব সরকার-গমস্তার চাকরি জবাব দিই গেছে গিন্নীমা।'

'কেনে, সবাইকে ত দেখি, তারক বাবু '

'থু-থু, এক লম্বর বদমাইস, লুচ্চা, উই ত বাবুকে খেলে, বুঝালে লারাণ, আছি ত এখেনে, পচি কাচা ঝি-ঝাউড়ল বাবুদের ঘরে এস্বার জো নাই, ত উয়ার লজর পড়ল·· ত গিন্নীমা মুয়ের উপরে বলে দিলেক ' বলতে বলতে গর্বিত হয়ে উঠল লক্ষ্মণ, 'গিন্নীমা আমার ঠটকাটা মানুষ, দিলেক জঁকের মুয়ে মুন, ল্যাজ গুটায় পালাল। বাইরে যেয়ে শাসাইছিল, ইয়ার পিতিশোধ সে লিবেক তবে ছাড়বেক। তারপর তার খপর জানি নাই, ভাই, গেরামে আছে কি যমালয় গেছে '

সে খবরটা লারাণই সরবরাহ করল, তারক হালদার গ্রামেই আছে এবং স্ত্রী কন্যাদের নিয়ে এসেছে, চাষাভুষাদের সঙ্গে খুব ভাব। শুনে লক্ষ্মণ মন্তব্য করল, 'উট'ই একট' কূট চাল উয়ার, সাধু হইচে, ভণ্ড সন্ন্যসি ··' নিশ্বাস ফেলে আবার বললে, 'যাক গা, মরুক গা, আমি ভাবি, লারাণ, উই লরকের কীট, উট'কে বাবু এত লাই দিলেক কেনে। ছিল কারণ কিছু, ক বল?'

'হঁ, তা বটেক।'

'কিন্তু তুমি কেনে এস্ছিলে বললে নাই ত কিছু?'

উত্তরে লারাণ তার দুঃখের কথা জানাল। মাস দু'তিন ছাড়া ছাড়া সিংপুকুরে মাছ ধরে চালান দেওয়া হয়, এখন তার সময় পেরিয়ে গেছে। বিশেষ করে আষাঢ়ে একবার মাছ ধরে নিয়ে তারপর পোনা ছাড়া হয়। এইসব ভাবছিল সে, মনের মধ্যেই গুমরোচ্ছিল, কিন্তু দু'দিন আগে অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে, সেটাই লারাণকে যেন পাথর বানিয়ে দিয়েছে।

'থালে তুমি এতক্ষণ বল নাই কেনে, পেটের ভিতরে রেখে দিইছ, আমি শুধু বকরবকর করলম·' বিরক্ত সংশয়ী চোখে তাকাল লক্ষ্মণ, মনে হল লারাণের চোখে একটু ধূর্ততা দেখতে পেল।

'না, তাই বলছি···' মুহূর্তের জন্য চোখ দুটো পিটপিট করতে লাগল লারাণের কিন্তু সেটা ঝেড়ে ফেলে সে বলে গেল, 'বুঝালে লক্ষ্মণদা, এই পরশুর আগের

দিন, বিকাল বেলা পুখুরের ধার দিয়ে ঘুরে গেলম, মাছে ঘাই মারছে, বুড়ি কাটছে, দেখে পরানিট' ঠাণ্ডা হয় · কিন্তুক সকালা উঠে দেখি কি, দরজার সামনে একট' রুই মাছ, সেরটাক হবেক। ও হরি, পাড়ায় ঘুম ভেঙে সব হট্টগোল লেগে গেছে দেখলম, সব ঘরের সামনেই কুন্থ না কুন্থ মাছ···আমি দেখেই চিনলম সিংপুখুরেব মাছ গেলম ছুটে, পুখুব ধারে, যা ভেবেছিলম তাই, সারা রাত মাছ ধরেছে আর সবাইকে বিলি করে গেছে, কেমন সন্দ হল, পাড়ায় এসে ঘুরে দেখলম একটুন, দেখলম দু'চারট' জাল ভিজা-ভিজা।'

লক্ষ্মণ তার সংশয় ভুলে গেল, 'বল কা লারাণ, ইয়ার মধ্যে তুমার পাড়ার লোক আছে ?'

'লিচ্চয়, ই আমি বেটার দিলাসা দিই বলতে পারি। কিন্তুক দেখ লক্ষ্মণদা, ই ঠিক চোরের কাজ লয়, ইয়ার মধ্যে অন্য মাথা আছে !'

এখন লক্ষ্মণকেই বিমূঢ় দেখা , 'তাই ত মনে লেয়, কি বল দিকি।'

লারাণ মাথা নাড়তে লাগল, 'ইসব কী হচ্ছে বুঝাতে লারছি।' তার পর ফিসফিস করে যোগ করল, 'আচ্ছা, সিংবাবুকে যারা মেরেছে, তারাই কি ইসব করছে, তুমা'র কী মনে লেয় ?'

না, এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর ওদের ধারণার মধ্যে আসছে না।

বাইশ

শাম্লীর মা কামিনীর পায়ের ঘা পচে গেছে। হাঁটুর নিচে থেকে সমস্ত পা-টা ফোলা, আলগা পড়ে রয়েছে, কোনো জায়গায় পুঁজ বেরিয়ে সেখানেই শুকিয়ে থাকে, কোনো জায়গায় কাঁচা রক্ত পড়ে। বুড়িটার কখনো জ্বর হয় কখনো কমে, কেউ দেখবার নেই। এই দু'মাসের ওপর হল, কুঁড়ের মধ্যে পড়ে থাকে, হাত, অন্য পাটা আর দেহ কাঠির মতো শুকনো—কখনো খেতে পায় কখনো পায় না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে মরেনি। দিন পাঁচেক হল সাঁওতালদের লুস্কি ওব চিকিৎসা আরম্ভ করেছে। কতকগুলি 'জড়ি' - শুকনো শিকড় বা লতা—আর পাতা দিয়ে গেছে, মাটির হাঁড়িতে জলে ফুটিয়ে সেই জল ঠাণ্ডা করে ছেঁকে নিতে হবে, তারপর সেই জল দিয়ে পা ধোয়াতে হবে। লুস্কি নিজে দু'দিন করে গেছে, এখন শাম্লী করে। চলছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিছু ফল বোঝা যাচ্ছে না।

পচাই আর শাম্লী—তাদের মা শয্যাশায়ী হবার পর থেকে—কেন্দ্রচ্যুত

ছিটকে পড়ার মতো হয়েছে। ঘরে এলে—যখন সংঘাতও বাধে না, তখন যেন দূর থেকে দুজন দুজনকে বাঁকা চোখে দেখে।

কাস্তে ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ করে গণপতি সিংএর গলা কেটেছে এটা নিজের চোখে দেখেছিল শাম্‌লী। তার রক্ত সমস্ত গা আর কাপড়চোপড় বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল। আসবার সময় ঢিল মেরে কাকতাড়ুয়ার মাথাটা ভেঙে খোলামকুচি করে দিয়েছিল সে।

তার পর থেকে সব কিছুকেই সে যেন মনে মনে কুটিকুটি করতে থাকে। ক'দিন থেকেই তার মাথায় ভাপ ওঠে, সেই মিলের চাতালে সেদ্ধ ধান মেলে দেওয়ার কাজের পর থেকে। তার ওপর এই পরিস্থিতি। মাঝে মাঝেই উপোস করতে হয় তাকে, এটা অপরিচিত না হলেও এখন তার মাত্রা বেশি। সিংবাড়িতে আর যায় না সে, সিংবাড়ি তো বন্ধ হয়েই গেছে। তারক হালদার বউ এনে ঘর করছে, এর মধ্যে তাকে আর একবার ডেকে পাঠিয়েছিল খাইদাই ঝির কাজ করবার জন্য, সে যায়নি। লোকটাকে সে আর বড় দেখে না। শুনেছে তার চাকরি গেছে, এখন নিজের জমিতে চাষবাস নিয়েই থাকে।

দুজন মনিষ্যির প্রসঙ্গে ওর মাথায় পোকার মতো ঝিঁঝি লাগিয়ে দেয়। মোহনের সঙ্গে সে আর কথা বলে না, মোহনও তাকে দেখেও দেখে না। ওই ওদিক দিয়ে গরু তাড়িয়ে সে মাঠে যায়, মাছ ধরে, সুতো কাটে, বাঁশি বাজায়—মুশকিল এই, সব কটাই চোখে পড়ে বা কানে শোনে।

আগে যে শাম্‌লী গাজন দুলের ঘরে যেত, কি মাঠে জলখাবার নিয়ে যেত, এখন আর তা করে না। মোহনের একটা ব্যাপার তার মনের মধ্যে পাক দিয়ে নিংড়োতে থাকে যেন। সেই এক রাত্রে সে ব্রাহ্মণভুঁইর জঙ্গলে গিয়েছিল কেন? তারপর আর যেতে দেখেনি—অবশ্য সে লক্ষও করে না। সন্ধ্যের পর সে কি ঘরেই থাকে? বাঁশির সুর ভেসে আসতে শুনেছে সে ঘর থেকে, সাঁওতালি সুর, তার ঘর থেকেই বাজায়, কিন্তু অনেক রাত্রে। সন্ধ্যার পর এতটা রাত্রি সে কি ঘরেই ছিল? একটা অদম্য কৌতূহল তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে চায় যেন—কিন্তু মরুক গে, তার কি?

আর একজন হচ্ছে ওর ছোট ভাই পচাই। ছোঁড়াটা যেন কী রকম হয়ে উঠেছে। ওকে দেখে কখনো বাঁশ কাটা ঘর তৈরির বাচ্চা যোগাড়ে মুনিষ খাটতে, কখনো সে টো-টো করে বামুনপাড়া-সাঁওতালপাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, আজকাল সাঁওতালদের মতো তীরকাঁড় তার হাতে, আগে রাত্রে অন্তত ঘরে শুতে আসত, আজকাল প্রায়ই আসে না। তারপর প্রায়ই না কি সে মটরে

করে মেদিনীপুর-খড়গপুর যায়, সেবার সিংবাবুদের চালানিতে গিয়েছিল, এখন কী জন্যে যায়, কে পাঠায় ওকে? ছোঁড়াটা খেতে পায় ঠিকই, বেশ বড়সড হচ্ছে, ঘরে খাবার নাই সে জানে, বরঞ্চ মাঝে-সাঝে চালটা-ডালটা এনে দেয়, তাবও রুজি-রোজগার আছে! সে সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করলে না-হক ভাষায় শাম্লীকে গাল দেয় – আগে সেক্ষেত্রে এড়িয়ে যেত কেবল। কিন্তু একটা জিনিস শাম্লীর মনে হয় সন্দেহের মতো লাগে – মোহনের সঙ্গে পচাইএর কোথাও যোগ আছে, দুজনের খুব ভাব। যেন তাকে টেকা দেবাব জন্যই জুটি। কিন্তু ওদেরকে এক সঙ্গে দেখেও না যে।

শাম্লী নিজে শাকগুগলি তোলে, বুনো মূল তুলে আনে, গেরস্ত বাড়িতে ধান ভেনে দেয়, গাঁয়ে সে রকম বাড়িও কম, তবে এখন মিল বন্ধ হযে যাওয়াতে ঢেঁকির খোঁজ পড়েছে। তবু দুবেলা খাবার মতো সাশ্রয় হয় না তাব নিজেরই, তার ওপর মা আছে।

কিছুদিন হল, মিল চাতালের সেই দুলির মার সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছে। প্রৌঢ়া মেয়েটার দোলানি চালচলন আর হাসি-মস্করা তাব ভালো লাগে না। কিন্তু মেয়েটাও অভাবী, পেটের ধান্দায় গ্রাম আর গ্রামের বাইরেও তাকে ঘোরাফেরা করতে হয়, মিল বন্ধ হয়ে যাওয়াতে এই রকম অনেক মেয়েকেই নাকানিচুবানি খেতে হচ্ছে।

গ্রামান্তরে যাবার সময় দুলির মা প্রায়ই শাম্লীকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। ওদের অভ্যস্ত একই ধানভানা, সেদ্ধশুকনোর কাজ, নয়তো কখনো 'কাজ'-বাড়িতে সাময়িক ঝিগিরি। লাত্নী সম্পর্কটা ধরে রেখেছে সেই প্রথম দিন থেকে, সেই সূত্রে তাকে 'অস'-এর ইঙ্গিতও করে ঠাট্টায় পরিহাসে, কিন্তু তাকে আবার অভিভাবিকার মতো আগলেও রাখে।

একদিন একটু দূরেই যেতে হয়েছিল তাদের। কথায় কথায় শাম্লী জিজ্ঞেস করেছিল, 'আচ্ছা, ঠাকুমা, এই যে সিংবাবুকে মারলে কে, কারা সব ইয়ার পিছনে আছে, তুমার কী মনে লেয়?'

ওকে ঝটিতি থামিয়েছিল দুলির মা, 'চুপ চুপ, উকথা মুযে লিতে আছে? কাকপক্ষীও রা কাড়ে নাই…'

'ঠাকুমা, তুমি এত ল্যাজে-গোবরে কেনে, ডর লেগে গেল অমনি! আমরা ত গাঁয়ের ঠিঙে অ্যাত্ দূরে আছি, কে শুনছে তুমার কথা!'

খ্যা-খ্যা করে হাসল দুলির মা, রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়েই, তারপর হাসি থামিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করল।

'লাত্নী, যাই ত সব ঠেঁয়ে, সব জাগায় ওই কথা, মৌচাকের গুনগুনানি, তুমি যাও ত চুপ করে গেল, ত এই তুমাকে বললম, ই একট' কিছুমিছু হবেক, সিংবাবু সবশেষ লয় · তা তুমার-আমার কী, আমরা সব ছোটনোক, ঘরের বার জাত-খুআনা মাগি · ' জিব কাটল ঢুলির মা, কথাটার অন্য অর্থ আছে, 'তুমাকে বলি নি, লাত্নী, মাইরি, তুমার গা ছুঁয়ে বলছি '

ম্লানভাবে হাসল শাম্লী, 'আচ্ছা, আমরা সব ছোটনোক, ভদ্দনোকেবা কী বুলছে ?'

'তাদেরই ত যত ভাবনা, ডর লেগেছে, সামাল-সামাল ! হয় তারা পগার পার, ল্যাজ গুটাই পালাইছে, লয় ত ভোল পাল্টিছে।'

শাম্লী শেষ কথাটার মানে বুঝল না।

'ভোল পাল্টিছে বুঝলে নাই ? ধর তুমারগে সিংবাবুর ডান হাত তারক বামুন, মুখপড়া বজ্জাত, বেজন্মা, মুখপড়া সাতজন্ম কচি বউট'কে বাপের ঘরে ফেলে বাখলেক, আর এখন আদর করে ঘরে লি'এসছে, ভিজে বেড়ালট', কেনে বল দিকি ?'

শাম্লী কোনো উত্তর করল না, কিন্তু কান পেতে থাকল।

'শুন থালে, বাবুদের ঘরে-ঘরেই শুনতে পাই, ই গাঁয়েই শুধু লয়, ইখেনে যেমন সিংবাবুকে কেটেছে, তেমনি উই যে গ', সাতবাথরি না কি কী বলে, সেখেনে এক মহাজনকে কেটেছে, এক লুচ্চাকে কেটেছে। সেই হইছে তারক বামুনের ভয়, তাই বউ লি'এসে সাধু সেজে বসেছে, খি-খি, ত আমার চক্ষুকে ভুলাবেক মুখপড়া, উয়ার চাউনি দেখেই শিকুরে-বেড়াল চিনি, খি-খি '

হঠাৎ শাম্লী জিজ্ঞেস করলে, সেও যেন মুখরা হয়ে উঠতে চায়, 'আর মানিজার বাবু, তুমাদের ধান-কলের ?'

আবার রাস্তার ওপর থেমে গেল ঢুলির মা, গা দুলিয়ে হাসতে আরম্ভ করল, 'মানিজার বাবু ? আমার লাগর। আমার লাগরের কথা আমাকেই শুধাইছ, মুখপড়া সব তিয়াগ দিয়ে সন্নিসি হইচে, এই দু'ট' মাস গেল, মুখপড়ার টিকি দেখলম নাই গ', হ্যা-হ্যা, মুখপড়া মিন্সে !'

তেইশ

বডম পূজার দিন সাঁওতালপাড়ায় সকাল থেকেই নানা ধারায় উৎসব এগিয়ে চলতে লাগল। মেয়েরা পিঠেপুলির চাল কোটা ডাল বাটা শুরু করল। লুস্কি মোড়ল্নী সন্ধ্যেবেলায় যে পূজা হবে তার জন্য তৈরি হতে লাগল— বেশ বড়সড় কালো পাঁঠা একটা যোগাড় হয়েছে, বনা টুডুই সেটা বলি দেবে। ক'দিন থেকে হেঁড়িয়া আর পচুই যথাসম্ভব তৈরি হয়েছে, সময় অল্প বলে পর্যাপ্ত হয়নি, ওদের মনের খুঁতখুঁতি যাচ্ছে না।

আর এক দল, সে দলে মেয়ে আছে তবে পুরুষই বেশি, সব ছেলে-ছোকরা আর জোয়ান, জঙ্গলে গেল শিকার করতে। আগে বন ছিল অনেক বেশি, এখনকার মতো চারদিক সাফসুরুত হয়ে এত পাড়া বসেনি। এখন ওদের যেতে হল ব্রাহ্মণভুঁইর জঙ্গলে, যার ওদিক পর্যন্ত গেলে—লোকে সাতক্রোশী বলে, ও অতটা নয়—কাঁসাই নদী পাওয়া যায়। সারা দিন ওরা আজ শিকার করে কাটাবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই, কী করে যেন পচাইও ওদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, তাতে তার নিজের বা সাঁওতালদের কারুরই কোনো খটকা লাগেনি। কিন্তু শাম্‌লীও যে শিকারের সময় ওদের সঙ্গে বনের মধ্যে সারাটা দিন ঘুরে বেড়াবে— ওর চেনা দুই সাঁওতাল মেয়ের ডাকে, সেটা ওরা বুঝতে পারেনি এবং পচাই রীতিমতো ফুঁসে উঠেছিল। ভাইবোনের সহজ রেষারেষিটা এখন এক রকম শত্রুতায় পরিণত হয়েছিল। দেখা হলে বা সামান্য কথাতেই দাঁত বের করা কুকুরের মতো ওরা গর্জাতে থাকে, যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা একে অন্যকে কুটিকুটি করে ফেলবে।

জঙ্গলে ঢোকার মুখে পর্যন্ত সমস্ত দলটা এক সঙ্গেই ছিল। তারপর একটু এগোতে না এগোতেই ছাড়া-ছাড়া হয়ে গেল বিভিন্ন ছোট-ছোট দলের মধ্যে, তাতে পচাই আর শাম্‌লীও আলাদা হয়ে গেল, বোধ হয় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল দুজনেই। শাম্‌লীর দল হল ফুল্‌মি আর এলমুনির সঙ্গে, মেয়ে দুটো ওর আগেকার খেলার সঙ্গী, প্রায় সমবয়সী।

ফুল্‌মি পরিহাস করে জিজ্ঞেস করলে, 'তুই আমাদের সঙ্গে এলি কেনে, তুই কী করবি ?'

শাম্‌লী পাল্‌টে জিজ্ঞেস করলে, 'তোরা কী করবি ?'

কামিনী ঘ্যানর-ঘ্যানর শুরু করলে বিরক্ত হয়। কাজেকর্মে আছে তো আছে, ভিতর থেকে একটা কিছু ওকে কুরে কুরে খায়। আগে লোকে যে বলত ওকে ঘঁড়া-রোগে ধরেছে সেটা এখন সত্যি-সত্যিই ওকে পেয়ে বসেছে যেন।

পুকুরে স্নানের ঘাটে ফিরে এসে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল শাম্‌লী। আঃ, ওর তেতে ওঠা গা আর মাথাটা ঠাণ্ডা হল। পরপর কয়েকটা ডুব দিলে ও। ওদের মতো মেয়েরা স্নান করতে এসে মাঝেমাঝে মাথার চুলে কাদা ঘষে ভালো করে ধুয়ে ফেলে, ময়লা সাফ হয় তাতে, এটা ওদের একরকম প্রসাধনও বটে। শাম্‌লী দেখেছে কিন্তু এর আগে কোনো দিন করেনি। এখন জলের তলা থেকে নরম পাঁক তুলে সমস্ত মাথায় মুখে ঘষতে লাগল ও, তারপর পুকুরের জলে গা ভাসিয়ে দিলে, কয়েক দিনের বৃষ্টিতে জলটা বেড়েছিল। অনেকক্ষণ সাঁতার কেটে ভালো করে কাদা-ময়লা তুলে ভিজে কাপড়ে ঘরে ফিরে এল শাম্‌লী।

'তুই যমালায় গেছিস, আজও গেছিস ত কালও গেছিস, ইদিকে যে ভাত পুড়ে যাচ্ছে উনানে, তার কি ?' কামিনী চেঁচাতে লাগল।

শাম্‌লী বোধ হয় মনে মনে নিজের দোষ বুঝল, তাই চুপ করে রইল। দেখলে মা ইতিমধ্যে উনুনশালে গেছে, হাঁড়িটাও নামিয়েছে।

আজকাল কামিনী অনেকটা সুস্থ, এখন আর জ্বর হয় না। যদিও হাড্ডিসার প্রেতিনীর মতো চেহারা, তবু ঘাটা অনেকখানি শুকিয়ে এসেছে এবং লাঠিতে ভর দিয়ে দাড়াতে, এক পায়ে লেংচে একটু হাঁটতে, বা কোমর ঘেষ্‌টে ঘেষ্‌টে একটু নড়াচড়া করতে পারে। গলার স্বরটা কিন্তু ধাতব তীক্ষ্ণ, 'শাকপাতা কিছু এনেছিস ?' উত্তর না পেয়ে আবার খিনখিন করে উঠল, 'কী দিয়ে পিণ্ডি গিলবি থালে !'

সে ভাবনা প্রকৃতপক্ষে শাম্‌লীর বা তার মায়েরও নয়। ফেন-গলা ভাতে নুন-লঙ্কা মেখে ওরা দুজনেই খেল। পচাইয়ের জন্য কিছু রইল না। তার খাওয়ার কথা এরা ভাবে না, সেও ভাবতে দেয় না। তবে থাকলে তিনজনেই ভাগ করে খেত।

খাওয়ার পর কামিনী যথারীতি বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। শাম্‌লীর করবার কিছু নেই, দাওয়ার ওপর বসে রইল ও। পাশেই একটা খুঁটি আছে, খড়ের চালটা ধরে রাখবার জন্য. কিন্তু তাতে ও ঠেশ দিল না। এখন ও শুকনো সাজিমাটি দিয়ে কাচা একটা শাড়ি পরেছে—এ অঞ্চলের সাঁওতাল মাহাতোদের মেয়েরা এক ধরনের মোটা তাঁতের শাড়ি পরে, এটা তাই, কাচার পর এই প্রথম পরেছে বলে ফর্সা, শাম্‌লীরা জামা পরে না।

ওর পা দুটো একটু নিচে উঠোনে নামবার ধাপির ওপর। উঁচু হয়ে ওঠা হাঁটুর ওপর ওর দুই কনুই, তারপর দুই তেলোর মধ্যে ওর চিবুক আর মুখের নিচেটা। সামনে গাছপালার দিকে ওর চোখের দৃষ্টি।

শাম্‌লীরা আত্মসচেতন নয়, নিজের মনকে নিজেই যদি ও একটু দূর থেকে দেখতে পারত, তাহলে বুঝতে পারত ঠিক এইভাবে বসে থাকা ওর পক্ষে একেবারেই নতুন। সেটা সে বুঝল না, কিছুক্ষণ পরে ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা টিনের ছোট হাত-বাক্সর মধ্যে থেকে কিছু একটা জিনিস খুঁজতে লাগল ও, একটু পরেই সেটা বেরোল।

দুলির মা একদিন ওকে দুটো কাঁচপোকার টিপ দিয়েছিল। কাঁচপোকার ডানার ওপর যে উজ্জ্বল নীলচে কালো রঙের শক্ত খোলস থাকে, এদের মতো মেয়েরা সেগুলোই গোল করে কেটে টিপ হিসেবে ব্যবহার করে। আমপাতার বোঁটা ভাঙলে যে রস বেরোয়, তাই দিয়ে আঠা বানায়। কপালে সেই আঠা দিয়ে টিপটা পরল শাম্‌লী। একটা কাচভাঙা টিনের ফ্রেমওয়ালা আয়নায় নিজের মুখ দেখল। চুলগুলো এখন শুকিয়ে এসেছে এবং রুক্ষ, অগোছালো হলেও পরিষ্কার করার জন্য উজ্জ্বল। চিরুনি চালিয়ে সেগুলো খানিকটা মসৃণ করল ও। শাড়িটা আর একবার ফিরিয়ে পরল শাম্‌লী, আচলটা ঘুরিয়ে এনে কোমরে গুঁজল। কোনো কাজে নামবার আগে এই সব খাটুনে মেয়েরা যেমন আঁটসাট করে কাপড় পরে নেয়, এও তেমনি।

কামিনী সব লক্ষ করছিল, বেরোতে যাচ্ছে এমন সময় বললে, 'কুথাকে আবার যাচ্ছিস ?'

'যমালায়·· পড়ে আছ পড়ে থাক কেনে !'

পাড়ার পথ দিয়ে ঢ্যাঙা, ছিপছিপে শাম্‌লী যখন দ্রুত পায়ে এগোচ্ছে, তখন ওর কপালে উজ্জ্বল কাঁচপোকার টিপ, রুখু কিন্তু ফাঁপানো এক রাশ কালো চুল পিঠের ওপর, আঁটসাঁট করে পরা শাড়িটা হাঁটুর নিচে মাত্র নেমেছে, একটা সংকল্প এই কাঁচা মেয়েটার প্রতি পদক্ষেপে ফুটে উঠছে যেন।

পুকুরটা পেরিয়ে বাঁকের মুখে করঞ্জ গাছটার তলায়—এখানেই একদিন মোহনকে জলখাবার খাইয়েছিল—মুখোমুখি হয়ে গেল তারক হালদারের সঙ্গে। একটা বাগাল ছোঁড়ার মাথায় ধান-ভর্তি ধামা চাপিয়ে তার পিছন পিছন যাচ্ছিল সে, জমিতে 'তলা'-ফেলার জন্য, আজকাল চাষবাসের কাজে মন দিয়েছিল সে।

থমকে দাঁড়াল তারক, মুহূর্তের জন্য যেন বিস্মিত হল শাম্‌লীর দিকে তাকিয়ে, তারপর হেসে বললে, 'কুথা যাচ্ছিস রে···', কিন্তু ঠিক তখনই তাকে পাশ

কাটিয়ে শাম্‌লী চলে গেল। গলার স্বর বদ্‌লে তারক বললে, 'তুই ছোঁড়া দাঁড়ায় পড়লি কেনে, চল ' বলে তারক গেল তার জমির দিকে, আর শাম্‌লী অন্য পথে মাঠের দিকে।

মাঠের মধ্যে নেমে তেমনি দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল শাম্‌লী, এদিক-ওদিক না তাকিয়ে দুপুর বেলায় তখন মোহন যেমন করে চলে যাচ্ছিল। মাঝামাঝি তেপাচায় যেখানে গাছগুলো জড়াজড়ি করে বসেছে সেখানে পৌঁছাল। মনে পড়ল, অনেকদিন আগে এক সন্ধ্যায় এই পর্যন্ত এসেছিল সে, নালায় নালায় ছুটে মোহনকে অনুসরণ করে।

আষাঢ়ের পড়ন্ত বেলার চড়া রোদে শাম্‌লীর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দিয়েছিল, হাত দিয়ে সে ঘামটা মুছল কিন্তু সেখানে সে অপেক্ষা করল না, আবার মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল।

জঙ্গলের মধ্যে যখন সে এসে পৌঁছাল তখন গাছের ছায়া লম্বা হয়ে পড়েছে। পথ তার চেনা, এখান দিয়েই সেদিন সে সাঁওতাল শিকারীদের সঙ্গী হয়েছিল। কিন্তু তবু বনটা যেন অন্য রকম লাগল তার পূর্বমনস্কতা সত্ত্বেও। আবহাওয়া গুমোট, মাঠে নামবার সময় ছিল না, কিন্তু আকাশটা এখন মেঘলা হয়ে উঠেছে। গাছের একটা পাতাও নড়ছে না, কোনো পাখি বা জন্তুও চোখে পড়ল না তার। ঘণ্টাখানেক হেঁটে হঠাৎ তার গাটা ছমছম করে উঠল, পথ ভুল করেনি তো? তার মনের মধ্যে রয়েছে সেই জায়গাটা, শুয়োর শিকারের পর কিছুটা এগিয়ে যেখানে সে থমকে গিয়েছিল, যেখান থেকে সে আর এগোতে চায়নি সেদিন।

জঙ্গলটা ঘন হয়ে আসছে, ঝুলে-পড়া গাছের ডাল তার মাথায় লাগল দু'এক-বার, একবার তার খোলা চুল গেল আটকে। শাম্‌লী দু'হাতে চুলের গোছ জড়িয়ে এলো খোঁপায় বেঁধে নিলে, চলা বন্ধ না করেই। সে ঘেমে যাচ্ছে, সে পরিশ্রান্ত. সমস্ত বন গাছপালা পাখি সব স্তব্ধ হয়ে যেন তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তবু সে চলছে, মাঝে মাঝে তার হাঁটাটা ছোটার মতো হচ্ছে। সেই শিকারের জায়গাটায় এসে পড়ল—না, পথ ভুল হয়নি। আবার এগিয়ে চলল ও, বুকের ভেতর একটা অসহ্য চাপের মতো লাগছে যেন, থামা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

যেন গাছের পাতাগুলো একটা ঝিরঝিরে বাতাসে নড়ে উঠল, একটু ঠাণ্ডা বাতাসের মতো—ওই, সেই জায়গাটা, ঠিক সেই জায়গাই তো! এতক্ষণ ওর মনের মধ্যে যে ছবিটা ওকে ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে, সেখানেই এসে পড়েছে। আর কয়েকটা গাছের পরেই আছে সেদিন শিকারের সময় দেখা সেই একখণ্ড

জমি, এবড়ো-খেবড়ো, গোল-চ্যাপ্টা পাথরে ঢিপির মতো হয়েছে, খোলা জমিটা যেন চাতাল বা চত্বরের মতো, চোখে দেখার আগেই মনের সামনে ভেসে উঠল।

তা হল, কিন্তু কী হয়েছে তাতে? এক মুখে হাওয়া বইতে বইতে হঠাৎ যেমন এলোমেলো হয়ে যায় বা অন্য দিকে মোড় ফেরে, এতটা একরোখামির পর শাম্‌লী হঠাৎ সেই রকম বিমূঢ় হয়ে পড়ল। কেন জায়গাটায় এসেছে সে, এখন কী করবে? একটা শালগাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল সে, সেখানেই বসে পডল। হাত-পা অনড, যেন নিঃশ্বাস পড়ছে না, কেবল ওর চোখের দৃষ্টি চলে গেছে বেঙুচ কাঁটাঝোপের মধ্য দিয়ে। সেই দিকে।

সময় কাটতে লাগল। এগোবে, থাকবে কি ফিরে যাবে, এসব শাম্‌লী যেন ভুলে গেছে। হঠাৎ চোখে পড়ল ফাঁকা পেরিয়ে পাহাড মতো জায়গাটায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। কেউ কি আগুন জ্বালিয়েছে?

বুকের ভেতর যেন লাফিয়ে উঠল শাম্‌লীর, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁডাল। প্রথম ঝোঁকে ওর মনে হল ছুটে এগিয়ে যায়, কিন্তু তারপরই বন্য জন্তুর মতো সতর্ক হল, কেউ যদি দেখে ফেলে। গাছের গুঁডির আড়ালে আডালে সন্তর্পণে এগোল ও। কাঁটা ঝোপে আটকাচ্ছিল, ডালপালায় ওর কাপড, হাত, গা লেগে মৃদু শব্দ হচ্ছিল। একটু দাডিয়ে শাডিটা এখানে-ওখানে আরো টেনে গুঁজল, খোঁপাটা আরো টান কবে নিলে, গা বাঁচিয়ে পা টিপে টিপে এগোতে লাগল শাম্‌লী।

এবং তারপর! বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করতে লাগল ও', তেমনি অনড হয়ে উঠল ওর সমস্ত অঙ্গ। শাম্‌লী এতদিন সন্দেহ কবেছে, কৌতূহলী হয়েছে, সন্ধানী নজর রেখেছে—ঠিক এই জিনিসটাই ওর মনের মধ্যে কাজ করছিল। দারুণ আবিষ্কারের আনন্দে ওব চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল, কিন্তু গলার মধ্যে আঠা দিয়ে সম্পূর্ণ আটকে রেখেছে যেন। মোহন, বুঝেছি তোমাকে!

খোলা জায়গাটা, তারপর পাথর, পাহাড়ের গা, আবার গাছপালা উঠেছে। পাথরগুলো একটা কোণের দিকে এমনভাবে রয়েছে যে গুহার মতো হয়েছে। শাম্‌লীর দাঁডাবার জায়গাটা একটু পাশের দিকে, তাই কেবল গুহার মুখটাই দেখতে পাচ্ছিল। ভিতরটা কী রকম, কী আছে দেখবার প্রচণ্ড কৌতূহল হল ওর, কিন্তু চেপে গেল। গুহার সামনের খোলা জায়গাটা যেন নিকোন উঠোন। সেখানে মোহন বসে আছে, দু' হাঁটু উঁচু করে দু' হাতে বেড় দিয়ে ধরে একটু একটু দোল খাচ্ছে, ঠিক চাষারা যেমন করে, দুপুরে দেখা সেই গেঞ্জি গায়ে

ও। কিছুদূরে এসে সতর্কতার আর দরকার রইল না, মোহন তো পিছনে রয়েই গেছে, দৈবাৎ ওই ছেলেটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেও সে তাকে চিনবে না। আঃ, এতক্ষণকার উত্তেজনার পর সমস্ত শরীরে একটা শিথিল শান্তি অনুভব করছিল শাম্লী।

সাতাশ

বনের নিচে যেখানে পায়ে পায়ে পথ হয়েছে, সেখানে ঘন ছায়া-ছায়া ভাব, কিন্তু তখনও সূর্যাস্ত হয়নি, গাছের মাথায় পাতায় পাতায় শেষ বেলার রক্তিম আলো উজ্জ্বল হয়ে পড়েছিল। সমস্ত দিনের আষাঢ়ে গুমোটের পর ঝিরঝির করে বাতাস বইছে, গাছের ডগা থেকে নিচে পর্যন্ত পাতাগুলো খেলা-খেলার মতো নড়ছে। সেদিন শিকারের সময় যা দেখেছিল, টিয়াগুলো এডালে-ওডালে এসে বসছে, ওদের খুব কোমল সবুজ গা, আর কোমল লাল ঠোঁট, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মাথার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে নানারকম পাখি ফিরছে, কিচিরমিচির থেকে কাঁ-কাঁ, কত রকম ডাক ডাকছে। এপাশে ওপাশে নানারকম ফুল ফুটে রয়েছে, যাবার সময় কি শাম্লীর একটাও চোখে পড়েনি? একটা জায়গায় রাশি রাশি খড়ফুল, সেদিন বুল্‌মিরা যা করেছিল, দুটো বোঁটা ভেঙে টান করে বাঁধা তার খোঁপায় গুঁজে দিল। পা দুটো হালকা হালকা ঢেউয়ের মতো যেন ওকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

'শাম্লী…'

একটু থমকে গেল মেয়েটা, কে—ওদেরই কেউ ডাকল না কি।

না, মোটা শিমুল গাছটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল তারক হালদার। দাঁড়াল ওর সামনে। গায়ে গেঞ্জি, পরনে লম্বা-ডোরা পাজামা। দুপুরে যখন বীজধান বুনতে যাচ্ছিল, তখন এই পোশাকই ছিল কিনা কে জানে।

'শাম্লী, তুই কোথা গেছলি রে, একলা…'

কী রকম লাগল শাম্লীর, সেদিনকার সেই সিংপুকুরের কথা মনে পড়ে গেল চকিতে, বললে, 'যেথা যাই কেনে…'

'তুই কোথা গেছলি জানি আমি। অনেকদিন জানি, কাকেও কিছু বলি নাই ই সব বনজঙ্গলের কথা। ত হঁ রে শাম্লী, তুই ওই মহন ছঁড়াটোর পিছনে ঘুরছিস কেনে, আ.র শুন শুন…'

শাম্‌লী পাশ কাটিয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েও থমকে গেল। তারকের চোখের দিকে তাকাল শাম্‌লী, আর শিউরে উঠল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা যেন শাম্‌লীর ডাইনে বাঁয়ে পিছনে সামনে পালা করে পড়ছে, মাকড়সার জাল তৈরি করছে যেন, শাম্‌লী একটু নড়লেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আটকাবে।

'শুন না, শাম্‌লী, তখন তোর সঙ্গে গাঁয়ে ছুফর বেলা দেখা হল, ত কথা কইতে চাইলম, তুই মুখ ফিরায় চলে এলি, তোকে তখন যা সুন্দরী দেখাচ্ছিল না, চুল মেজেছিস, টিপ পরেছিস, মাইরি, আচ্ছা, তুই আমার উপ্‌রে এত রেগে আছিস কেনে···ত দেখলম তুই মাঠ পেরিয়ে বনের দিকে চললি, ত বাগালট'কে কাজে লাগায় দিলম, এলম তোর পিছু-পিছু, ভাবলম তোর সঙ্গে নিরিবিলি ছুট' মনের কথা কইব···'

থ বনে গেল শাম্‌লী, লোকটা কি আগাগোড়া তার পিছনে ছিল না কি ? সম্মোহিতের মতো তারকের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

'শাম্‌লী···' খপ করে ডান হাত দিয়ে শাম্‌লীর বাঁ হাতের কব্জিটা ধরে ফেলল তারক, 'উই ওখেনটায় একট' ফাঁকা জাগা আছে, আয় না, ছুজনে বসে কথা কই একটু···'

ঝট্‌কা মেরে হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করল শাম্‌লী, 'মুখপড়া, আবার আমার কাছে এসছিস, মুখপড়া, বাঁজীর বেটা···' আর তখনই বুঝতে পারল তারক তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

'আয় না, আয় না, ওখেনে একট' ভাল জাগা আছে···'

'ছাড়, ছাড় বলছি বেজন্মা···'

তারক উদ্দিষ্ট জায়গাটার দিকে শাম্‌লীকে টেনে-হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে যাচ্ছে, চলা-পথ থেকে দূরে, অন্য হাতটায় যেই একটা ডাল ধরছে শাম্‌লী, 'আয় না' বলে অমনি হ্যাঁচ্‌কা মারছে তারক, ডালটা শক্ত হলে শাম্‌লীর হাতটা ছড়ে গিয়ে ছেড়ে যাচ্ছে, কচি ডগা হলে ডালটা ছিঁড়ে চলে আসছে, একবার পায়ে কী বেধে পড়ে গেল শাম্‌লী, 'উঠ্‌ না, উঠে পড়্‌, তুই অমনি করছিস কেনে' মোলায়েম স্বরে বলছে বটে তারক কিন্তু লোহার মুঠিতে অত্যন্ত ঝাঁকিয়ে তাকে উঠিয়েই আবার টানছে।

মাথার টান-খোঁপা-গেছে খুলে, ফুল কখন পড়ে গেছে, শাড়ির গুঁজে রাখা আঁচলটা আলগা, হাঁপাচ্ছে শাম্‌লী, কাঁপছে থরথর করে—যখন সেই জায়গাটায় ওকে টেনে আনল। একফালি ফাঁকা জায়গাটা, একটু নিচু, ঘাস বিছানো, চলা পথের দিকে একটা উঁচু আলের মতো আড়ালও রয়েছে। জায়গাটা কি

তারকের তৈরি করা না কি !

তারক একটুও পরিশ্রান্ত হয়নি, ওর গায়ে না কি ভালুকের জোর, ওর হাত থেকে কোনো মেয়ে রেহাই পায়নি—ডুলির মার কথাগুলো মনে পড়ল শাম্‌লীর, আর কান্নায় যেন ককিয়ে উঠল, 'ছাড় না! মুখপড়া, খান্‌কীর বেটা, ছাড়…' ডান হাতের মুঠিতে সজোরে তারকের বুকে একটা কিল মারল শাম্‌লী।

'উঃ…' একটু কাতর হল তারক, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার সেই আদরের স্বরটা আনবার চেষ্টা করল গলায়, 'শাম্‌লী, তুই আমাকে বিয়া কর উই বাউণ্ডুলে মহন ছঁড়াট'কে বিয়া করে তুই কী পাবি, আমার টাকা আছে, জমি আছে, টাকা লিবি তুই ? আচ্ছা, লে…' ডান হাতে শাম্‌লীকে ধরা, বাঁ হাতে ট্যাকে হাত দিতে গেল সে, ঠিক সেই মুহূর্তে আর একটা কিল মারল শাম্‌লী, 'ছাড় '

তারক এরপর আর কথা বলল না। শাম্‌লীর একটা হাত ধরেছিল এতক্ষণ, এখন দু'খানা হাতই জড়ো করে তার নিজের ডান হাতের মুঠিতে ধরল, এক হাতে ধরে রাখবার মতোও জোর ছিল তার। বাঁ হাত দিলে শাম্‌লীর বুকের ওপর, মোচড় দেওয়া শেষ হল না, সাপ যেমন কিলবিল করে এঁকেবেঁকে ওঠে, তেমনি করে শাম্‌লী সে চেষ্টা ব্যর্থ করল। মুহূর্তের জন্য যেন বিমূঢ় হয়ে উঠল তারক, একটু চিন্তা করল।

তারপর জড়ো করে ধরা শাম্‌লীর হাত দুটোর মাঝখানকার ফাঁক দিয়ে নিজের মাথাটা গলিয়ে নিয়ে চকিত বেগে ওকে নিজের বুকের ওপর সজোরে চেপে ধরল, শাম্‌লীর বুক তারকের বুকের ওপর, ডান হাতে ওর কোমরটা বজ্রবেষ্টনীতে আটা, বাঁ হাতে শাম্‌লীর ঘাড়ের কাছটা ধরেছে। তাতে শাম্‌লীর দু' হাত দু' পা খোলা পড়ল, সে যতটা পারছে কিল চাপড় মারছে তারকের পিঠে, হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারছে ওর হাঁটুতে। তা হোক, কিন্তু তারক শাম্‌লীর ঘাড়ের পিছনে হাত রেখে মাথাটা নিজের কাঁধের ওপর এমনভাবে চেপে রেখেছে যাতে কামড়াকামড়ি না করতে পারে। আর সেই অবস্থাতেই—শাম্‌লীর স্ত্রীঅঙ্গগুলোকে যথাসম্ভব উত্তেজিত করে তুলবার চেষ্টা করছে।

কতক্ষণ চলল এই রকম, আস্তে আস্তে শাম্‌লীর হাত পা ছোঁড়া ক্ষীণ হয়ে এল। মনে মনে আশ্বস্ত হল অভিজ্ঞ তারক, এমনিই হয়, আর তাই হতে আরম্ভও করেছে। শাম্‌লীর দেহটা এখন ঠিক কঠিন প্রচণ্ড বেগে বিচ্ছিন্ন হতে চাইছে না, বরঞ্চ যেন একটু নরম হয়েছে, আপনিই বুকের ওপর যেন লেপ্‌টে রয়েছে। বাব্‌বাঃ ! এ রকম অভিজ্ঞতা তার কখনো হয়নি।

শাম্‌লীর ঘাড়ের ওপর তার হাতের চাপটা একটু শিথিল করল তারক, না,

কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। ওর মুখটা দেখতে পাচ্ছে না সে, নিজের মুখটা যথাসম্ভব বাঁকিয়ে শাম্‌লীর গালে একটা চুমু খেল, ওই অবস্থায় যা সম্ভব। মাথাটা সরাবার চেষ্টা করল শাম্‌লী, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। পরীক্ষা করবার জন্য ঘাড়ের পিছনকার হাতটা তুলল তারক, মাথাটা তেমনি করে পড়ে আছে। এইবার শাম্‌লীর মুখখানা যতটা সম্ভব ফিরিয়ে চুমু খেতে লাগল।

এই বার? কতক্ষণ অনিশ্চিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল তারক। ওর বজ্রবেষ্টন শিথিল করল না, কিন্তু ওর অন্য হাত আর মুখ কাজ করতে লাগল। এরপর—শাম্‌লীর কোমরে গোঁজা শাড়ির আঁচলটা খুলতে গিয়ে থেমে গেল তারক, মত বদলে ওদের লেপ্‌টে থাকা দুই দেহের মাঝখান দিয়ে হাত ঢোকাল, নিজের পাজামার দড়িটা আলগা করে উলঙ্গ হল। তারপর শাম্‌লীকে নিয়ে মাটিতে বসল ও, এখন শাম্‌লীর কোমরে গোঁজা শাড়ির আঁচলটা খুললে। আঁচলটা ঘুরিয়ে আনতে হবে, ওদের দুই বুকের মাঝখান দিয়ে শাড়িটা গেছে, ডান হাত একটু ঢিলে করে শাড়িটা টেনে টেনে সরিয়ে আনল, শাম্‌লীর নগ্ন বুক ওর গেঞ্জিপরা বুকে লাগল। এখন গেঞ্জিটা খোলার দরকার নেই। এখন শাড়িটা, ডান হাতে শাম্‌লীর কোমরের যেখানটা এখনো বেড় দিয়ে রেখেছে—হাতটা একটু আলগা করে শাড়িটা ওদিক থেকে টানবার চেষ্টা করল। টানা গেল না, নাভির কাছে গিঁঠ দিয়ে রেখেছে না কি? একটু নেড়েচেড়ে দেখবার চেষ্টা করল তারক, মেয়েটা কি মূর্ছা গেছে? না, এমনিই হয়ে থাকে। নিজের গা থেকে মেয়েটাকে একটু আলগা করল তারক, কিন্তু এতক্ষণ শাড়ির যে অংশটা খুলেছে, তারই খানিকটার ওপর শাম্‌লীর বসা অবস্থা হল। বাঁ হাতে সেই আঁচলটা ধরা ছিল, ডান হাতটা কোমর থেকে এনে নাভির কাছে—ঊর্ধ্বাঙ্গ তো অনাবৃত ছিলই—শাড়ির খুঁটে হাত দিয়ে টেনে খুলে ফেলল।

বিদ্যুৎ চমকাল যেন—শাম্‌লী একটা বাচ্চা ছাগলের মতো তিড়িক করে লাফিয়ে পড়ল পিছনে, তার কালো ছিপছিপে দেহটা অন্ধকার নেমে আসা কালো জঙ্গলের মধ্যে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারকের হাতে তখনো তার শাড়িটা ধরা, বিদ্যুৎ-চমকের প্রথম ধাক্কাটা কাটলে, বুকফাটা নৈরাশ্যের একটা কাতরানি বেরিয়ে এল, 'ইঁই যাঃ...'

শাম্‌লীও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে যেন কাটাচ্ছে ও। এক সময় নিজের তোলা দুই হাঁটুর একটার ওপর গাল রেখে মোহনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াল ও। তারপর তার সন্দেহ থেকে শুরু করে আজ দুপুরে তার বনের মধ্যে আসা, ফিরে যাবার সময় তারকের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তার ফলাফল সমস্ত অকপটে বলে গেল শাম্‌লী। বলতে বলতে কখন তার কুণ্ঠিত ভাবটা কেটে গিয়েছিল, মুখ তুলে তাকিয়েছিল মোহনের চোখের দিকে, শেষ দিকে তার কণ্ঠস্বরে যেন একটা গর্বিত ভাবও ফুটে উঠল। হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসল শাম্‌লী, 'তুমি কে মহন, তুমার স্যাঙাৎ কে, আমাকে বলবে নাই?'

বিরক্ত হয়ে মোহন বললে, 'কী হল তুমার এই সব করে, সব জেনে গেলে ত?'

একটু সংশয়ীর মতো তাকাল শাম্‌লী, পরক্ষণেই উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'মা কালীর দিব্যি, মহন, আমি কাকেও বুলব নাই...' পরক্ষণেই তার কণ্ঠস্বর আবার নিস্প্রভ হয়ে এল, 'কিন্তু উই মুখপড়াট' তুমাদের কথা জানে বললেক...' বলে তারক এ সম্বন্ধে যা বলেছিল তা মোহনকে জানাল।

মুখ নিচু করে বসে রইল মোহন, মাটির ওপর আঙুলে হিজিবিজি টানতে লাগল। এক সময় উঠে দাঁড়াল, বললে, 'চল...'

শাম্‌লীও উঠে দাঁড়িয়েছিল, বললে, 'কুথাকে যাবে, মহন?'

'সেই মুখপড়াট' যেখেনে তুমাকে ধরেছিল, সেখেনে...' মোহনের কণ্ঠস্বরে বোধ হয় ব্যঙ্গ ফুটে উঠল।

সেটা লক্ষ না করে ভীত স্বরে শাম্‌লী বলে উঠল, 'কেনে?'

'তুমার শাড়িট' ত দরকার, পাড়ায় ফিরবে কী করে? এখেনে কুন্থ কাপড় নাই...আর সে মানুষট' তুমাকে না পেয়ে তুমার শাড়িট' লিয়ে ঘরকে যায় নাই লিচ্চয়, সেখেনে পড়ে আছে ঠিক...'

শাম্‌লী আবার নিজের রাশি চুল টেনেটুনে নিজেকে ঢাকল। একটু এগোতে না এগোতেই ভয়েই হোক বা যে জন্যই হোক, মোহনের হাত ধরল শাম্‌লী। মোহন আপত্তি করল না।

একফালি চাঁদ এখন গাছের মাথার উপর উঠেছে, গাছের ছায়া পেরোলেই আলোতে দেখা যায় দুজনে হাত ধরাধরি করে হাঁটছে, একজনের কোমরে গামছা, অন্যজনের গেঞ্জি, দুজনেরই খালি গা।

এক সময় শাম্‌লী বললে, 'তুমি কে আমাকে বলবে নাই, মহন? মুখপড়াট' বলছিল তুমার চালচুলা নাই, বাণ্ডুলে...'

মোহন চুপ করে রইল এবারও। কিন্তু তারকের আরও একটা কথা এই

মুহূর্তে যেন শাম্‌লীর বুকের ভেতর তীরের মতো খোঁচা মারল, সেই ঝোঁকে ও বলে উঠল, 'মহন, তুমি আমাকে বিয়া করবে ?'

চকিতে ওর মুখের দিকে তাকাল মোহন, কিন্তু তারপরই চোখ ফিরিয়ে নিলে এবং এবারও কিছু বলল না।

চুপসে গেল শাম্‌লী, বুকের ভেতরটা ছিছি করে উঠল। হাঁটতে হাঁটতে একটু পরেই নিজের হাতটা টেনে নিলে শাম্‌লী, মোহন সহজেই ছেড়ে দিলে।

অনেকটা সময় হাঁটার পর সেই জায়গাটায় পৌছাল ওরা, কিন্তু—ভয়ে অস্ফুট চিৎকার করে মোহনের পিছনে এসে দাঁড়াল শাম্‌লী। পরিষ্কার আলোয় দেখা গেল একটা গাছের ডাল থেকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে তারক হালদার।

এগিয়ে গেল মোহন, পিছু পিছু শাম্‌লীও। এবার মোহনের পিঠে হাত রেখেছে শাম্‌লী, ছুঁয়ে রয়েছে। কাছে আসতে বোঝা গেল, শাম্‌লীর শাড়িটাই পাকিয়ে গলায় দিয়েছে লোকটা, স্পষ্টত আর কিছু ছিল না বলে। লোকটা গর্ব করত, তার হাত থেকে কোনো মেয়ে ফস্‌কায়নি। আজ নারীজয়ের চরম মুহূর্তটিতে তাকে পরাজিত হতে হয়েছে, সে অপমান সহ্য করতে পারেনি।

'ছাড় দিকি…'

'কেনে, কুথাকে যাবে তুমি ?' শাম্‌লী ভয়ে বলে উঠল।

মোহনের ঠিক অভ্যাস ছিল না, কিন্তু গাছটায় উঠে পড়ল ও, নিচের ডালেই ছিল শাড়ির গেরোটা, একটু চেষ্টা করেই সেটা খুলে দিতে পারল। ধপাস করে মাটিতে পড়ল তারকের দেহটা।

নিচে নেমে এসে মোহন শাড়ির অপর প্রান্তটাও তারকের গলা থেকে খুলে ফেলল।

'দেখ মানুষট'কে…'

'উ আমি দেখতে লারব …' কিন্তু তবুও সেদিকে তাকাল শাম্‌লী। স্পষ্ট চাঁদের আলোয় তার বীভৎস মুখখানায় একবার চোখ বুলোতে গিয়েই—ইস্‌, তার কপালের সেই কাঁচপোকার টিপটা লোকটার গালে আটকে আছে!

পাকানো শাড়ির ভাঁজগুলো খুলছিল মোহন, খুলে এবড়ো-খেবড়ো যথাসম্ভব মসৃণ করে দিলে। শাম্‌লীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'পরে লাও।'

'অ মা গ', কী বলছ তুমি!'

'তুমি যে উয়াকে মারিছ '

কথাটার মানে বুঝল না শাম্‌লী, কিন্তু মোহনকে বুঝল। চাঁদের আলোয় মোহনের মুখখানা উজ্জ্বল, হাসছে। ভুলে গেল সব কিছু সে, নির্দেশ পালন

করল। হাত বাড়িয়ে শাড়িটা নিলে সে, একটু আড়ালে সরে গিয়ে শাড়ি পরা শেষ করে বললে, 'উই তুমার গেঞ্জিট' লাও '

আবার দুজনে এগোচ্ছে, বন পেরিয়ে গ্রামের দিকে। একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল মোহন, গাঢ় স্বরে বললে, 'শাম্লী…'

'কী…'

এবারে শাম্লীকে বুকের ওপর টেনে নিলে মোহন, ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। একটু পরেই বললে, 'আমি তোকে বিয়া করব, তুই আমার বউ হবি, শাম্লী …' বলে শাম্লীর মুখখানা কাঁধের থেকে সরিয়ে আনল সামনে, অনভিজ্ঞ যুবক শাম্লীর ঠোটের ওপর অনভ্যস্ত চুম্বন দিল।

গাছের পাতা এখানে-ওখানে ঝরে পড়ছিল, তারই দু'একটা পড়ল ওদের মাথায়।

উনত্রিশ

এবারে সিংবাবুদের বুড়ো মাহিন্দার লক্ষ্মণই গেল পাশের গাঁয়ে জেলে পাড়ার লাবাণের কাছে। তখন পড়ন্ত বিকেল, একটু পরেই সন্ধ্যা হবে। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, পথের নরম জায়গায় কাদা, পায়ের পাতার ওপর একটা পরত জড়িয়ে যাচ্ছে, কোথাও মাটিতে বালি-কাঁকরের ভাগ বেশি, সেখানে পা ঘষে কাদাটা তুলে ফেলে। লক্ষ্মণের পায়ের গতি দ্রুত, তবে মাঝে মাঝে পদক্ষেপ অনিশ্চিত হচ্ছে বা দাঁড়িয়ে পড়ছে।

জেলে পাড়ায় ঢুকতেই একটা বুড়ি—ধুচুনিতে করে পুকুর থেকে চাল ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছিল—ওকে দেখে থমকে দাঁড়াল, 'ইদিকে কুথাকে যাবে গ', দিগারের পো?'

'এই এলম তুমাদের পাড়ায় '

আরো কিছু বলতে গেল বুড়িটা কিন্তু বলল না। লক্ষ্মণ জায়গাটা পেরিয়ে যেতে গিয়ে বুঝতে পারল, বুড়ির মুখে অসন্তোষের চিহ্ন, ঠায় দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ করছে। পাড়ায় এসময় বেশি লোকজন থাকার কথা নয়, নেইও। আরো একটু এগোতেই দেখলে, পাড়ার জোয়ান ছেলেরা 'চিকা' খেলছে—ছক-কাটা মাঠে আড়াআড়ি লাইন বরাবর, লম্বি-আড়ি—এক দল ঘিরেছে, আর এক দল ফাঁক গলে পেরোবার চেষ্টা করছে, জেলেদের মাছধরা খেলার উপযুক্তই বটে।

লক্ষ্মণকে দেখে এক-আধটা ছোঁড়া থমকে গেল, অন্যদের কী বললে। বলাবলি শুরু হল, তারপর কয়েকটা ছেলে এগিয়ে এল, 'কুথাকে যাচ্ছ, লক্ষ্মণ-জ্যাঠা?'

'যাচ্ছি উই তুমাদের লারাণের কাছে…'

'কেনে গ'?'

'অনেক দিন তুমাদের ইদিকে আসি নাই, তাই…' বুড়োর অন্তরঙ্গ হাসি কিন্তু মাঠে মারা গেল, ওরা যোগ দিল না, বরঞ্চ পরস্পরের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করল।

লক্ষ্মণ চলে যাচ্ছে এমন সময় একজন বলে উঠল, 'জালটাল বানাইছে বোধায়, লারাণ জাল বুনে ভাল…' বলা শেষ হল না, অনুচ্চে হেসে উঠল সকলে, 'চল চল, খেলাট' মাটি হল।'

ওরা সরে যেতে না যেতেই লারাণ বেরিয়ে এল, একটা ঘরের আড়াল থেকে। একটা জাল বুনছিল সে। সম্ভব যে শেষ কথাগুলো সে শুনেছিল। বলে উঠল, 'লক্ষ্মণদা, তুমার জালট' তয়েব কবতে দেবি হবেক, আজ পাবেক নাই…' বলতে বলতে ওব কাছাকাছি এল কিন্তু না দাঁড়িয়ে ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, যেন পাড়ার বাইবে কোথাও যাচ্ছে।

লক্ষ্মণ বুড়ো এবং নিজেব জগতে সরল হলেও ইঙ্গিতটা বুঝল না তা নয়। কিন্তু এতদিন সবার কাছে কাজের লোক এবং ভালো লোক বলে মান পেয়ে এসেছে, তাই এই অবহেলা তাব আঁতে লাগল। জেলে পাড়ার সবাই তাকে সন্দেহ করছে, পাড়ায় ঢোকাটা পছন্দ করছে না এবং এক রকম দরজা থেকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিচ্ছে, কেন? রাগে গাটা রী-রী করে উঠল ওর—কিন্তু ওই আজকের ছোঁড়াবা ওখানে খেলছে, সেই বুড়িটা তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে—সে কিছু বলতেও পাবল না। উল্টো মুখে ফিরে লারাণের পিছু নিলে।

'তা কদ্দিনটাক লাগবেক, বুলে যাও কথাট'…' মিইয়ে যাওয়া স্বরে বললে লক্ষ্মণ, তাব আরো রাগ হচ্ছিল যে নিজেও সে মিথ্যেমিথ্যে বানিয়ে বলছে. জালটাল তো সত্যিই সে আর বানাতে দেয়নি।

'সেঁইট' আমি বুলতে লারব, দশ দিন কি বিশ দিন লাগায় যাবেক…'

লক্ষ্মণ আর কথা বলল না, তাব সঙ্গে কথাবার্তায় অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পাক সেটা লারাণ চায় না।

পাড়াটা পেরিয়ে এল, মাঠের ধারে এসে পৌছেছে ওরা, আব একটু গেলেই ওদিকে সিংপুকুর পড়বে। বুড়ো মানুষের রাগ হঠাৎ চড়ে যায়, ক্রুদ্ধ স্বরে লক্ষ্মণ বলে উঠল, 'হঁ লারাণ, ই তুমার কেমন ব্যাভার, আমাকে অফমান

করলে তুমি! আমাকে ভাঁড়ালে কেনে? উই পুঁচকে ছুঁড়াগুলার কথা ছাড়ান দাও, উয়াদের বাপকে পয়দা হয় দেখেছি, ত তুমি যে লক্ষ্মণদা-লক্ষ্মণদা কর, সেদিন রাতবিরেতে আমার ঘরে গেলে...'

'হঁ, গেলম, আমি গেলম তুমার কাছে খেতে, লুকিয়ে, আর তুমি দিনের বেলা পেকাশসে...'

'ত হল কী তাইতে, হঁ?'

লারাণ ঘাড়ের পিছনে তেরছা করে দেখে নিলে কেউ কোথাও আছে কি না। নিচু স্বরে বললে, 'লক্ষ্মণদা, তুমার কী কী আছে বল দিকি, কেনে এসছিলে আমার কাছে?'

এই হল মুশকিল, ভিতরটা তখনও রাগে গোঁ-গোঁ করতে থাকলেও মিষ্টি কথায় মনটা গলতেও থাকে।

লারাণ জাল বোনা বন্ধ করে হাত বাড়িয়ে দিলে, 'বিড়ি দাও দিকি একট'...' বলে ও লক্ষ্মণের ট্যাঁকের দিকে চোখ রাখল।

উঁচু হয়ে ওঠা ট্যাঁক থেকে একটা ছোট গোল টিনের কৌটো বের করল লক্ষ্মণ, ওদিক থেকে দেশলাই। দুটো বিড়ি বের করে দুজনে ধরাল।

লক্ষ্মণ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'বুলতে ত এস্ছিলম ভাই, সে অনেক কথা, তুমাদের পাড়ায় মগজ্‌ট' বিগড়ায় দিলেক। ত এই কাঠ্‌ঠাকুর দাঁড়ায় দাঁড়ায় কথা কইব, না বসবে কুথাকে?'

'না-না, উ লয়, চলতে চলতে কথা কও, ভিন পাড়ায় যাচ্ছি যেমন।'

'ই ব্যাপারট' হল ভাল ' বলতে শুরু করেছিল লক্ষ্মণ কিন্তু বাধা পড়ল।

চাঁদসোলী মাঠের ওপর দিয়ে কে একটা লোক খানিকটা হেঁটে, খানিকটা দৌড়ে তাদের দিকেই আসছে। লক্ষ্মণ চোখের ওপর হাত তুলে ঠাওর করার চেষ্টা করল, দেখলে যে সে লোকটাও তেমনি মাঝে মাঝে তাদের ঠাওর করে আসছে। বললে, 'ধনু পাতর, ধনু পাতর কেনে এস্‌ছে বল দিকি, কুথাকে যাবেক বোধ হয় '

একটু পরেই ধনু হাঁপাতে হাঁপাতে তাদের কাছে এসে থামল, 'লক্ষ্মণদা, জেলের পো, আমি ঠিক ঠাউরেছিলম!'

ধনুর পাঁজরা দুটো হাপরের মতো ওঠানামা করছে, জিরোবার জন্যে একবার বসল ও।

'কী হইচে বল দিকি, তুমি অমন ধারা করছ কেনে?' লারাণও বসল তার পাশে, তার জাল বোনা বন্ধ হয়ে গেছে।

'হুই মাঠের মধ্যে ঠিঙে তুমাদের দেখলম, তাই চলে এলম। না'লে বউকে লিয়ে তড়িঘাড় ঘরে যাচ্ছিলম···বিভীষণ কাণ্ড! ত উই দেখ, উদিকে, উই যে উপাড়ায় মাগিগুলা ঢুকছে, আমার বউট' শুদ্ধ আছে উয়াদের মধ্যে, উয়াদের মাথায় কাঠের বঝা দেখছ, আদ্ধেক বঝা, কাঠ আর জঙ্গলে লিয়া চলবেক নাই, ধ্যুত্তোরি লিকুচি করেছে কাঠভাঙার, এই কানমুলা নাকমুলা, আর কুন্থ দিন জঙ্গলে যাব নাই, বউট'কেও পাঠাব নাই···'

'কী কাণ্ড, বলবে ত আগে ' লক্ষ্মণ খানিকটা বিরক্ত স্বরে বললে, সে তখনও দাঁড়িয়েছিল।

'বলব কী, লক্ষ্মণদা, তারকবাবুকে ঠগীএ মারিছে বনের মধ্যে, বউট' বললেক আমাকে, আমি আবার নিজের চোখে যেয়ে দেখলম '

এইবার লক্ষ্মণ আগ্রহ করে ধনুর পাশে বসে পড়ল, বললে, 'সত্যি বলছ, ধন্থ, লোকট'কে মারিছে ?'

'সত্যি বলছি, লক্ষ্মণদা, মাইরি, যদি মিছা বলি ত আমার জিব খসে যাবেক। ত ঠগীরা মারে কী কবে জান ? বন ঠিঙে বাঁশের পাব্‌ড়া ফিঁকে দেয়, পায়ে লেগে পড়ে গেল লোকট', ত দু-চারজন ছুটে এসে গলায় লম্বা লাঠি দিয়ে দু'দিকে দুজন চেপে দাঁড়ায়, আর দুজন দু'পা ধবে উল্‌টায় দেয়, ত লোকট'র ঘাড় ভেঙে যায়। ত সবাই দেখলে, আমিও দেখলম, তারকবাবুর ঘাডট' ভেঙে দিছে '

'বেশ করেছে, শালাঃ · ' বুড়ো লক্ষ্মণের চোখ জলে উঠল, 'উই বজ্জাতট' বাবুকে খেইছে।'

যেন বুঝতে পারছে না কিছু এমনিভাবে ধন্থ পাতর তাকাল লক্ষ্মণের দিকে, থমকে গেল একটু, তারপরেই নিজের বর্ণনা আরম্ভ করে দিলে, 'গমস্তা বাবু বোধ হয় টাকা লিয়ে কুথাকে যাচ্ছিল, মড়ার দু'পাশে তিনট' পাঁচ টাকা, না, দশ টাকার লোট পড়েছিল, বাকি সব টাকার গোছার চিহ্নত নাই, দু'তিনট' ছিটকে পড়েছিল বোধায়, ত উলঙ্গ পড়ে আছে, বুঝলে তুমবা, উঃ, চক্ষে দেখা যায় নাই '

থেমে গেল ধন্থ পাতর, একটানা অনেকক্ষণ বকেছে, একটু দম নিতে চাইল। এরাও দুজন স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে, চুপ করে রয়েছে যে যার নিজের কারণে।

ধন্থ পাতর হঠাৎ উঠে পড়ল, দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বললে, 'তুমরা সব যাই বল, তুমরা হলে পাচীন লোক, অনেক দেখেছ-শুনেছ, কিন্তু সিবার খুনেরা গলা

কাটল সিংবাবুর, আজ ঠগীএ গলা ভাঙল গমস্তাবাবুর, ত ই যা দিনকাল পড়ল নাই, দেখে লিও তুমরা, এই বলে গেলম ' বলে হনহন করে চলে গেল তার পাড়ার দিকে।

ওরা দুজনেই তাকিয়ে রইল সে দিকে, যতক্ষণ না ধনু আড়াল হয়ে গেল। বেলা শেষ হয়ে এখন আবছা হতে আরম্ভ করেছে।

লারাণ তার রেখে-দেওয়া জালটা তুলে নিয়ে বুনতে আরম্ভ করল আবার, মুখে তার এক ধরনের হাসি। বললে, 'কী রকম বুঝলে গ', লক্ষ্মণদা ?'

'উ আপদ গেছে, বাঁচা গেছে, তবে কী জান, ইসব খুনে-ঠগী, তিন মাসের ভিতর দুট' হল…'

একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করল লারাণ, 'তুমিও যেমন, ইসব খুনেও লয়, ঠগীও লয়।'

'খালে ? তুমি যে আশ্চয্যি কথা শুনাইছ, জান না কি কিছু ?'

'লক্ষ্মণদা, তুমাকে আমি ভক্তিছেদ্দা করি, তাচ্ছল্য করছি নাই, কিন্তু তুমার বয়স হইচে, তুমি চোখে দেখ নাই, কানে শুন নাই।'

'হুঁ-হুঁ, তা বটেক, তা বটেক…' বলতে বলতে বেকুবের মতো লারাণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল লক্ষ্মণ।

লারাণ একবার চারদিক ভালো করে দেখে নিলে, তারপর বললে, 'তুমার কথা কী ? না, সিংবাবুর মত লোকট' গত হল, গিন্নীমায়ের বেধবার বেশ, বড় বাবু ভয়-তরাসে লোক, গাঁয়ে ফিরে এল নাই, মাঠের সব জমি পতিত পড়ে থাকল…ত আমিও সেই রেতে তুমার কাছে গেছলম, উই সব কথা বলতে, মাছ ধরা হল নাই, মাছের পনা ছাড়া হল নাই, বল ঠিক কি না, এই সব ত ?'

'হ, ঠিক ত, ই কথা খুব ঠিক !'

'আমি বলছি ঠিক লয়, উ কথা ঠিক লয়…' উত্তেজিত হয়ে লারাণ উঠে দাঁড়াল, লক্ষ্মণকেও দাঁড়াতে বলল, দূরে মাঠের দিকে চোখ রেখে বললে, 'উই যে চাঁদসোলের আড়াইকোশী মাঠ, ভাল করে দেখ দিকি, কুথাও জমি পতিত পড়ে আছে দেখছ কি ? সময়ট' এখন কী বল, আষাঢ়ের শেষ, ত অন্য বছর মাঠে যেমন চাষ পড়ে, কি 'তলা' পড়ে, তার কিছু কমতি দেখছ কি ? দেখ ভাল করে…'

'হুঁ-হুঁ, তাই ত, এইট' কেমন ধারা হল বল দিখি…' অবাক লক্ষ্মণের মুখটা হাঁ হয়ে গেল।

'তাই ত বলছি, তুমি দেখবে, উই আড়াইকোশী মাঠের এক ছটাক জমি

ফাঁক পড়বেক নাই, সব চাষ হবেক। ই বেলা তুমি দেখছ নাই, কিন্তুক কাল সকালা দেখবে, কত লোক যে লাঙল দিচ্ছে, কুপাইছে, বীচ ফেলছে, শুনি না কি, আরো সব এস্‌বে, ই গাঁয়ের লয় ভিন গাঁয়ের লোক এস্‌বে…'

'তুমার কথা যথাত্ত দেখি বটেক…' লক্ষ্মণের চোখ তখনো মাঠের দিকে, লারাণের কথা মতো মিলিয়ে নিচ্ছে যেন, 'তুমি ইসব জানলে কী করে বল দিকি ?'

'আমাদের পাড়ায় ঢুকলে, ছঁড়াগুলা তুমাকে কী চোখে দেখল, তবু বুঝলে নাই ? রেতের বেলা পাড়ার ভিতর সব লোকে ঘুমায় না কি ? ত চলছে সব ফিসফাস, অন্ধকারে গাছতলায়, মাঠে, কি কুথাও বসে গেছে, তিন জন, কি চার জন, কি পাঁচ জন…তুমি গেলে ত সব চুপ, ত এই রকম সব পাড়ায় চলে শুনি।'

'থালে, ইসব যে খুন হচ্ছে, তার কী বল ? তুমি বলছ যারা খুন করছে তারাই ইসব চাষবাস করছে…আচ্ছা, সিদিন রেতের বেলাকে তুমি বলছিলে নাই যে তুমাদের পিত্যেকের ঘরে মাছ দি'গেছল ?'

'লক্ষ্মণদা, শুন, আমরা জেলে, পুকুরে-ডবায় শুধু মাছ ধরি তা লয়। যখন যৈবন কাল, তখন কাঁসাই লদীতে মাছ ধরতে যেতম, দশ দিন, পন্‌র দিন, বানের সময়। বোশেখ-জষ্টিএ দেখা যায় শিয়ালে লদী পার হচ্ছে, আর শাবণ-ভাদ্দরে ইকূল-উকূল দেখা যায় নাই, সেই বানের সময়…ত জাল পাততম, আর পান্‌সী লৌকা, যেমন সঁ-সাঁ পবন ছুট্‌ছে, ত ইখেনে তুমার ইল্‌সের ঝাঁক, ত উখেনে রুই-কাতলা, ইখেনে শুশুক ডুব মারিছে ত উখেনে কুমার মাথা তুলছে, সে এক পেল্লায় কাণ্ড। ত শুন, আমার মনে লেয় কি, ই তল্লাটে বান এস্‌ছে, আজ সিংবাবু ঘরে খুন হইছে ত কাল গমস্তাবাবু জঙ্গলে, আজ পুকুর লুট হচ্ছে ত কাল জমিএ চাষ পড়ছে, আবার পরশু কী হয় দেখ…'

'হঁ, তুমি যথাত্ত বলিছ…' লক্ষ্মণের স্বর কাঁপা-কাঁপা মনে হল, 'ত কারা ইসব করছে বল দিকি ?'

'উইট' আমি বুলতে লারব…' সজোরে ঘাড় নাড়ল লারাণ তার হাতের জালবোনা কাঠিটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, সেটা তুলে নিলে। তারপর যেন কী মনে পড়ে গেছে এমনিভাবে হঠাৎ ভিন্ন স্বরে বলে উঠল, 'একট' ব্যাপার তুমি দেখবে, লক্ষ্মণদা, দেখবে ?'

'কী বুলছ ?'

'এস থালে, চুপি-সাড়ে দেখে চলে যাবে কিন্তুক…'

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, চারদিক আঁধার-আঁধার। লারাণকে অনুসরণ করে

জেলেপাড়ারই আর একটা জায়গায় পৌছাল লক্ষ্মণ। একটা 'কাঁথ'-এর ঘরের দেয়ালে একটা বড কাগজ সাঁটা, তাতে লাল অক্ষরে কী সব লেখা। অন্ধকারে ভালো করে দেখবার জন্য ঝুঁকে পড়ল দুজনে। দুটো মাথা কাছাকাছি হয়ে এল।

'তুমি লিখাপড়া জান, লক্ষ্মণদা, কিছু পডতে পারলে?'

'না, তুমি পড়তে জান?'

'না, বাপের কালে উসব চায নাই। কিন্তুক বানের তোড়ে এইট'ও একট' জিনিস ভাসি' উঠ্ছে, দেখ্ছি ত সব…' চাপা স্বরে বললে লারাণ।

ত্রিশ

লারাণ সকাল-বেলায খালে-বিলে মাছ ধরে, বিকেল-বেলায় বসে বসে জাল বোনে, সন্ধ্যে বেলায় অন্ধকার দাওয়ায় বসে ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামাক টানে। ঘরে তার বউ নেই, বেটার বউ আছে, এক ছেলের মা, ওই বয়সে ঘুম-কাতুরে হয়, সন্ধ্যের পরই সেটা বিছানায় কাদা হয়ে পড়ে, জোয়ান বেটা ফেরে অনেক রাত্রে, বা, কখন ফেরে লারাণ বুঝতে পারে না।

লারাণের চোখ তুখোড় জেলের, সবার হয় না। জলের ধারে ধারে ঘুরে বেড়ায়, গর্ত দেখলে বুঝতে পারে সাপের না কাঁকড়ার, জলের ওপর ঘাই দেখে বলে দিতে পারে নিচে কোন মাছ আছে। কিন্তু এক ক্ষেত্রে যেটা সরল দক্ষতা, অন্য পরিস্থিতিতে সেটাই—মানে, লারাণ বর্তমান পরিস্থিতিতে ধূর্ত হয়ে উঠেছে। পাড়ার ভিতর দিয়ে সে চলে যায় ফিরে আসে, দরকার না থাকলেও অন্য পাড়া দিয়ে ঘুরে যায়, তার চোখ-কান সজাগ, ভিতরে ভিতরে কী হচ্ছে সে আঁচ করতে পারে। লক্ষ্মণকে সেদিন সে যে সব কথা বলেছে তাতে মনে মনে সে বেশ ফুলে উঠেছে। অথচ সেই আগেকার রাত্রে? লক্ষ্মণের কাছে সে গিয়েছিল ভয়ে ভয়ে চেলার মতো!

পাড়ার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তার সম্পর্ক দাড়িয়েছে ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি'র মতো। ওরা তাকে বিশ্বাস করে না, কেননা, সে সিংবাবুদের হেড-জেলে ছিল। 'তা ছিলম, একশ' বার ছিলম। কিন্তু কুন শালার-বেটা-শালা বুকে হাত দি' বলুক দিকি, সে লিজে সিংবাবুদের কুন্থু পুখুরে মাছ ধরে নাই, কি উয়াদের কুন্থু কাম করে নাই, বলুক কেনে…' মনে মনে বিড়বিড করে লারাণ।

তবে অবিশ্বাসও ঠিক করে না তাকে। করবে কি করে, সত্যি কথা বলব, বুক ফুলিয়ে চলব। অবিশ্বাসের কাজ সে করেছে?—বলুক কেউ। তবে তাকে চোখে চোখে রেখেছে, রাখুক, সেও রয়েছে তক্কে-তক্কে। তুমি যাও ডালে-ডালে আমি যাই পাতায়-পাতায়। 'তুমরা যদি সবাই মিলে বেউরিশ জমিএ হাত দাও, আমিও দিব। বলে, একলা ত ভ্যাক্‌লা, উয়াতে আমি লয়…' এই ঠিক করে রেখেছে।

তবে তার জেলের চোখে দেখে ভেতরের যে ব্যাপার সে বুঝেছে, সেটাই সত্যি হতে চলেছে। বাগ্‌দী পাড়ায়, সাঁওতাল পাড়ায়, মাহাতো-তুলেদের মধ্যে কম বেশি একই ব্যাপার, ঘাই মারছে মাছগুলো।

এর দিন দশেক পরে এই বিষয় নিয়েই মথুর কৌড়ি আর তার স্ত্রীর মধ্যে কথা হচ্ছিল। তা রাত প্রায় অনেকটা। মথুরের ফিরতেই দেরি হয়েছে, তাছাড়া গোচালায় গরুকে খেতে দেওয়ার ব্যাপারেও দেরি হয়েছে। তারপর খেতে বসেছে মথুর কৌড়ি। মোটা লালচে বোরো চাল উঠেছে বাজারে, মথুর বিকেলে তারই কয়েক সের কিনে এনেছিল। আলু-পেঁয়াজের লঙ্কা-চচ্চড়ি আর ফ্যানা-ভাত, গরম, ওরা বেশ স্বয়াদের সঙ্গে খায়। নিজেদের গরু আছে বলে খানিকটা দুধ পায়, প্রায় নিত্যি।

'তুমি থালে চাষা হলে শেষ পর্যন্ত…' গিরিবালা মুখ টিপে হাসল, 'হঁ গ', তুমি লাঙলের বঁটা ধরবে কেমন ধারা! কখন' দেখি নাই তাই বলছি…'

'কেনে, তুই শালী জানিস নাই আমি কেমন ধারা চাষ চষি, বঁটা ধরি?' মুখ তুলে মিটমিটে চোখে তাকাল মথুর।

'মরণ! বুড়া বয়েসের সঙ!' বলে ঝামটা দিয়ে মুখ ফেরাল গিরিবালা, মথুর ভাবল যুবতীকালে সে এমনি করে মুখ মুড়ত। সেই সেদিন ছেলের বজ্রাঘাতে মরার জমিতে তুকতাক করে আসার পর থেকে গিরিবালার ওই রকম ভাব হয়েছে।

'তোর সঙট'-রঙট' কম কিসে!' বললে মথুর।

এক গ্রাস ভাত মুখে তুলে তারপর ভিন স্বরে খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে বলতে লাগল, 'দেখ, চাষের কাম আমার বাপ-ঠাকুদ্দা করে নাই, আমিও করি নাই, ত এখন করলম, তুই বলবি কেনে, তার কী দরকার ছিল, ত দেখ কেনে, গাঁয়েই দু'ট' মাস কেমন করে কাটছিল বল দিকি, যেমন বেধবা হইচে, সামতাল বড়ম-পূজা করবেক নাই, চাষা চাষ করবেক নাই, একট' মানুষ আর একট'

মানুষের সঙ্গে দেখা হল ত মুখ ফিরায় চলে গেল, কথা কইল নাই হাসল নাই, এইট' আমি দেখতে লারব…' একটু থামল মথুর, ধীরে সুস্থে কিছুক্ষণ কেবল খেতেই লাগল, তারপর কী একটা জিনিস যেন চিন্তা করতে করতে বললে, 'ত দেখ, বাপ-ঠাকুদ্দার বিত্তি (বৃত্তি) ত আমি ছেড়ে দি' নাই, গো-মাতা হল গে আমাদের জাতের দেব্‌তা, ত সেইট' আমি ঠিক বজাই রাখব…'

বলা শেষ হল না, গোচালায় হঠাৎ শব্দ হল, দু'বার, যেন কী পড়ে গেছে। দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে উঠল। মথুর বললে, 'দেখ দিকি যেয়ে, কী হল ?'

আগেই তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়েছিল গিরিবালা, কিন্তু থমকে গেল, রাত্রে একলা ঘরের বাইরে যেতে এখনো সাহস হয় না। মথুর তাড়া দিয়ে বললে, 'যা না শালি, দেখ একটু' গিরিবালা চলে গেল।

একটু বিষণ্ণ বোধ করল মথুর, গরু ওদের মূলধন বটে, কিন্তু এখন তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাতে। চলে না এতে। রত্‌না বাগদীকে চাঙ্গা করার জন্য সে তার সঙ্গে যৌথভাবে চাষে হাত দিচ্ছে, কিন্তু মা-লক্ষ্মী দুটো তার ঘরেও উঠুক এটা কি সে চায় না ? তাছাড়া দরকার তো বটে, গরজ বড় বালাই।

'হুঁ গ', বুঁদিকে জাব্‌না দিবার সময় তুমি কি ছেড়ে রেখে এস্‌ছিলে ? ডাবাট' ভেঙে গেল, লাথ মেরেছিল বোধহয় '

'উই যাঃ, চ্‌ক্‌চ্‌ক্‌, পাড়া যাচ্ছি…'

'না গ', তুমি বসে বসে খাও, আমি বেঁধে দি'এসছি · কিন্তুক বড ডাবাট' !'

কেবল গিরিবালার নয়, মথুরেরও মনটা খারাপ হয়ে গেল।

আরো একটু পরে, গিরিবালার খাওয়া এবং শেষবেশ কাজ সারার পর. আলো নিবিয়ে ওরা দুজনে শুয়েছে। গিরিবালা বললে, 'তুমি যে সাম্‌তাল পাড়ায় ঘুরছ ··'

'ওই তোর রোগ, বড়কী, সাম্‌তাল পাড়া সাম্‌তাল পাড়া, ত আমরা রাজপুত হই কেনে, সাম্‌তালরা কি মানুষ লয়, ত উখেনে গেলম ত কী হল !'

'বললম কাকপক্ষী, কি, না কাকপক্ষী কান লি'গেল ! তেমনি হইচে তুমার…' খিকখিক করে হাসতে লাগল গিরিবালা।

'অ, আমি বলি কী, তোর ত চিরকেলে স্বভাব ··' অন্ধকারে কাঁচুমাচু স্বর মথুরের, 'কী বলছিস বল।'

'আমি বলছি কি, সাম্‌তালেরা শুদ্ধ চাষ করব চাষ করব বলে লাফ মারছে, ত উয়াদের ত ইসব ছিল নাই, তাই বলছি…' তারপর একটু চিন্তা করে আবার বললে, 'ধর, সবাই চাষ করল, উয়াদের ত নিজের জমি লয়, কেউ ভাগে ধরায়

নাই, সিংবাবুরা পালায় গেছে, সাহাবাবুরা পালায় গেছে, তাদের জমি লয় চাষ করল, কিন্তুক যখন ধর ধান পাকবেক, তখন মালিক এসে যদি বলে, কার হুকুমে তুমরা চাষ করিছ, ফসল দিব নাই, তখন ?'

এই আশঙ্কা মথুরের মনেও ছিল, চুপ করে রইল সে, বোধ হয় কথাটা ভাবছিল।

'কি গ', কথা কও নাই কেনে, বল ··

'দেখ, বড়কী, কথাট' তুই ঠিক বলেছিস, ই হইচে কী জানিস, খঁড়া ঘঁড়ায় চড়বি, ত চড়ে বসেই আছে। ই তল্লাটে কয় জনার জমি আছে, বল দিকি, সব হাভাতে হাঘরে, এক বেলা খায় এক দিন বাদ দেয়, এই ধাবাই সব। ত এখন বলছে উয়াদের, চাষ করবি, জমি লিবি, ত ছুটল সবাই, ভূ-মাটির নেশা, ত কুথা লাগে তোর হেড়ে কি পচুই, সব ত পাতার ঠঙা লিয়ে বসে যাচ্ছে, তারপর যা হবার হবেক, কেউ ভাব্‌ছে নাই···'

'অ···' গিরিবালা যোগ দিল।

'তা ঠিক নেশাও লয়, বলি শুন ' মথুর পাশ ফিরল এবং গিরিবালার গায়ের ওপর একটা পা চাপাল, 'সে অনেক বিত্তান্ত, বাপ-ঠাকুদ্দার মুখে শুনেছি নিজের চক্ষেও দেখেছি, ই চাঁদসোল, পাশে রামপুর, উ'দকে চানা, ত আগে সব যেমন বনজঙ্গল ছিল, তেমনি চাষের জমি উয়াদেরই ছিল, উই যারা লাফ মারছে বলছিস, উয়ারাই জঙ্গল কেটে জমি বানাইচে, ধরগা, আডাইকোশী চাঁদের মাঠ শুদ্দান···ত এখন মাঠ ঝাঁপাইচে, তখন যাহক কিছুমিছু হবেক, 'নমাংসা একট' হবেক কিছু, বুঝলি ?'

'হঁ···' গিরিবালা বললে, স্পষ্টত স্বামীর কোলের ভিতর তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আসছিল সে, 'হঁ, তাইত !'

'যাক গে, শালা, উসব সাতপাচ ভেবে কী হবেক আর, ভাবলেই দেখবি এক সুতা দিয়ে আর এক সুতা কাটছে, ঘুঁডি উডানা দেখিস নাই ? আমি বলি খাওদাও ফুর্তি কর, সামনে যা ঢেউ এল ত একটু নাকেমুখে লাও, কিন্তু ফুর্তি ছাড়বে নাই, মানুষের মুখের হাসি গেল ত রইল কী···লুসকি বুডি কাল সকালা আসবেক বলেছে, উয়াদের পাডায় আজ রেতে কুমেটি হবেক, বুঝলি ?'

এবারে গিরিবালা আর সাড়া দিল না, মথুর ওকে আলতো করে ঠেলা দিলেও। মথুর নিজেই হাই তুলল, একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

খুব ভোরে উঠে মথুর তার প্রাত্যহিক কাজগুলো সেরে ফেলতে লাগল,

একটু বেলা হলেই তাকে রতন দিগারের সঙ্গে যোগ দিতে হবে মাঠের কাজে, লুস্‌কি বুড়িরও আসার কথা আছে। গরুগুলোর দু'একটাকে ছেড়ে দিলে, তারা চরে খাবে, পাড়ার বাইরে তারা যায় না। দুধাল গরুগুলোকে দুয়ে ফেলল তারপর, সেগুলো নিয়ে গিয়ে মাঠের ধারে ধারে ঘেসো জায়গায় বেঁধে দিলে, এখন চাষের সময়, ছেড়ে দেবার উপায় নেই। বাছুরগুলো ছাড়ের মধ্যে বন্দী হল, কাল বিকেলে আনা ঘাস খেতে দিল। এখন ঘাসের অভাব নেই।

বেলা হল খানিকটা, চারটি মুড়ি জলখাবার খেয়েও নিয়েছে। গিরিবালা বড় দু'চার ঘরে দুধ দিতে যায়, সে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু লুস্‌কি এল না। আর অপেক্ষা করারও সময় নেই, রতনা যে রকম কাছাখোলা মানুষ, ভাববে তাকে একলা ছেড়ে দিল। বেরিয়ে পড়ল সে।

পথে লুসকির সঙ্গে নয়, তার বেটা বনার সঙ্গে দেখা হল। বনার চালচলন একটু ভারিক্কি ধরনের। দূর থেকে মথুর হেঁকে জিজ্ঞেস করলে, 'তোর মা কুথা রে, কী ঠিক হল তোদের?'

দূর থেকে কিন্তু বনা উত্তর দিল না, একেবারে কাছে এসে বললে, 'মা তুর কাছে পাঠি' দিলেক।' বনার এক হাতে ছুরি, আর এক হাতে লম্বা একটা বেত, কানে একটা ফুল গোঁজা, পরীক্ষার দৃষ্টিতে বেতটা দেখছিল সে, স্পষ্টত তার থেকে তীর বানাবে।

'তা তোরা কী ঠিক করলি বল?'

'আমরা গাঁয়ের থিকে আর কুথাও যাব নাই, গাঁয়েই থাকব, ইখেনে চাষ করব...' সাঁওতালেরা এ সময় অনেকেই অন্য দূর জায়গায় চলে যায়, মজুর খাটার জন্যে।

'ভাল ভাল, ঠিক করেছিস তোরা, খুব ভাল...' মথুর সোৎসাহে বলল।

বনা তবু দাঁড়িয়ে আছে, আর ওর দিকে না তাকিয়ে লম্বা বেতটা লক্‌লকিয়ে দেখছে।

'কী...' মথুর অনিশ্চিতভাবে বললে।

'কদাল চালালম, ত লাঙল দিলম, ত সার দিব যে সার কই, বীচের চারা কই...'

এর উত্তর মথুরের জানা ছিল না, কিন্তু আগেকার উৎসাহের সুরটা বজায় রেখে বললে, 'হঁ-হঁ, ঠিক বটেক। ত লেগে যা, যা হোক একট' হবেক...' বলে আর সে দাঁড়াল না, হাঁটতে আরম্ভ করে দিলে। পারলে এই সমস্ত

সমস্যাগুলোকে সে এড়িয়ে যায়, হাঁকডাক করে কাজ করতে দাও, মথুরের জুড়ি নেই, ভাবতে হলেই সে মুষড়ে পড়ে।

মাঠ থেকে কাঁচা কিন্তু বড় রাস্তায় উঠে খানিকটা এগিয়ে তারপর আবার জমিতে নামতে হবে। মথুর একটা বট গাছতলায় দুটো বুড়ো বুড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে, একটু কাছে এসে তবে চিনতে পারল, সিংবাবুদের মাহিন্দার লক্ষ্মণ আর বুড়িটা তার বউ।

'লক্ষ্মণ যে, সকালা কুথাকে যাচ্ছ ?' চলতে চলতেই মথুর বললে।

'মথুরবাবু, নমস্কার ' হাত দুটো জড়ো করে মাথা নোয়াল লক্ষ্মণ, তারপর ব্যাখ্যা করে বললে, 'মথুরবাবু, বয়সে তুমি আমার ছোট, কিন্তুক তুমরা হলে উচ্চ জাত ' মথুর তার পাশে এসে গিয়েছিল, চলে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি যোগ করল, 'বুড়া-বুড়ি ঝি-জামাইর কাছে যাচ্ছি · '

'তা বেশ, ভাল ভাল, কত দিন থাকবে ?'

'না গ', মথুরবাবু, বাবুদের কাম ছেড়ে দিলম, গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

যেন হঠাৎ হোঁচট খেয়ে থেমে গেল মথুর, দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছ, কেনে ?' ওদের দিকে সংশয়ী দৃষ্টিতে তাকাল।

বুড়ি মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে ঘুরে দাড়াল, লক্ষ্মণ এগিয়ে এল এবার মথুরের কাছে। বিষণ্ণ স্বরে বললে, 'কাল গিন্নীমার সঙ্গে হয়ে গেল এক চোট, ত বললম, আমি আর থাকব নাই, আমার পয়সাকড়ি মিটাগ দেন কেনে, ত বললেক কি জান, আমি ত বাপু তুমাকে রাখি নাই, আমি মাইনা দিতে যাব কেনে, ত রইল আপুনির টাকা, আমি চললম···'

'তা কাজকাম ছেড়ে দিলে কেন ?' তখনও ঠিক বুঝতে পারছিল না মথুর।

'সে অনেক বিত্তান্ত, আমার কাম ত গরুর বাগালি, ত এই তিন মাস সিংবাড়িএ জনপ্রানী নাই, একতলা-দুতলা ইঁদুর-চামচিকি সব, ত দিনের বেলায় শিয়াল ঘুরছে, ত তাই সই, সব আগ্‌লি-বাগ্‌লি রেখেছিলম। কি, না উয়ারা ফিরে এলে সব হবেক। ত গিন্নী মা এল, তা দশ বিশ দিন হবেক, ত সেই মাঠ আর গুয়াল, মাঠ আর গুয়াল, গরুগুলান লি'যাচ্ছি লি'এসছি, না আছে চাষ না আছে সারের গাড়ি, আজ বললম, দু'দিন বললম, দশ দিন বললম, মা-ঠান, চাষবাস আম্ব কর কেনে, ত বললেক, উসব আমি জানি নাই, উসব বেটার কাম। ত আপুনি চিঠি লিখেন কেনে, বললেক, তুমার মাথাব্যথা কী, বাবু, আসবেক যখন তার ইচ্ছা। মুখ টিপে বুক চেপে ছিলম, মথুরবাবু, ই তল্লাটের আবস্থা আপুনি ত জান, বাবুরা চাষ করছে নাই ত বাবুদের জমিএ

চাষ পড়ছে ঠিক, ত ইয়ার একট' মীমাংসা কর, কি কিছু কর…'

থামল লক্ষ্মণ, ওর গলাটা ভার হয়ে এসেছে, 'ওদিকে বুড়ি বোধ হয় চোখে কাপড চাপা দিল।

'শেষ কালে তুমি গাঁ ছাডলে, থালে …' মথর তার ভারী জিবটাকে নাডবার চেষ্টা করল।

'ত কালই হল শেষবেশ, বলে যতগুলা গরু ছিল সব গেল কুথা? গেল কুথা, আমি কি চুরি করেছি না। বিকী করেছি, না খেতে দিতে পেরে ছেড়ে দি'ছিলম, ত আমাকে অবিশ্বাস করল…মন্টুবাবু, ই গাঁয়ে থাকব নাই আর, কী আর করব বল, সিংবাবুর বাপের আমলের লোক আমি, সেসব আর থাকল নাই, হাঃ '

কাতরানির সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, . হুক চোখ মুছে বউকে নিয়ে চলে গেল।

একত্রিশ

কামিনীর পায়ের ঘা শুকিয়ে গেছে কিন্তু চেহারাটা হয়েছে রোডো কাকের মতো। ঘা শুকিয়েছে কিন্তু তার স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছে, ডান পা যেটা পুডেছিল, সরু হয়ে গেছে, লাঠি ধরে হাঁটতে হয়, হয়তো আরো কিছুদিন পরে লাঠি না নিয়েই তবে খুঁড়িয়ে হাঁটতে পারবে। রকমে তিন মাস ঘায়ের বিষক্রিয়ার সঙ্গে যুঝেছে ও—যদিও সে বলছে লুসকি দিদি তাকে বাঁচিয়েছে, 'উ কি কম গুণিন্'—কিন্তু যে কোনো সময় পরাস্ত হতে পারত। তার জীবনীশক্তি যেন অশ্বত্থ গাছের মতো, কেটে কেটে একেবারে নিষ্কাণ্ড করে দিলেও, শুধু শেকড থেকেই আবার পাতা গজাবে।

এত দিন ঠুঁটোর মতো বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছিল, সেই জন্যেই এখন ঘরের বাইরেই প্রায় কাটাচ্ছে ও, কাছাকাছি বুনো ফল, শাক পাতা, গুগ্‌লি যোগাড করছে, নিজের থেকে রাস্তার লোকের সঙ্গে কথা বলে তৃপ্তি পাচ্ছে। সেদিন পুকুর থেকে চারটি কলমি শাক কোঁচড়ে ভরে কোনা বেয়ে উঠছিল পাড়ে, তার মেয়ে শাম্‌লী ফিরছিল কোথা থেকে। পাড়ে ওঠার সময় মাটির দিকেই চোখ ছিল, কোথায় পা ফেলছে বিশেষভাবে লক্ষ রাখার জন্য। মানুষের পায়ের শব্দ পেয়ে না তাকিয়েই বলে উঠল, 'কে গ', কে যাচ্ছ?'

উত্তর দিল না দেখে মুখ তুলে তাকাল কামিনী, তার পাড়ে ওঠাও হয়েছিল, 'তুই ! রা কাড়িস নাই কেনে ?'

নিঃশব্দে হাসছিল শাম্‌লী, এখন জোরে হেসে উঠল। বললে, 'হ, তুমাকে দেখছিলম, তুমি বেঁচে উঠলে থালে ?'

একটু হাঁপিয়ে উঠেছিল কামিনী, শুনে যেন লজ্জিত হল, 'হঁ, যম লিলেক নাই, লুস্‌কি দিদি বাঁচায় দিলেক, যা এইগুলান লিয়ে যা' বলে কোচড় খালি করতে গেল, মানে সে আর কোথাও যাবে।

কলমী শাকগুলো নিল শাম্‌লী, ঘরেই সে যাচ্ছে, বললে, 'লুসকি দিদি, লুস্‌কি দিদি, আমি কিছু করি নাই ! আয়াপানের পাতা দি' নাই, ঘা দি' নাই ...'

'হ-হ দিবি নাই কেনে, তোরা ভাইবুন, তোদের আমি পেটে ভা... কি, তোরাই আমাকে খাআলি...'

'তবে যে তুমি বলেছিলে আমি কাজকাম করি নাই, আমাকে কেউ ... করবেক নাই।'

'সে আমার মাথার ঠিক ছিল নাই, তুই এখন রজগার করছিস, আমার লক্ষ্মী বিটী, কত পাত্তর পায়ে ধরবেক এসে !'

কথায় কথা উঠল, শাম্‌লীর মনে পড়ে গেল কিছু, বুকের ভেতরটা যেন ঢেউএর মতো আছড়ে পড়ে ডুবিয়ে দিলে, উত্তর না দিয়ে শাকগুলো নিয়ে চলে গেল সে।

আজকাল কামিনীও রান্নাবান্না করে, কিন্তু সেদিন দু'বেলাই রাঁধল শাম্‌লা, কামিনীকে যত্ন করে খাওয়াল, আজকাল মায়ের সঙ্গে কথা ... কি, বলতেও চায়। কামিনীও উৎসাহিত হয়, খাওয়ার সময় কামিনী ওদের বাবার কথা বলছিল।

সনাতন মাহাতো এ অঞ্চলের ডাকসাইটে লাঠিয়াল ছিল, সে অনেক দিন আগেকার কথা, সিংবাবুদের জোতজমিতেই কাজ করত চাষার কিন্তু সেটা ছিল বাইরের লোক দেখানো ব্যাপার, আসলে সনা মাহাতোর (সঙ্গে তার অনুগত দলও থাকত) লাঠির জোরেই সিংবাবুদের অনেক জমিজমা রক্ষা পেয়েছে, আরো বেশি জমি অর্জিত হয়েছে।

ওদের খাওয়া শেষ হয়ে গেলেও সেই সব গল্পই করছিল কামিনী। শাম্‌লী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, 'মা, বাবাকে তুমার মনে আছে ? আমার মনে আছে খুব আবছা, বাবার খুব বড় গঁপ ছিল, পাকা-পাকা, লয় ? বাবা খুব বুড়া হইছিল, লয় ?'

'ধুর, বুড়া হবেক কেনে, তবে বয়েস হইছিল, আমার সঙ্গে উয়ার বয়েসের ফাঁক ছিল, উ-ই বলত চারগণ্ডা দু'বছর, যখন আমি তোদের ঘর করতে এলম, তখনই তোর বাপের গঁপ ছিল, সে কী দেহ, দেখলেই ডর লাগত · '

'আচ্ছা, মা, বাবা মরল কী করে, তুমি দেখেছ তখন ?'

হ্যাঁ, দেখেছে কামিনী, রেল লাইনের ধারে মুখ গুঁজে পড়েছিল, কিন্তু রেলগাড়িতে চাপা পড়ে নয়, কেউ বলে সাপকাটিতে মরেছে, কেউ বলে বিষ দিয়ে মেরেছে। গিয়েছিল কামিনী, পচাই তখন আট মাসের পেটে, পচাই বাপকে দেখেনি। বলতে বলতে খানিকটা কাঁদল কামিনী।

'চুপ কর ত মা, কান্‌ছ কেনে · ' হঠাৎ যেন আর এক মেজাজ শাম্‌লীর।

থতমত খেয়ে চুপ করল কামিনী, কিছু বলতে পারল না, ওর দিকে কুতকুত করে তাকিয়ে রইল। শাম্‌লী চুপ করে রইল কিছুক্ষণ কিন্তু মায়ের দিকে একই রকম তাকিয়ে, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে। ও জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি সিংবাড়িএ কত দিন কাজ-কাম আরম্ভ করেছ, মনে আছে তুমার ?'

'তা থাকবেক নাই, পচা তখন জম্মায় নাই তারও দু-তিন বছর আগে ঠিক, কেনে বলত ?' এবার কামিনীও যেন সংশয়ী হয়ে উঠেছে।

'না, কিছু লয় ' ফিক করে হেসে ফেলল শাম্‌লা। মুহূর্তে মেঘ কেটে গেল যেন, দুজনের মন থেকেই।

'কাজকাম কি লিতে চাইছিলম আমি, না ঘরের বার হইচি, তোর বাপই বললেক, খুম দুঃখ-কষ্ট হইছিল বে · '

শাম্‌লা ফুঁ দিয়ে লম্পটা নিবিয়ে দিলে, 'মা, শুয়ে পড় দিকি. শুয়ে শুয়ে গল্প কর ··

কামিনীর সম্বন্ধে শাম্‌লার মনোভাব হয়েছে, অসুখ থেকে ওঠার পর, সে-ই যেন মা, আর কামিনী ছোট মেয়ে, অবুঝ, তার ওপর বিরক্ত হয়, ঝামটা দেয়, আবার যত্নও করে। পচাইয়ের সঙ্গেও তার সম্পর্কটা বদলে যেতে লাগল।

৩

একদিন ঠিক দুপুরবেলা একটা বাঁড আর কয়েকটা তীর নিয়ে ঘরে এল পচাই। তখন শাম্‌লী দাওয়ায় বসে, ধাপিতে পা দিয়ে। সামনে কয়েক হাত দূরে বেলগাছটার দিকে তাকিয়ে ছিল ও, এ সময় বেল থাকার কথা নয়, কিন্তু এ গাছটায় বেশ কয়েকটা তখনও থেকে গেছে। ওর মুখে হাসি—চারদিকে বর্ষার সবুজ লতা-আগাছা-ঘাস, পরিষ্কার আকাশের রোদ সেগুলোয় পড়ে ওর মুখের ওপর ছিটকে পড়েছে যেন, ওর কালো, উজ্জ্বল চোখ দুটো কোঁচকানো।

পচাই ওর পাশ কাটিয়ে সোজা দাওয়ায় লাফিয়ে উঠল, তীর-কাঁড় একটা কোণে রেখে অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। ঘরের মধ্যে ঢুকল, সন্ধানী দৃষ্টিতে কিছু দেখল, যেন নিজের মনেই কুণ্ঠিত স্বরে বললে, 'ভাতটাত কিছু আছে…'

প্রথম থেকেই শাম্‌লী সকৌতুক দৃষ্টিতে ওকে অনুসরণ করছিল, পচাইয়ের বিমূঢ় ভাব দেখে হাসল, বললে, 'আছে, দিচ্ছি দাঁড়া, লেয়ে আস্‌বি নাই?'

কিছু না বলে পচাই তখন মেঝের ওপর বসে পড়েছে।

খেতে দিয়ে শাম্‌লী সামনে বসে রইল, অন্য কোনো সময়ের মতো উঠে গেল না। প্রথমটা অস্বস্তি লাগছিল পচাইয়ের, তারপর মুখ নিচু করে খেয়ে যেতে লাগল। শাম্‌লী বললে, 'পচাই, আমাকে তুই দিদি বলিস না কেনে রে?'

ভাত মুখে চকিতে চোখ তুলে তাকাল পচাই, অবিশ্বাসী বিরুদ্ধ দৃষ্টিতে, কিন্তু দেখল যে শাম্‌লীর চোখে হাসি বিছিয়ে রয়েছে। কিছু বলল না কিন্তু মুখের গ্রাসটা গিলে সেও হাসল।

খাওয়া শেষ হলে এক ছুটে পুকুর থেকে মুখ হাত ধুয়ে এল পচাই, এসেই ওদের ভাঙা শিলটা পেতে তাতে তীরগুলো শানাতে বসল।

'পচাই, তুই তীরগুলান পেলি কুথা?'

'এই পেলম ' প্রথমটা এড়িয়ে যেতে চাইলেও পরক্ষণেই বললে, 'সাম্‌তাল পাড়ায়, আবার কুথা!' কিছুক্ষণ ফলাগুলোর এপিঠ-ওপিঠ ঘষে বলে উঠল, 'জানিস, আমার হাতের টোক কী রকম হইচে, সাম্‌তালরাও পারবেক নাই, দাঁড়া, দেখাব তোকে ·'

'কী হবে তোর ইসব করে?'

'কেনে, তুই জানিস নাই, ই চাঁদসোল গাঁয়ে কী হয় দেখিস, শত্তুর সঙ্গে লড়াই হবেক, ত শালাঃ দিব চোখ ছ্যাঁদা করে, বুক ঝাঁঝরি করে দিব, ই ·'

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল পচাই, কিন্তু হঠাৎ থতমত খেয়ে থেমে গেল।

'পচাই!' শাম্‌লীর কণ্ঠস্বর গাঢ় শোনাল, 'তুই মহনের সঙ্গে মিলামিশা করিস?'

'হঁ হঁ, করি, ত কী হইচে আমি মহনের সঙ্গে মিশি, সাম্‌তাল পাড়ায় যাই, তুই যাস নাই সিদিন সাম্‌তালদের শিকারে, তুলির মায়ের সঙ্গে তুই হেদাহেদি করিস নাই ··' বলে আর একটা তীরে সজোরে শান দিতে লাগল।

'তাই বলছি, তুই গঁসা করছিস কেনে, আমি কি তোকে মানা করছি?'

'তবে, তবে তুই কি বললি?' হাতের কাজ থেমে গেছে, চোখ কুঁচ্‌কে

তাকাল পচাই, পরক্ষণেই সব কিছু ঝেড়ে ফেলার মতো করে বললে, 'ধ্যুত্তোরি, উসব ছাড়...'

আর একটু শানটান দেওয়ার পর উঠোনে লাফ দিয়ে নামল ও, 'তোকে আমার টোক দেখাই, দেখবি?'

'কী দেখাবি দেখা, দেখি তুই কী শিখেছিস?'

'আচ্ছা, বল, বেলগাছের টঙে, উই যে বেলগুলান ঝুলছে নাই, ত উয়ার কুনট' গাঁথব বল...'

একটু আগেই সেদিকে তাকিয়েছিস শাম্‌লী, বেলগুলো তার চেনা, বললে, উই টঙের নিচয় ডান দিকেরট', গাঁথ...'

'কুনট', বুঝতে লারছি'...

'উই টঙে দেখ একট', তার নিচয় দুট', হঁ? তার ডান দিকটা গাঁথ...'

বেশ খানিকটা কায়দা করে তীর ছুঁড়ল পচাই, পারল না, পরের বার ডান দিকেরটা না গেঁথে বাঁ দিকের বেলটার গা ছুঁয়ে পড়ে গেল, তৃতীয় বারেরটাই গাঁথতে পারল সে। প্রতিবার হারছে, আর চোখ দুটো কুতকুতে হয়ে উঠছে। তৃতীয়বার সফল হলেও তাই সে গর্ব করতে পারল না, কেবল বললে, 'এগ্‌বারে সব হয় নাই, দিদি, তুই বল, প্যাকটিস করতে হয়...' এই প্রথম দিদি বলল পচাই।

'হঁ, তোর কথা ঠিক বটেক...' শাম্‌লী হাসতে হাসতে বললে।

পচাই ছোঁড়া তীরগুলো সংগ্রহ করল, দুটো বেলগাছের ওদিকে জমিটায় পড়েছিল, বাকিটা কাঠবিড়ালীর মতো বেলগাছটায় তরতর করে উঠে পেড়ে নিয়ে এল। নতুন একটা কথা মাথায় এসেছে এমনিভাবে শাম্‌লীকে বললে, ডান দিকে ঘাড়টা একটু কাত করে, 'তুই শিখবি, দিদি? বল থালে শিখাই...'

উৎসাহিত হয়ে উঠল শাম্‌লী, 'আমি কি পারব? আচ্ছা, দেখা...' বলেই ও খিলখিল করে হেসে উঠল।

পচাই কী রকম নিভে গেল, হাসির মানে বুঝল না। তবু বললে, 'এই ত কাঁড়, ঠিক মদ্দিখানে বাঁ হাত দিয়ে ধরবি, ধর, এই তীরট' লে, বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে, তীরের গডাট' চিপে ধর, দাঁড়া...'

ছুটে গিয়ে পচাই বেলগাছের গোড়ায় উঠে-পড়া একটা গাঁঠের উপর আঙুল ছুঁইয়েই তুলে নিল, চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'চোখ বরাবর তীর ফাল আর গাঁঠট' রাখ, হাসিস নাই, লড়ে যাবেক, জোরে টান...'

শাম্‌লী ছুঁড়েই হেসে গড়িয়ে পড়ল, তীর লক্ষভ্রষ্ট। বিরক্ত হল পচাই, তাছাড়া শাম্‌লী কেন যে এত হাসছে তা বুঝতে পারল না। যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে আরো দু'বার চেষ্টা করাল ওকে, শেষে নিষ্প্রভ স্বরে মন্তব্য করল, 'তুই মস্করা করছিস. শিখছিস নাই, শিখে রাখলে ভাল করাতিস!'

এর পর শাম্‌লী গম্ভীর হল, বললে, 'তীরকাঁড আমার হবেক নাই, পচাই, তবে তুই যদি আমার টোক দেখতে চাস ত আমি ঢিল মারি' দিব...'

'সেইট' কী বলছিস ?'

এখানে-ওখানে পড়ে থাকা কয়েকটা ঢেলা কুড়িয়ে নিলে শাম্‌লী। তারপর একটা নিয়ে টিপ করে ছুঁড়ল, লাগল গিয়ে বেলগাছের গোড়ার সেই গাঠে। পচাই বিস্মিত হল, খুশিও হল, 'তোর টোক আছে ঢিলে, আচ্ছা, লাগা দিকি আর একট', উই টঙের বেলট' মার দিকি...'

শাম্‌লী ছুঁড়ল, পারল না। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'না-না, বারবার তিন বার, তুই তিন বারে পেরেছিলি...' কিন্তু তিনবার নয়, দ্বিতীয় বার ছুঁড়েই পারল শাম্‌লী।

এরপর বিকেলের প্রায় শেষ পর্যন্ত দুই ভাই বোন তীর আর ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে কাটাল, দুজনে হাসল খুব, অনেক দিনের পর ওরা এম্‌নি এক সঙ্গে হতে পারল। এক সময় শাম্‌লী বললে, 'পচাই, তুই লাঠি ধর, অস্তাদ হয়ে যাবি. জানিস, বাবা খুম বড় লেঠেল ছিল!'

'লাঠি, উঁহুঁ, উ আমার হবেক নাই, আমার যা করে তীরকাঁড, ত ছরা-খেলা শিক্ষার ইচ্ছা আছে, খুঁ-উম।'

বত্রিশ

অন্য দিন সন্ধ্যে বেলা ঘরের মধ্যে রাঁধছে শাম্‌লী, কামিনী একটু দূরে বসে এটা-ওটা বলছে। পচাই ফিরে এল। মা-মেয়ে দুজনেই অবাক, শাম্‌লী বললে, 'এত জল্‌দি জল্‌দি ঘরকে এলি যে!'

পচাই ঘরের মধ্যে ঢুকে অনিশ্চিতভাবে দাঁড়াল একবার, কেরাসিনের আলোয় ওর মুখখানা খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে, বাচ্চা হলেও ওর দেহের গঠন বেশ সুডোল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটু পরে বাইরে বেরিয়ে দাওয়ায় গেল, মনে হল নেমে আবার চলে যাবে। কিন্তু হঠাৎ বললে, 'দিদি, শুন...'

'হাত জোড়া আমার, বল না · ' বলতে আরম্ভ করেও থমকে গেল শাম্‌লী, পচাইয়ের ভাবসাব দেখে উৎসুক না হয়ে পারল না, 'মা, তুমি একটু দেখ ত…' ঘটির জলে হাত ধুয়ে উঠে গেল ও।

যদিও কামিনী এখন চলাফেরা করতে পারে, তবু অনেক্ষণ বসে থাকার পর আবার নড়াচড়া করতে অসুবিধে হয়। গলার স্বরও খ্যানখেনে হয়ে উঠেছে, 'তোদের আবার আড়ালে কী কথা, বাবু, এই দেখি সাপে-লেউলে, এই দেখি গলায়-গলায়· ·

'কী, বল…' শাম্‌লী বেরিয়ে এসে বললে।

না, ওখানে বলল না পচাই। শাম্‌লীকে নিয়ে একেবারে পুকুরপাড় পর্যন্ত চলে এল সে। শাম্‌লীর হালকা ঔৎসুক্য এখন উদ্বেগে পরিণত হতে চলেছে, দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'কী বলছিস ·'

চারদিকে অন্ধকার, বৃষ্টির পর ব্যাঙ ডাকছে পুকুরের কোলে, ঝোপে-ঝাড়ে গাছের ডালে এখানে-ওখানে জোনাকি জ্বলছে। পচাই চাপা স্বরে বললে, 'মহন তোকে কাল সকালা তাদের জমিএ যেতে বলেছে…'

নামটাতেই বুকের ভেতর ধক করে উঠল শাম্‌লীর, 'আমাকে…কেনে · '

ভেতবে ভেতরে একটা চাপা চিন্তার মতো ছিল ওর, সেই সেদিনের পর থেকে মোহনের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে কিন্তু সে কোনো কথা বলেনি, এমন কি চিনতেও পারত না যেন। আজ পচাইয়ের কথা শুনে ওর রক্তস্রোত দ্রুততর হয়ে উঠল যেন, 'উয়াদের জমিএ যেতে বলেছে, কেনে বলেছে কিছু?'

'কালকে রুয়া হবেক উয়াদের জমিএ, তোকে সুদ্ধ কাজ করতে হবেক।'

'আচ্ছা, যাব, তোকে বলে নাই?'

'আমি ত উয়ার সঙ্গেই ছিলম, বিকালা বাঁচের গোছ বইলম, মহনও বইল। আমাদের দুজনে হবেক নাই, তুই, আরো দুজন লাগবেক…কিন্তু তুই যে যাব বললি, যাবি?'

এতক্ষণে শাম্‌লী বুঝতে পারল, পচাইয়ের মনে অন্য কিছু রয়েছে। কী ভাবছে ও, মোহন কি ওকে আর কিছু বলেছে, পচাইয়ের কী রকম অবিশ্বাস আব আশ্চর্যের মতো ভাবটা। একটু সতর্ক হয়ে শাম্‌লী বলল, 'যাব ত, তুই যাবি নাই?'

নিজের কথা বলল না পচাই, শাম্‌লীর সম্বন্ধে বললে, 'তুই ত কখন' জমিএ কাম করিস নাই, সাম্‌তালদের মতন? আর মুনিষ খাটতে তোকে ডাকে নাই মহন!'

'উন্নাতে আর কী! শুনি ই গাঁ সে গাঁ মিলে সব লোক সব জমি চাষ করবেক, আবাদ ফেলে রাখবেক নাই, তুই শুনিস নাই? মহনের সঙ্গে তোর এত ভাব…'

পচাইয়ের সেটা না জানার কথা নয়, কিন্তু তার ধার দিয়ে গেল না, বললে, 'দিদি, তোকে একট' কথা শুধাব, সত্যি বলবি?'

'বল না, কী বলবি…' শাম্‌লীর গলাটা একটু কাঁপা যেন।

'মহনের সঙ্গে তুই কথা কস? তোর চিনাশুনা' আছে?'

শাম্‌লী প্রথমেই ভেবে নিলে, ভাইকে সে মিথ্যা বলবে না। বললে, 'মহনের সঙ্গে চিনাশুনা আছে ত, উ'াতে দোষ কী?'

'না, তাই বলছি · ' বলে একেবারে চুপ করে গেল পচাই। একটু পরে বললে, 'আচ্ছা, তুই যা, আমি একটুন ঘুরে এসি…'

শাম্‌লী বুঝল—আর সেটা তাকে কষ্টও দিল। পচাই ছোট, মোহনের কথায় কিছু হয়তো ও বুঝেছে, সবটা বুঝতেও পারেনি, তাকে আড়ালে দূরে ডেকে এনেছে, তার সংশয়-অবিশ্বাসের কোনো সমাধানও পায়নি, অথচ শাম্‌লীকে কিছু বলতেও পারছে না। অভিমান করে চলে যাচ্ছে।

'পচাই, শুন · ' শাম্‌লী ওকে ডাকল।

পুকুরের ও কোণাটা থেকে আস্তে আস্তে ফিরে এল পচাই, 'কী…'

'তোকে একট' কথা বলব?'

পচাই উত্তর দিল না, নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে ও, শাম্‌লী কিন্তু তা একেবারেই চায় না। পচাই এই ক'দিনে তার বন্ধু হয়ে উঠেছে।

'তোকে একট' কথা বলছি, দিব্যি কর কাকেও বলবি নাই, মাকেও বলবি নাই, বল…'

পচাইয়ের মাথাটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে কথাটা বলল শাম্‌লী।

'মাইরি? সত্যি!…' পচাই উচ্চস্বরে বলে উঠল। প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কাটা কেটে যাবার পরই খুশিতে লাফিয়ে উঠল সে। নাচের মতো করে দু'পাক ঘুরে নিল সে, মুখে বলতে লাগ্‌ল, 'ড্যাম্‌কুড়াকুড, ড্যাম্‌কুড়াকুড কুড…' বলতে বলতে পুকুরের সেই কোণাটা দিয়েই ছুটে চলে গেল।

কতক্ষণ সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল শাম্‌লী। জোনাকি জ্বলছে এখানে-ওখানে, একটা উড়ে এসে তার গায়ে পড়ল। পচাই তার বন্ধু। মোহন তাহলে সেদিনের কথা ভোলেনি, তাকে ডেকে পাঠিয়েছে!

তেত্রিশ

ওমা, কোথায় কী। এখন থেকে শাম্‌লী মাঠের কাজে দিনের পর দিন কাটাতে লাগল, দুপুরের কিছু সময় বাদ দিয়ে সকাল থেকে দিনের একেবারে শেষ পর্যন্ত, কিন্তু মোহনের কাছ থেকে সাড়া পেল না।

মোহন কি তার সঙ্গে কথা বলে না? বলে, কিন্তু আর পাঁচজনের সঙ্গে যেমন তার বেশি কিছু নয়। কী করতে হবে, সে সম্বন্ধে অন্যদের নির্দেশ দেয়, শাম্‌লীকেও। বরঞ্চ শাম্‌লীকে যেন এড়িয়ে চলতে চায় মোহন, শাম্‌লী কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে গণেশদা নয়তো বঁচার মামীকে শুধাতে বলে। মোহন কী ভাবছে—ভাবছেই কি কিছু?

আস্তে আস্তে শাম্‌লীর ভেতর আবার আগেকার সন্দেহ, সংশয় জাগতে আরম্ভ করেছে। তবে আগে যেটা ছিল কৌতূহল, এখন সেটা বেদনাদায়ক জিজ্ঞাসা। আগে মোহনকে খোঁচাতে পারলে শাম্‌লী খুশি হত, এখন ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকে পাছে মোহন কিছু বলে ফেলে, তার কাজের খুঁত ধরে।

মোহন কে তা সে জানে না। সেদিন জঙ্গলের ভেতর সেই গুহার মতো জায়গাটায় যা সে দেখেছে বা শুনেছে তাতে মনে হয় তার আগের সন্দেহই ঠিক। তার বন্ধু বলাই, তাকে শাম্‌লী এক-আধদিন দেখেছে গাজন দুলের ঘরের দিক থেকে বেরোতে, কিন্তু মাঠে কোনোদিন দেখেনি, তাছাড়া, মোহন ডাকার আগে শাম্‌লী মাঠেই যেত না, কী রকম সংকোচ বোধ হত। বলাইকে দেখলে ভদ্দলোকের ছেলে বলেই মনে হয়, কিন্তু মোহনকে ঠিক ধরা যায় না। আগে শাম্‌লী তার কাজে যতটুকু খুঁত ধরতে পারত, এখন তাও পারে না।

অন্তত তিনটে দিন মোহনের সঙ্গে কাজ করেছে শাম্‌লী, তারপর মাঝখানে একটু ফাঁক দিয়ে তারই নির্দেশে মাঠের অন্য দিকে অন্যদের সঙ্গে চলে গেছে।

গাজন দুলের নিজের জমি বিঘে চারেক, সেই জমিতেই প্রথম দিন কাজ করতে গেল শাম্‌লী। মোহন, পচাই, গণেশ আর বঁচার মামী ছিল। শাম্‌লী যখন গিয়ে পৌছাল, তখন পচাই আর মোহন আঁটি-বাঁধা ধানের চারার বোঝা এনে ফেলল জমির ধারে। জমিতে বর্ষার জল জমে আছে, হাঁটলে পায়ের পাতা ডুববে। জলের ওপর প্রায়ই মাটির বড় বড় ঢেলা মাথা তুলে আছে,

গত কাল লাঙল চালানোর পরেও। মোহন কাজ ভাগাভাগি করে দিলে। শাম্‌লীকে বঁচার মামীর সঙ্গে জমিতে ধানের চারা রুইতে বলল।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে শাম্‌লী দেখলে, পচাইকে নিয়ে মোহন পাশের জমিটায় মই দিচ্ছে, এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো সমান করার জন্য। কাদাও ভালো মতো তৈরি হবে তাতে। একটা ছোট মইয়ের মাঝামাঝি গরুর দড়ি আর বাঁশের একটা খণ্ড বেঁধে দেওয়া হয়েছে দুই বলদের কাঁধে জোতা জোয়ালের সঙ্গে। মইয়ের ওপর মাঝামাঝি দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে মোহন, কোলের কাছে পচাই। তারপর বলদ দুটো মইসুদ্ধ ওদের দুজনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

হেই-ট্‌ট্‌—কাজের থেকে মজা বেশি পচাইয়ের, মুখে অস্ফুট শব্দ করছে আর হেসেই চলেছে, টাল সামলাচ্ছে সামনের দড়ি, পিছনে মোহন, দুপাশে দুটো বলদ, এটা-ওটা ছুঁয়ে। কিন্তু মোহন গম্ভীর, বাঁ-দিকের বলদটার লেজ মোচ্‌ড়াচ্ছে অল্পই, ডান হাতে বাতার তৈরি লাঙল-বাড়ি, কিন্তু চালাবার দরকার হচ্ছে না। বেশ টাল রাখতে পারছে তো, কোনো খুঁত নেই, কিন্তু ডান হাতে বাড়িটা এমনভাবে তুলে রয়েছে—হাসি পায় শাম্‌লীর।

দ্বিতীয় দিন প্রচণ্ড বৃষ্টি, প্রথম থেকেই শুরু হল, থামল না দু' পহরের আগে। অবিরল ধারার জন্য দেখা যায় না, চুল-কপাল বেয়ে জলের ধারা চোখের পাতার ওপর পড়ে আর বন্ধ করে দেয়। মোহন কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আল বাঁধছে। বাঁধতে বাঁধতে কাছাকাছি এলে ভালো করে দেখা যায়—বেশ জোরালো কোপে কাদার চাঙড় উঠছে বড় বড়। চাঙড় তুলে আলের ওপর উল্টে ফেলার সময় মোহনের বলিষ্ঠ পিঠের আর বাহুমূলের সক্রিয়তা দেখা যায়। মাঝে মাঝে শাম্‌লী চোখের ওপর থেকে জলের ফোঁটাগুলো মুছে ফেলছে।

তৃতীয় দিনেও শাম্‌লীর রোয়ার কাজ, কিন্তু কাজ বেশি বাকি ছিল না। কিছুক্ষণ কাজ করার পর পচাই আর গণেশকে নিয়ে মোহন কোথায় চলে গেল। শাম্‌লী আর বঁচার মামী শেষ করল বাকি কাজটুকু। বেলা তখনও দশটা পেরোয়নি। জমি থেকে পাড়ের ওপর উঠে ওরা অনিশ্চিতের মতো বসল কিছুক্ষণ। বঁচার মামী একটা বিড়ি ধরাল, শাম্‌লীকে দিতে চাইল, সে নিলে না।

গতকালের মতো আজ একেবারে বৃষ্টি নেই। উজ্জ্বল গনগনে রোদ চারদিকে, সকাল বেলায় যদিও একটু ঠাণ্ডা ছিল, এখন ভাপ উঠছে গরমে। ঘাম দিচ্ছে দরদর করে। হাতের পাশেই জাম গাছের একটা ডাল মট্‌কে মুখের সামনে নাড়তে লাগল শাম্‌লী।

মাঠের মধ্যে বেশ লোকজন। এ সময়টা লোকজন থাকেই, শাম্‌লীর মনে হল

এ বছর লোক আরো বেশি। কিছুক্ষণ পরেই বঁচার মামী উঠে পড়ল, তাকে দোকানে যেতে হবে, কী কিনবে যেন। শাম্‌লীও উঠল, মাঠের মধ্যে সবাই যখন কাজ করছে তখন অসময়ে ঘরে ফিরে যেতে ওর কেমন যেন লাগল।

এরপর তিন দিন ওর ডাব পড়ল না মাঠে কাজের জন্য। এই তিন দিনের কাজ করাটা ওর পক্ষে ঘায়ের চামড়া উঠিয়ে দেবার মত হল, যন্ত্রণায় দগদগ করছে। আগে বরঞ্চ চাপা ছিল, ভালোই ছিল। মাঝখানে যে সে খুশী হয়ে উঠেছিল, মাঠে কাজে যাওয়ার সময় কিছু আশাও করেছিল, সেটাই এখন অপমানের মতো লাগল ওর, আর একটা অদ্ভুত আক্রোশে ফোঁসফোঁস করতে লাগল।

তিন দিনেব দিন বিকেলে পচাই ওকে বললে, 'তুই কালকে কাজে যাবি, দিদি, মহন বলেছে···হুই চাঁদসোলী মাঠের তেগাছা, তেগাছা জানিস ত, খেজুরগাছ, আশুত গাছ, বট গাছ, তার দখিন সাইটে, বুঝলি ?'

হ্যাঁ, জানে শাম্‌লী, ও-সব তার নখদর্পণে, কিন্তু বললে, 'না, যাব নাই।'

পচাই একটু আশ্চর্য হল, 'দিদি, মহন বলেছে ·'

'না, যাব নাই, তোর মহন কি আমার মাথা কাটবেক ?'

কিন্তু পচাই না কি তখন অন্য জগতে ছিল, মুখ মুড়কে বললে, 'মহন বললেক ত আমি বললম, তুই গেলি না গেলি ত আমার কি ?' বলে ঠরঠর করে চলে গেল সে।

কিছুক্ষণ পরে শাম্‌লীও বেরিয়ে পড়ল। এই তিন দিন এক রকম ঘরেই কাটিয়েছে সে। কামিনীই বরঞ্চ ছাড়া পেয়ে এখানে-ওখানে গিয়েছে, খাবার জিনিস সংগ্রহ করেছে। রান্নার কাজটা করেছে শাম্‌লীই। কামিনার বকবক কবা রোগটা অনেক বেড়ে গিয়েছে, রাজ্যের সব খবর শুনে কানের কাছে ভনভন করছে, শাম্‌লী বিরক্ত হলে একটু থেমে গিয়ে নিজের মনেই বিড়বিড় করতে থাকে।

অনেক দিন ধান কলে কাজ করতে যায়নি শাম্‌লী, খবরও নেয়নি। পচাই চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবল, ভুলির মার কাছে গিয়ে খবর নেবে কাজ আছে কিনা। বেরিয়েছে এমন সময় কামিনী বললে—ওর এখন সব দিকে নজর— 'অবেলায় যাচ্ছিস কুথা রে ?'

'যাচ্ছি মড়াচিরে, পিছ্‌ কাটলে ত ?'

'না, এই বলছিলম ··' থতমত খেয়ে গেল কামিনী। লাঠিটা ফেলে বারান্দায় বসে পড়ল সে।

ডুলির মার ঘর পর্যন্ত যেতে হল না, পাড়ার বাইরেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

'কি গ', লাত্‌নী, চাঁদমুখে হাসি নাই কেনে, তুমাদের উখেনে যাচ্ছিলম...'

'আমি যে তুমার ঘরকে যাচ্ছি।'

'অ মা, সত্যি না কি।'

ডরে মরি অন্ধকারে কম্‌নে যাই কাছে।
বাঁশ বনে মুখপড়া এ্যাম্‌নে দাঁড়ি' আছে॥

'ই বেশ হল ভাল, খি-খি··' শাম্‌লীকে ধবে হাসতে হাসতে গা দোলাতে লাগল ডুলির মা।

শাম্‌লী হাস্‌ল না, বিরক্ত হল না। ডুলির মার গড়নটা বেশ মোটাসোটা, স্নান-খাওয়া সেরে মুখে পান গুঁজে এসেছে। বরঞ্চ ওর বেশ তৃপ্ত ভাবটা শাম্‌লীর কাছে যেন খোঁচাব মতো লাগে। ওকে একটু ছাডতেই বললে. 'ঠাকুমা, তুমি কেনে যাচ্ছিলে আমাদেব ঘরকে?'

'অসের লেগে গ', অস, খি-খি...'

ডুলির মার কথাই অমনি, শাম্‌লী অপেক্ষা করে রইল।

'বঁচার মামীর কাছে শুনলম সব, তুমরা সব মাঠকে মাঠ যঞ্জি লাগায দিছ, বলে সবাই তুমরা চাষের কাম লাগাইছ, ত ভাবলম একটুন চেখে দেখি তুমাদেব অস কেমন ধারা...' শাম্‌লীর থুতনি নেড়ে সেই হাতটা মুখে ঠেকিয়ে চ্‌ক্‌ কবে শব্দ করল ডুলির মা, 'তুমাদের সঙ্গে আমাকে লিবে না কি, লাতনী?'

শাম্‌লী এতক্ষণে হাসল একটু। ভাবল, সে যাচ্ছিল ডুলিব মাব কাছে, আব ডুলির মা-ই কিনা তারই কাছে আসছে কাজেব জন্য! বললে, 'ঠাকুমা, তুমাব ধানকলের কাম কী হল, পোষাল নাই?'

'অস শুকায় গেছে, লাত্‌নী, অস শুকায় গেছে, বুড়া লাগবেব মুখে হাসি নাই!'

ডুলির মা যে খবরটা দিল তা হচ্ছে ধানকল চালু থেকেও নেই। অন্যান্য বছর এই সময়টা কলের কাজ কম হয়, চাষবাসের জন্যে। এখন.অভয় সরকার তাব সিকি ভাগও কাজ করায় না, সব দিন মিল চলে না। শেষকালে যোগ করলে, 'তুমাকে বলি নাই, লাত্‌নী, সেই যে ভিন্‌ গাঁয়ে যাবাব কালে বলছিলম, ভদ্দনোকের ডর্‌ ঢুকায় গেছে, তুমরা সব মাঠভর এক জোট হয়ে কাম করছ ত উয়ারা বাঁশপাতার মতন কাঁপ্‌ছে, উয়াদের চোখের পানে দেখলেই সব বুঝি, আমাকে কী লুকাবেক, হুঁ..'

এই অবস্থায় শাম্‌লী কেন এগোচ্ছিল তা বলল না, তুলির মাও জিজ্ঞাসা করেনি। অগত্যা ঠিক হল যে, পরের দিন সকালে চাঁদসোলী মাঠে তেগাছার কাছে তুলির মা কাজ করতে যাবে শাম্‌লীর সঙ্গে। মোহনের আহ্বান তাকে স্বীকার করে নিতেই হল।

মাঠে আসতে একটু দেরিই হল ওদের। মাঠের চেহারাটা আজ অন্য রকম। কাজ আরম্ভ তো হয়ে গেছেই, লোকের সংখ্যাও অনেক বেশি। আড়াইক্রোশী মাঠের শেষ পর্যন্ত চোখে সবটা বোঝা সম্ভব নয়, মানুষজন এদিকে-ওদিকে অনেক আসছে, কাজ ঐ একটাই, ধানের চারা বয়ে আনা আর রুয়ে ফেলা। এখন শ্রাবণের মাঝামাঝি, মাস শেষ হবার আগেই রোয়ার কাজ সব শেষ করতে হবে, নইলে ফসল ভালো হবে না।

চোখ কুঁচকে একটু দেখে নিয়ে তুলির মা বললে, 'ই যে তুমার মা গঙ্গার সাগর মেলা বসি' দিছে গ', অস জমবে ভাল।' গাজন তুলের জমির পাশ দিয়ে মাঠে নামবার মুখে আবার যোগ করল, 'তুমরা না কি ই জমি রুয়েছ, বঁচার মামী বলছিল।'

শাম্‌লী কোনো উত্তর করল না, ওর চোখ এদিকে-ওদিকে, মোহনকে দেখতে পাবে মনে করেছিল। কথা শুনে জমিটার ওপর স্থির হল শাম্‌লীর দৃষ্টি, এই দিন চারেকের মধ্যেই ফিকে সবুজ চারাগুলো মাটির থেকে রস টেনে খাড়া দাঁড়িয়েছে।

'তুলের পো গত হইচে, কিন্তু উয়ার শালীর পো লয় মানুষট' হইচে? লোক সব বলাবলি করে, তুমাদিকে সব জোটপাট করে কাজে লাগি' দিছে!'

চকিতে পাশ কেটে শাম্‌লী তাকায় তুলির মার দিকে, না, তার কথার মধ্যে কোনো ইঙ্গিত নেই। সংক্ষেপে বললে, 'হুঁ...'

'ছুঁড়াট' উড়ে এসে জুড়ে বসল যে গ'...' বলতে বলতে অন্য বিষয়ে ওর মন আকৃষ্ট হল, 'ই যে পারছে জমিএ লেমে পড়ছে। গিরস্ত ঘুমের ঘোরে শুনে ঠক্‌ঠক, হাঁকে, কে কার ঝাড়ে বাঁশ কাটে, তারপর ঘুরে শুএ...খি-খি, লাত্‌নী, ই যে হল তেমনিধারা, খি-খি...'

তেগাছায় পৌছবার একটু আগে দাঁড়িয়ে পড়ল তুলির মা, 'অ মথুরদাদা, তুমার হাতে কদাল দেখি, ই কী রকম?'

'হুঁ, তাই দেখ কেনে...' বেশ বড়সড় কোদালটা সজোরে একটা বেনাঝোপের গোড়ায় বসাল মথুর, ওর পিঠের পেশীগুলো ফুলে উঠল ঝুঁকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে,

আর একটা কোপেই ঝোপটাকে উঠিয়ে ফেললে, 'শালাঃ, বেনা, ধানের শত্তুর, দিলম নিম্মূল করে, দেখলে ত ?'

'পারবে ত, মথুরদাদা, শত্তুকে নিম্মূল করতে ?'

'দেখি ত·· ' মথুর সবিক্রমে আর একটা ঝোপ আক্রমণ করল, 'তুমি কুথাকে যাবে, সঙ্গে উইট' কে···অ, সনাতনের বিটী, এই, একট' ছড়া কাট দিকি।'

আরো কতকটা পেরিয়ে একটু উঁচু মতো জমিটা, জল জমেনি। সেখানে একজন ধানের বীজ ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ডুলির মা এবারে সত্যিই অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, বললে, 'হঁ গ', বীচ বুনছ যে, মাঠে সব রুইছে আর তুমি বুনছ ? ই চারা হবেক, আর···'

লোকটা আপ্যায়িত হয়ে কাজ না থামিয়েই বললে, 'দিদি, বীচের খুম অকুলান, চারা পাআ যাচ্ছে নাই গ', যা হয় হবেক, লয় ভাদ্দরেই রুয়া হবেক···'

'অ মা গ', উইট' আবার হয়! শাবণ মাসের শেষ বীচ বুনে চাষ হয়!' বলে ডুলির মা চলে যাচ্ছিল, তু'পা গিয়ে আবার দাঁড়াল, এবার ফিসফিস করে শাম্‌লীকে বললে, 'মুখপড়া গামছাট' পরেছে, দেখলে লাত্‌নী, যেমন কপ্‌নী এঁটেছে···'

শাম্‌লী তাকাল, ওভাবে গামছা-পরা পুরুষকে ওরা সব সময়েই দেখছে, কিছু ভাববার আগেই ডুলির মা বললে, 'মুখপড়া বলছে কী, বীচ বুনছে···বীচ বুনছে মুখপড়া···' বলে আধবুড়ি মেয়েটা হাসিতে ঢলে পড়ল যেন। কাজ বন্ধ করে লোকটা হাঁ করে তাকিয়ে রইল, সে কিছু বুঝতে পারেনি।

ওরা আবার এগোচ্ছে, ডুলির মা বলছে এটা-ওটা, কিন্তু শাম্‌লীর মুখখানা যেন লালচে হয়ে উঠেছে, কথাটার ধাক্কা সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

তেগাছার দক্ষিণ দিকের মাঠে গিয়ে কাজে নামল ওরা। পচাই সেখানে আগেই জুটেছিল। 'মহন কুথা রে···' জিজ্ঞেস করতে চাইল শাম্‌লী, পারল না। ধানের চারা রুইতে রুইতে পিঠ ধরে যায়, খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হয় শাম্‌লীকে, এদিকে ওদিকে লক্ষ করে, একবার একটা দলের মধ্যে মনে হয় মোহন আছে, কিন্তু না বোধ হয়। আরো দূরে দূরে দুটো পৃথক জায়গায় তার চোখ স্থির হয়েছিল, কিন্তু নিশ্চিত হওয়া যায় না।

আস্তে আস্তে কাজে নিবিষ্ট হল শাম্‌লী। দুটি-চারটি ফিকে সবুজ ধানের চারা এক সঙ্গে ধরে নরম কাদার মধ্যে পুঁতে দিচ্ছে। চারাগুলোর কোনোটা ডুবছে আদ্ধেকটা, কোনোটা গলা পর্যন্ত, শাম্‌লী ভাবে সে কি ওটাকে বেশি পুঁতেছে ? কেমন মায়া লাগে, চারাটা দাঁড়াতে পারবে, বাঁচবে তো ?

জলে মাটিতে গোলা কাদা, খুব নরম, একটা নতুন ধরনের গন্ধ লাগে নাকে। রোদ বেশি উঠলে গন্ধটা বদলে যায়। শাম্‌লীর আঙুলগুলো সেই নরম, তুলতুলে কাদার মধ্যে ডুবে যায়, কেমন বেশ ভালো লাগে, কখনো অপ্রয়োজনেও আঙুলগুলো কাদার মধ্যে রাখে শাম্‌লী।

দু'দিন, পাঁচ দিন, আট দিন মাঠে নামল শাম্‌লী, পর পর। প্রতি দিনই তার রোয়ার কাজ। শেষ দিকে আর সে ভাবত না, উৎকণ্ঠিত হত না, ওর বুকের জ্বালাটা নিভে আসতে লাগল যেন। এই এতগুলো লোক সমস্ত মাঠটা জুড়ে কাজ করছে। ত্বরিতে সে জমিতে নেমে পড়ে, প্রতি সকালে, আস্তে আস্তে কাজের মধ্যে ডুবে যায়।

চৌত্রিশ

কিন্তু শাম্‌লীর শরীরটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। এমনিতেই লম্বা, বাড়নসার চেহারা, এখন আরো ঢ্যাঙা দেখায়। কালো রঙে লাবণ্য ছিল ওর, ঝিকিয়ে-ওঠা দৃষ্টি আর তীক্ষ্ণ রিনরিনে হাসির সঙ্গে তা মিলে যেত। এখন ওর একরাশ চুল আর গা খড়ি-ওঠা, ঠিক যেমনটা শীতকালে হয়। যেন অবসন্ন, নিস্তেজ আর উদ্দেশ্যহীন।

মাঠের কাজ এক রকম শেষ হয়েছে, ওর শেষ কাজের দিন থেকেই প্রায়। এখানে-ওখানে কিছু চলে এখনও, তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। সমস্ত মাঠটা ফাঁকা, যেন এলিয়ে পড়ে রয়েছে। অলস বক কখনো জলজমির মধ্যে বসে থাকে, কখনো আস্তে আস্তে উড়ে যায়। গ্রামের লোকগুলোকে পথে-ঘাটে এখন প্রায় দেখা যায় না, ঘরের মধ্যে অলস টুকিটাকি করে, নয় তো ভিন কাজের ধান্দায় কোথায় চলে যায়।

চাষ হয়ে গেলে গ্রামের অবস্থা এমনিই হয়। শাম্‌লী আবার মাঝে মাঝে ধান কলে যেতে আরম্ভ করেছে, তুলির মার সঙ্গে, একেবারেই ঠিকা কাজ। ওখানে গিয়েও অস্বস্তি লাগে, তুলির মার যেমন প্রতিষ্ঠা সেখানে ওর তা নয়, যেন গৃহস্থ বাড়িতে কারও সঙ্গে আসা আগন্তুক। তবু তুলির মার সঙ্গেই কিছু কথা হয় ওর, তাছাড়া আর সবাই যেমন সেও তেমনি চুপচাপ।

সেদিন সকালে তুলির মার সঙ্গে ধান কলের দিকে এগোচ্ছিল শাম্‌লী। দূর থেকে ফটকের দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠল ওরা। অনেকগুলো মেয়েপুরুষ

মিলের সামনে—জটলা বা গোলমাল করছে না, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে কিছু দেখছে যেন।

'মুখপড়া কল বন্ধ করে দিল নাকি…' দৃশ্যটার থেকে চোখ না ফিরিয়েই দুলির মা বললে, 'কী সব দেখছে বল দিকি, নাত্‌নী?'

খানিকটা এগিয়ে আরো একটা জিনিস চোখে পড়ল ওদের—বিরাট অশ্বত্থ গাছটার আড়ালে ছিল বলে প্রথমে ওরা দেখতে পায়নি, কালো রঙের একটা ঢাকা গাড়ি। 'শুকুন এল না কি…' শুকনো গলায় দুলির মা বললে। 'হুঁ…' যোগ দিল শাম্‌লী, কিন্তু সে কী বোঝাতে চাইল বোঝা গেল না।

দাঁড়িয়ে-থাকা লোকগুলোর কাছাকাছি পৌছোবার আগেই ওরা দেখল, মিলের ভেতর থেকে নীলচে-সবুজ পোশাক পরা একটা 'মেলেটারি' বেরিয়ে এল, টুপির কানার আড়ালে চোখ ঢাকা পড়েছে, হাতে একটা পাব্‌ডার মতো লাঠি। লোকটা ঢুকতে না ঢুকতেই গাড়িটা গরগর করে উঠল এবং ছিটকে বেরিয়ে গেল, পিছনটা আব্‌ছা হয়ে গেল ধুলোর পর্দায়, বোঝা গেল পাকা সড়কের দিকে নয়, যাচ্ছে গ্রামের দিকেই।

শাম্‌লীরা তখন এসে পৌছেছে, কেউ ওদের লক্ষ করল না।

লোকগুলো একটু নড়েচড়ে উঠল, যেন শুকনো পাতা মড়মড় করছে। এলোমেলো পায়ে মিলের ভেতরে ঢুকতে আরম্ভ করল। একটা বুড়ি জিজ্ঞেস করলে, 'ধানকলে 'দারগা' ঢুকেছিল কেনে গ'? মানিজার বাবুর সঙ্গে কী বুললেক গ'?' পালা করে দু'চার জনের মুখের দিকে তাকাল ও, কেউ যদি উত্তর দেয়। একজন বললে, 'আমাদিকে খবর দিয়ে ঢুকেছিল, তাই আমরা বলব!'

অন্য দিনের মতো সেদিনও ঢিমে তেতালায় চাতালের কাজ শুরু হল, কিন্তু অভয় সরকার আজ আর তেমন তদারকি করল না, নামলই না চাতালে, বারান্দার ওপর থেকেই দু'একটা নির্দেশ দিয়ে অফিস ঘরে ঢুকল, সেখানে কী সব কাজ করতে লাগল তারপর। দুলির মা মাঝে মাঝেই লক্ষ করছিল তাকে। একবার মনে হল লোকটা ভয় পেয়েছে, ঘরের মধ্যে আবছা, বাইরে আলোকিত চাতাল থেকে ঠিক দেখা যায় না, আবার মনে হল হাসছে। এক সময় বাইরে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের কাজ দেখল। দুলির মা বুঝল, লোকটা কিছুই দেখছে না, ভাবছে।

ঠিক সেই সময় বাইরে আবার গাড়ির গরগর শব্দ শোনা গেল। সমস্ত চাতালটা চঞ্চল হয়ে উঠল যেন, ছুটে গেল বাইরে। কিন্তু এ গাড়িটা মিলের সামনে দাঁড়ায়নি, সোজা গাঁয়ের ভিতর দিকে চলে গেল।

এরপর চাতালের কাজ তেমন জমল না। এর আগে যদিও বা নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছিল, এখন সবাই চুপ করে গেছে। দুলির মা কথা বলল বটে কিন্তু না হেসে, গা না দুলিয়ে, 'লাত্‌নী, উয়ারা এত্‌দিন গত্তর ভিত্‌রে লুকায় ছিল, এখন মুখ বার করবেক, দেখে লিও তুমি···' তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে তেমনিভাবে যোগ করল, 'শুনছিলম বটে, সিংবাবুর বড বেটা ইবার আসবেক, বাপের ভিটায় বসবেক এসে, ত মেলেটারী-পুলিস আসবেক, তা শুনি নাই, কে জানে, বাবু, বাতাস কুন দিকে লড়ছে!'

সেদিন বিকেলে চাতালে কাজ হল না। আজকাল কাজ ঢিলে-ঢালা, সেটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু মিলের গেটটাই বন্ধ। শাম্‌লী শুনল, মানিজার বাবু স: তালা-ফালা ঝুলিয়ে কোথায় গেছে। লোক খুব কমই এসেছিল, ফিরে গেল তারা। দুলির মা আসেনি, বোধ হয় আগেই খবর পেয়েছিল। সে এলে শাম্‌লী দুটো কথা বলতে পারত।

অনিশ্চিতের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে রইল শাম্‌লী, অন্যেরা চলে যাবার পরও। কাঠের দরজাটা বেশ ভারী, বন্ধ হবার সময় খাপে খাপে এঁটে বসেছে। রাস্তার এপারে দাঁড়িয়েও পাল্লার কাঠের ওপর নক্সাগুলো বেশ বোঝা যায়, বাটালি দিয়ে খুদে তৈরি করেছে। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকার পর ফিরে পথ ধরল শাম্‌লী।

মাঝখানে এইভাবে কাজ বন্ধ হয়ে গেলে ওর কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। ঠিক এই রকম হয়েছিল, মোহনের জমিতে কাজ করার সময় একদিন এক প্রহরের বেলা ছুটি হয়ে গেলে। এখন কী করবে—এই রকম একটা কথা মনে হল ওর, কিন্তু উত্তরটা পেল না। হাঁটল সে অনেকক্ষণ ধরে, তাদের পাড়ার মধ্যেও এসে পড়ল, কিন্তু ঘরের দিকে গেল না। পায়ে পায়ে আড়াই-ক্রোশী মাঠের ধারটাতে এসে পড়ল ও। তার নিজের হাতে রোয়া মোহনের জমিটার ধারে এসে দাঁড়াল শাম্‌লী, একটা হিজল গাছের ছায়ার নিচে, ওদিকেই সেই দুটো বড় পাকুড় গাছ। আর তখনই সে বুঝতে পারল রোদ কতখানি চড়া। শ্রাবণের আর দু'এক দিন বাকি আছে, সামনেই ভাদ্রের গুলগুলি। কিন্তু ছায়াটা বেশ ঠাণ্ডা, সমস্ত মাঠটার ওপর দিয়ে বেশ হাওয়া বয়ে আসছে, চোখে-মুখে লাগে, ওর রুখু একরাশ চুলগুলো উড়িয়ে ফাঁপিয়ে তোলে। শাম্‌লী দু' হাতের আঙুলে চিরে চিরে চুলগুলো পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিল, শুকোক।

মাঠের ওপর চোখ রয়েছে ওর। আলের পর আল, উঁচু নিচু তল, জমিগুলোতে আটকানো কমবেশি জল, ক'দিন আগেই রোয়া শেষ হয়েছে, অতি হালকা

রঙের চারাগুলো বাতাসে দুলছে। অলস দৃষ্টিতে অনেক দূর পর্যন্ত তাকিয়ে রইল ও, ব্রাহ্মণভুঁইয়ের জঙ্গলের রেখাটা যেখানে ঘন নীল হয়ে গেছে। মাঠের মাঝামাঝি দুটো চিল, শঙ্খ চিল বোধ হয়, ঘুরে ঘুরে উড়ছিল, পরস্পরকে পাক দিয়ে। উড়তে উড়তে চিল দুটো এদিকেই আসছে। হাসল শাম্‌লী।

একটু আগে থেকেই পিছনে ছোট ছোট ছেলের একটা চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছিল, কাছাকাছি আসতেই ফিরে তাকাল শাম্‌লী। একদল ছেলেমেয়ে কোথায় যাচ্ছে। কারও হাতে ডাংগুলি, কারও হাতে একটা কঞ্চি বা গাছের ডাল। খেলতে খেলতেই যাচ্ছে সব।

'পচাই · ' একটু অবাক হয়েই ডাকল শাম্‌লী, ওদের মধ্যে পচাইকে বেশ বুড়ো-ধাড়ীই লাগছিল।

'তুই! তুই ইখেনে কী করছিস···' এদিকে তাকিয়ে ওকে দেখতে পেয়েই ছুটে এল পচাই, 'তোকে খুঁজে খুঁজে আমি হাল্লাক হয়ে গেলম!'

'কেনে, আমাকে খুঁজছিলি কেনে?'

'তোদের ধানকলে ছুটলম, সিখেনে বন্ধ, আবার ঘরকে এলম, পাড়াকে খুঁজলম···দুস্ শালাঃ, অত খুঁজবেক কে, ত যাচ্ছি ··' শাম্‌লী তখনো কথার উত্তর পায়নি বুঝে বললে, 'মা তোকে ডাকছে, তুই ঘরকে যা, মহন এসছে, বসে আছে দুয়ারে, খুঁটিএ ঠেক দিয়ে।'

বুকের ভেতর ধক করে উঠল শাম্‌লীর, 'মহন! মহন এস্‌ছে কেনে

এর আগে মোহন কখনো ওদের ঘরে আসেনি!

'কেনে এস্‌ছে, বলব কী করে, তুই যাবি তবে বোধায় কথাবাত্তা হবেক কতকটা বিরক্তির সঙ্গে বললে পচাই।

'আচ্ছা, চল ' অনিশ্চিত স্বরে বলল শাম্‌লী।

'আ মি যাব নাই, তুই যা···' দূরে এগিয়ে-গেছে দলটার দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল পচাই, 'আমি যাচ্ছি সিংবাবুদের ঘরকে, উয়ারা সব যাচ্ছে···শুনলম বড়বাবু কলকাতা ঠিঙে এস্‌ছে, একট' লোতন ঘঁড়া লি' এস্‌ছে, ত দেখে এসি···' বলতে বলতে পচাই ছুটে গেল।

ঘটনাগুলো একটার ঘাড়ে আর একটা এসে পড়ছে যেন, শাম্‌লী থমকে গেল।

পচাই আবার ছুটে ফিরে এল, 'দিদি, মহন এস্‌ছে · ত সেই বিয়া-টিয়ার কথা লয় ত, সেই যে তুই বলেছিলি?'

'ধুর্, উ আমি ভুলেই গেছি···তুই শীগ্রি চলে এস্‌বি···' বলে শাম্‌লী ঘরের দিকে পা বাড়াল। ওর মনের মধ্যে কথাটা ছিল, 'ধুর্, মহন উইট' ভুলেই গেছে!'

পঁয়ত্রিশ

কিন্তু ঘরের কাছাকাছি পৌঁছে একটু অবাক হল শাম্লী। ওদের দাওয়ায় শুধু মোহন নয়, মথুর কৌড়িও বসে মুড়ি খাচ্ছে। মোহনের এদিক পিছন-ফেরা, দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়েছে, তার ডান পাটা ধাপির ওপর। মথুরের মুখখানাই দেখতে পেল সে, মুখে মুড়ি ফেলে হাসতে হাসতে কী বলছে।

উঠোনের ওপর আসতে না আসতেই মথুর ওকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল, 'বৌদিদি, এই লাও তুমার বিটী এল '

মোহন হাতের মুড়ি মুখে তুলতে গিয়ে চকিতে ফিরে দেখল ওকে।

ঘরের ভিতর থেকে কামিনী বলে উঠল, 'ধানকলে ছিলি নাই ত কুথা ছিলি, তোকে ডাকতে পাঠালম ত উ ফিরে এল…'

'ধানকলে কাম হল নাই·' মোহনের পিছন দিক দিয়ে দাওয়ায় উঠল শাম্লী, ওদের পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকল, 'পচাই বলল, তুমি আমাকে ডাকিছ, কেনে?'

'উ আবার গেল কুথা?'

'উ গেল সিংবাবুদের ঘরকে, লরেনবাবু লয় ফিরছে, বড ঘঁডা লি'-এস্ছে একট', তাই দেখতে গেছে·'

'হাই, বলিস কী, লরেনবাবু আসিছে, কবে এল…' বলতে বলতে উল্টো মুখে বেরিয়ে এল কামিনী, তার হাতে একটা বাটি।

খবরটা শুনে মোহন বোধ হয় চমকে উঠল, কিন্তু সামলে নিল নিজেকে।

কামিনী বাটিটা ওদের সামনে ধরে দিল, কয়েকটা ছাড়ানো পেঁয়াজ রয়েছে তাতে। মথুর বললে, 'আবার পিঁয়াজ দিচ্ছ, দাও থালে·'

ওরা আসাতে একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কামিনী, কিন্তু কেন এসেছে সে কথা ওরাও বলেনি, কামিনীরও জিজ্ঞেস করা হয়নি। শাম্লী ঠিক বুঝতে পারল।

ঘরের ভেতর থেকে শাম্লী দেখছিল মোহনকে। খাওয়ার পর উঠোনে নেমে ঘটির জলে মুখ ধুয়ে এসে আবার বসল মোহন, মথুর দাওয়ার ওপর থেকেই মুখহাত ধুয়ে ফেলল। মোহন আজ বেশ পরিষ্কার, পরনে পাজামা, আর গায়ে চেক-দেওয়া হাফশার্ট, চুল কেটেছে সরু গোঁফ রেখে। মনে মনে হাসল শাম্লী, 'মহন আবার সাজিছে…'

আর পরক্ষণেই মনে পড়ল ওর, সে নিজে পরে রয়েছে একটা ছেঁড়া ময়লা শাড়ি। হাতটা মাথায় উঠল একবার, চুল রুখু, গলায় মুখে ঘামে ভিজে গিয়েছে।

মথুর বেশ ঘড়ঘড়ে জমাট গলায় বললে, 'জল খাওয়া হল, এখন বল দিকি বৌদিদি, তুমার ঘরকে এস্‌ছি কেনে ' বলেই খানিকটা হা-হা করে হাসল মথুর, 'বলি, তুমার বিটীর বিয়া-টিয়া দিবে, না কি··· সনাতনদাদা নাই, ত আমরা আছি বটে, আমাদিকে দেখাশুনা ত করতে হবেক ?···'

এখন, বুড়ি ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিল কিনা বলা মুশকিল, কিন্তু হাবভাবে তেমন উৎসাহ দেখাল না। এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল, এখন খোঁড়া পাটা টেনে বেঁকিয়ে মাটির ওপর বসল। বললে, 'বিটীর মাথায় ত জল দিব, কার সাধ লয় বল, ত পাত্তর কুথা ?'

'পাত্তর আছে গ', বউদিদি, তুমার চোখের সামনেই আছে, হাঃ-হাঃ···এই মহন ছেলেট'কে তুমার মনে ধরে ? গাজনের শালীপো, চিন ত উয়াকে, একট' বাঁশ ঝাড়ের আড়াল···ত বিটী তুমার জলে পডবেক নাই, আমি বলে দিলম। গাজনের চার বিঘা জমি আছে, মহন ছেলেট' ভাল চাষী, নিজের হাতে চাষ করেছে, তুমার বিটী ত তার জমিএ কাম করেছে শুনলম, হয় লয় শুধাও উয়াকে। শুন কেনে, শাবণের আর দুট' দিন বাকি, ত পরশু সংকান্তির দিন বিয়ার দিন আছে, লাগায় দাও কেনে ·'

মথুরের হঠাৎ খেয়াল হল কামিনীর কোনো সাড়া নাই, কাঠ হয়ে বসে আছে, ওর নিজের স্বরটা নিভে এল যেন, 'কি গ', বৌদিদি, তুমার মত কী বল, আমি বলি এমন পাত্তর তুমি পাবে নাই, থালে বল তুমি ·'

আরো খানিকটা চুপ করে থেকে নীরস খনখনে স্বরে কামিনী বললে, 'মত দিব, কিন্তু পণ লাগবেক।'

মোহনের চোখ একবার ঘরের ভিতর গিয়েই ফিরে এসে মথুরের মুখের ওপর স্থির হল, আর মথুরকে বিছে কামড়াল যেন, 'সে কি গ', বৌদিদি, পণটন আজকাল আছে না কি, উসব উঠে গেছে, ভদ্দলোকের বরপণ আর ছোটলোকের কনেপণ, উসব···'

লিকলিকে ঘাড়ের ওপর মাথাটা নাড়তে লাগল কামিনী, 'তা তুমি যা-ই বল কেনে, ঠাকুরপো, বিটী আমার কাজের মেয়ে, দু'পয়সা কামাতে পারে, যাদের ঘরে যাবেক তাদের সুসার হবেক···ত আমি খঁড়া মানুষট', আমি বিয়া দিলম ত আমাকে কে দেখবেক ?'

হঠাৎ কিছু উত্তর দিতে পারল না মথুর, পরে একটু তেতো গলায় বললে, 'তুমি ত কঠিন কথা বুলছ, বৌদিদি, থালে লোকে কি বিটীর বিয়া দেয় নাই, অঁ?'

এবার ঘাড় নাড়ল মোহন, বললে, 'উ কথা ঠিক বটে, আমার মনে হয়, বিয়ার পর আমরা এক সঙ্গে কাজকাম করলম, শাম্‌লী পচাই উনি আমি সবাই, ত এক সঙ্গে হলে সব চলে যাবেক।'

'হঁ ' একটা শব্দ করে চুপ করে গেল কামিনী, বোধ হয় প্রস্তাবটা মনে মনে যাচাই করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে বললে—এখন ওর সতর্ক লাভকষা ভাবটা চলে গিয়ে কণ্ঠস্বর ক্লান্ত শোনাল,'বলে নিজের পেট-ছিঁড়া বেটা মাকে ভাত দেয় নাই ত জামাই! তা লয়, শামলীর বিয়াট' হউক কেনে, আমি মত দিলম, বিয়ার কথা অনেক দিন আমার মনে লিচ্ছে···কিন্তুক কি জান, বিয়া বললেই ত বিয়া লয়, তার খরচপত্তর আছে, আমার আজ খেতে কাল নাই!'

মথুর লুফে নিল কথাটা, 'সে সব খরচ মহনের, আমাদের কথা হইচে উসব। তুমি কথা দাও পরশু বিয়া হবেক, ত কাল থিকে সব জিনিসপত্তর তুমার ঘরে গাদা করে দি, হাজার হ'ক বিয়া বলে কথা, পাঁচজন লোক ত ডাকতে হবেক···'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল কামিনী, এরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু আর একটা ব্যাপারে তুমুল হয়ে গেল ওদের মধ্যে। কামিনী কোন বামুন-পুরুতকে ডাকা হবে কথাটা তুলতেই মোহন বেঁকে বসল, তার ইচ্ছে, গ্রামের পাঁচজনের সামনে বরকন্যা কামিনীকে প্রণাম করবে, আর কোনো অনুষ্ঠান হবে না।

'অ মা গ', কী আমার বিয়ার ছিরি, গায়ে-হলুদ নাই, মন্তর বলবেক নাই, ই কি রাঁড় রাখা না কি···' কামিনীর রোগা দেহটা রাগে এঁকে-বেঁকে উঠল।

কিন্তু মোহন রাজী নয়। এমন হল যে বিয়ের কথাবার্তা ভেঙে যাবার মতো হল, এমন কি মথুর, যে মোহনের অনুরোধে অভিভাবকের মতো কাজ করতে রাজী হয়েছিল, সেও বিরক্ত হয়ে উঠল।

শেষকালে দু'পক্ষ একটা আপোষ প্রস্তাবে রাজী হল যে, সাঁওতাল পাড়ার লুস্‌কি বুড়ি বিবাহের মধ্যস্থতা করবে, সে যা বলবে, কি মন্ত্র পড়বে, সব মেনে নিতে হবে কামিনী আর মোহনকে। লুস্‌কির ওপর খুব ভরসা কামিনীর, সে গুণিন, তাছাড়া, তাকে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে।

তখনকার মতো আর কথাবার্তা হল না। সন্ধ্যে বেলা লুস্‌কি এসে ব্যবস্থা দিলে যে, সাঁঝ বেলায় বর-কনে মালা-বদল করবে, এবং তারপর বড়মতলায় গিয়ে বড়মবাবাকে প্রণাম করবে। মোহন কথা দিয়েছিল লুস্‌কি বুড়ির কথা মানবে, অগত্যা তাকে স্বীকার করে নিতে হল।

ছত্রিশ

এক দিন পরে শ্রাবণ-সংক্রান্তির সন্ধ্যায় মোহনের সঙ্গে বিয়ে হল শাম্‌লীর।

কথা মতো মোহন আয়োজন করেছিল, সামান্যই, তবে কামিনীকে অখুশী রাখেনি। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা সব মিলে জন পনেরো, তার মধ্যে কামিনীর ইচ্ছায় লারাণ জেলে—সিংবাবুদের মাছ-ধরার সময় আগে কখনো কখনো লারাণ কামিনীকে এক-আধটা মাছ দিত—আর শাম্‌লীর ইচ্ছায় তুলিব মা আছে। লুস্‌কি তো আছেই, বনা সাঁওতালও। কাপড-চোপডও কিনেছে মোহন, মামাতো ভাই বলাইকে নিয়ে মেদিনীপুবে গিয়েছিল সে, বিয়ের আগেব দিন। কামিনীর জন্যে ধোয়া সুতোর থান কাপড, পচাইএর শার্ট-প্যাণ্ট, আব বব-কনের সাজ তো আছেই।

মথুরের ওপর খাওয়া-দাওয়ার ভার ছিল। সে একটা পাঠা কেটেছে, আর পচুইয়ের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু ওরা যা ভেবেছিল, লোকের সংখ্যা তাকে ছাপিয়ে গেল। বিকেলে ঘটেছিল ঘটনাটা। সাঁওতাল পাডার এক দল মেয়ে-পুরুষ—সেই বড়ম পূজার দিনে শিকারীব দল, যাদের সঙ্গে শাম্‌লীও যোগ দিয়েছিল—নিজের থেকে এসে হাজির হল। ফুল্‌মি আব এল্‌মুনি তো মোহনেব গলায় ঝুলে পড়ে অবস্থা, 'তুর বিয়া হবেক, আমাদের শাম্‌লীদিদির বিয়া হবেক, আমরা লাচব নাই, উ হবেক নাই!'

'হঁ, তা লাচিস কেনে···' মোহন হেসে বললে কিন্তু একটু ফাঁক পেতেই বিমূঢ় মুখে মথুরের কাছে উপস্থিত হল।

মথুর শুনে চিন্তিত মুখে মাথা নাডতে লাগল, 'উয়াদের ভোজনেব ব্যবস্থা ত করতে হয়, আর কিছু টাকা দাও, পচুই জগাড হয়ে যাবেক ··'

'আমার কাছে একট' কানাকডি নাই, এখন ধার দিবেক বা কে!'

নিমেষে মথুরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'আমি ধার দিব···' কাজে-কর্মে, উৎসবে-পার্বণে মথুরের উৎসাহ অসীম, ও মনে মনে হিসেব করে বললে, 'আর গটে তিরিশেক টাকা হলে হয়, আমি লি' এস্‌ছি দাঁড়াও···'

সন্ধ্যার মুখে কামিনীর উঠোনে পেট্রোম্যাক্সের আলো জ্বলেছে, মেয়ে-পুরুষ, পাড়ার এক পাল ছেলে-মেয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, মাঝখানে মোহন আর শাম্‌লী। শাম্‌লীকে সারা দিন ধরে মেয়েরা মাজা-ঘষা করেছে, শামলা রঙের ওপর লাল

পাটের শাড়ি মানিয়েছে ভালো, ঘষা চুল একটু ফাঁপানো-ফোঁপানো, কপালে চন্দনের টিপ, আলোতে মুখখানা উজ্জ্বল, আর—ওর কাছাকাছিই ছিল ফুল্‌মি আর এল্‌মুনি, তাদেব দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে হাসি-হাসি। মোহনের ধুতি আর আদ্দিব পাঞ্জাবি, তার ওপব উডনি জড়িয়েছে। অনুষ্ঠান বাদ দিতে চেয়েছিল মোহন, কিন্তু মেয়েরা তার কিছুই বাকি বাখেনি। এ ব্যাপারে তুলির মা ছিল আগ-বাডানি, সে মোহনের কপালে চন্দনের টিপ দিয়েছে, গায়ে দিয়েছে হলুদ, ছোপ লেগেছে পাঞ্জাবিতে। এখন সে ওদের দুজনের সামনে দাঁডিয়ে কিন্তু অন্য সবার উদ্দেশ্যে হাত নেডে গা দুলিয়ে ছডা কাটছে—

শুনুন শুনুন মহাশয় কবি নিবেদন।
অগ্রেতে বন্দিব আমি দেবতার চরণ ॥
যেকালে রামেব বিবাহ জানকীর ঘরে।
চাবি জাতি বসে আছেন সভাব ভিতবে ॥
অযোধ্যায় জন্মিলেন বাম গুণমণি।
মিথিলায় লসে গেলেন বিশ্বামিত্র মুনি ॥
জানকী পাইল বাজা জন্মভূমি চষি।
হবধনুভঙ্গ পণ করে জনক ঋষি ॥
বুঝিলেন আশুতোষ জানকীব মন।
সন্তুষ্ট হইয়া বর দিলেন ত্রিলোচন ॥
আনন্দিত হইয়া রাম ধনুক ধরিল।
কাঁকাল বাঁধিয়া বাম ধনুক ভাঙ্গিল ॥
পণরক্ষা করি বিবাহ দিলেন জানকী •
দেখিয়া দোঁহার রূপ নয়ন জুডাল।
নাপিত উঠিয়া তখন মগডাল নিল ॥
ডাক দিয়া কহে নাপিত সভার ভিতরে।
কুবিধা সুবিধা দাও চালেব বাতা ছেডে ॥
যে ধবে চালের বাতা সে খায় ভাতারের মাথা।
কন্যা করিলেন সম্প্রদান পুত্র পেলেন ঘরে।
প্রেমআনন্দে পরিছন্দে দুঃখ গেল দূরে ॥
সভা সহ দেহ এই বর—
রামসীতা করুক যেন যুগযুগ ঘর ॥

হাসছে সবাই, তার মধ্যে পচাই সব চেয়ে বেশি। পচাই নতুন জামা-প্যাণ্ট

পরে একবার আলোর সামনে, তারপর বর-কনের পিছনে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে, সে একবার তুলির মার নকল করে বলে উঠল, 'যে ধরে চালের বাতা সে খায় ভাতারের মাথা', আর সর্বোচ্চে হেসে উঠল।

মথুরও ভিড়ের একটু সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে, আবার মাঝে মাঝে ভিড় কেটে চলে যাচ্ছে বাইরে, ওদিকে চালা বেঁধে রান্না হচ্ছে তার তদারকির জন্য।

একবার এই রকম ফিরে আসছে, ওকে পিঠে আঙুল দিয়ে কে থামাল, ফিরেই দেখে লারাণ জেলে। 'একট' কথা বলব মথুরবাবু ' ফিসফিস করে লারাণ বললে। মথুরের কেমন যেন লাগল ওর চোখের দিকে তাকিয়ে, অনিশ্চিত স্বরে বললে, 'কী ··'

'কামিনীদিদি লিমন্তন্ন করেছে তাই এলম, ত মথুরবাবু, ই তুমরা কী ধরনের বিয়া দিচ্ছ, তুলের বেটা মাহাতর বিটী···'

'এই কথা! আমি বলি কী না কী, আজকাল বলে বামুন-চাঁড়ালে বিয়া হচ্ছে, ত তুলে-মাহাত কুথা লাগে!'

'বামুন-পুরীত নাই শুনলম···'

এটাতে মথুরের মনেও কিন্তু ছিল, তবু বললে, 'তা ঠাকুর-দেবতা সাক্ষী রেখে বিয়া হচ্ছে, যার যেমন ইচ্ছা।'

শাঁখ বেজে উঠল, তাড়াতাড়ি বর-কনের কাছে চলে এল মথুর। এগিয়ে এল লুস্‌কি। সেই বড়ম-পূজার সময় যেমন, এবারেও ফরসা সাদা খাটো শাড়ি পরেছে টান করে, কিন্তু ওর মুখচোখ আগের থেকে শুকনো, কঠিন দেখাচ্ছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে তার পিছনে রয়েছে কামিনী, নতুন থান পরে. তারও মুখচোখের অবস্থা একই রকম।

লুস্‌কির হাতে দুটো মালা ছিল, টগর ফুলের। মোহন আর শাম্‌লার হাতে একটা করে দিয়ে বললে, 'তুরা লিজের গলায় পরে লে।'

বর-কনে এতক্ষণ পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল, লুসকি তাদের মুখোমুখি করিয়ে দিলে, 'তুরা ই এখন উয়ার গলায় মালা দে।'

মোহন আর শাম্‌লী মালা বদল করতেই আবার শাঁখ বাজল, তুলির মা উলু দিলে।

'উলটি-পালটি দাও, লুস্‌কি দিদি···' মথুর ঈষৎ গাঢ় স্বরে বললে।

লুস্‌কি বুড়ি মথুরের দিকে ফিরেও তাকাল না। তার নির্দেশে বর-কনে মোট তিন বার মালা বদল করল, দ্বিতীয় বার যেটা যার মালা তার কাছে ফিরে এল, তৃতীয় বারে একের মালা অন্যের গলায় রইল, সেটাই শেষ।

এরপর বড়মতলাতে এগোল ওরা, সমস্ত দলটাই। একজনের আলো নেওয়া দরকার—পচাই ঝাঁপিয়ে পড়ে পেট্রোম্যাক্সের আলোটা মাথায় তুলে নিলে। মথুর বললে, 'একট' বিড়া দিয়ে লে…' বলে নিজের গামছাটা পাকিয়ে আলোর নিচে ওর মাথায় বসিয়ে দিলে। পচাইয়ের পিছনে লুস্‌কি, তার পিছনে বর-কনে, তাদের পিছনে বাকি সব।

মাস দুই আগে লুস্‌কিরা এখানেই বড়মপূজা করেছিল, মাঠের ধারে এই ঝুরি-নামা বটতলায়। এখন কিন্তু জায়গাটা কেউ পরিষ্কার করেনি, কিছু লোক তেমনি জুটেছে, কিন্তু এই উপলক্ষে বলি হবে না, মাদলের বদলে শাঁখ বাজছে।

গাছতলায় বড় বড় ঘাস জন্মেছে এই দু মাসের বর্ষায়। বর-কনেকে ভেতরে ঢোকাল না লুস্‌কি। বাইরেই ওদের দাঁড় করিয়ে সেই ঘাস-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে বটগাছের গোড়ার কাছে চলে গেল, সেখানে বাবা বড়মের শিলামূর্তির ওপর। এদিক থেকে ঠিক দেখা যাচ্ছিল না। কতক্ষণ হাত রাখল সে, তারপর ফিরে সেই হাত একবার করে বর-কনের মাথায় রাখল। তখন প্রণাম করতে বলল ওদের।

মোহন ও শামলী প্রথম বড়মকে, তারপর লুস্‌কি আর কামিনীকে প্রণাম করল।

ফিরে এসে তারপর ভোজপর্ব, সেটা শেষ হতে বেশ রাত হল। বিশেষ করে পচুইএর রেশ মিটেও মিটতে চায় না। মথুর কৌড়ির ব্যবস্থাপনা ভাল।

এদিকে আর এক ব্যবস্থা হচ্ছিল। মোহনের শিক্ষাগুরু বনা, মামাত ভাই বলাই, শামলীর দুই সই ফুল্‌মি আর এল্‌মুনি মাদলে ঘা দিতে বলল, গুরগুর করে উঠল জায়গাটা। দুটো ছোট চৌকি যোগাড় হয়েছিল, বর-কনেকে বসাল সেখানে। বুদীন মোহনের হাতে একটা বাঁশি দিয়ে বলল, 'এগ্‌বার বাজাও হে…'

মোহন হেসে বাঁশিটা তার হাত থেকে নিলে, একটা জানা সুর যতটা পারে বাজাবার চেষ্টা করল। দুলির মা—পচুইয়ের গুণে তার উৎসাহ এখন অনেক বেশি—বলে উঠল, 'লাত্‌নী, লাচ কেনে, তুমি লাচ, লাতজামাই বাঁশি বাজাইছে…'

উত্তরে মুখ মুড়কে শামলী হাসল একটু।

একটু পরে মোহন কিন্তু বাঁশিটা বুদীনকেই ফিরিয়ে দিলে। সে পুরো সুরে বাঁশিতে তান তুলল।

ফুল্‌মি এল্‌মুনি সম্বরি মেয়েরা হাত জড়াজড়ি করে ধরেছে। বনা নিজে গিয়ে

মাদলে বসল। তারপর নাচ শুরু হল ওদের। সমান তালে পা ফেলে হাতে হাত জড়ানো মেয়েরা পিছিয়ে গেল, সামনে এগোল, ডাইনে সরে গেল, মাদলের ছন্দে—ধিল্ মিতাং দতাং দাং মিতাং ঘিটি—ধিল্ মিতাং দতাং দাং মিতাং ঘিটি।

সাঁইত্রিশ

এরপর দিন দশ-বারো কেটে গেছে। দুপুরের একটু পরেই মোহন আর শাম্‌লী গ্রাম থেকে বেরিয়ে চাঁদসোলের আড়াইক্রোশী মাঠে পড়ল, পেরিয়ে জঙ্গলে যাবে। বিয়ের পর প্রথম দু-চার দিন মোহন একলাই যেত, সে নিয়ে শাম্‌লীর কী রাগ, এখন সেও জঙ্গলের মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে উঠেছে।

মোহন বলেছে, ওদের দুজনের আর হয়তো গ্রামের মধ্যে থাকা চলবে না, জঙ্গলের মধ্যেই ডেরা বাঁধতে হবে। কারণটা কী সে ভেঙে বলেনি, শাম্‌লীও জিজ্ঞেস করেনি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে।

'হঁ গ', তুমার উই বন্ধুকে বল দিকি আর কুথাও থাকতে, আমাদের ঘরে রাখতে লারব।'

'আমার ভাই বলাইয়ের কথা বলছ, কেনে?'

'ভাই না ছাই, তুমাদের উই গুজুর-গুজুর আমার ভাল্ লাগে নাই, বাবু, অষ্ট পহর তুমাকে কুথা সব লি'যাচ্ছে, ঘরে দু'দণ্ড থাকতে দেয় তুমাকে? ইবারে আমি মুখের উব্‌রেই বলে দিব।'

হাসল মোহন, এই অভিযোগ শাম্‌লী আগেও করেছে। বললে, 'তার কাছেই ত যাচ্ছি আমরা, সে আগে গেছে জঙ্গলে।'

'অ মা-গ', বুললেই হল, চল, দেখবে উয়ার আবস্থা আমি কী করি আ-গ', হাই, তুমি উদিক পানে যাচ্ছ কেনে…'

দুটো আল যেখানে কাটাকাটি করেছে, সেখানে শাম্‌লী পিছন থেকে টেনে ধরল মোহনের চেক-কাটা জামাটা, 'ইদিক দিয়ে কাছে হবেক।'

'কেনে, কাছে হবেক কেনে…' মোহন আলগুলোর ওপর চোখ ফেলে আন্দাজ করবার চেষ্টা করছিল, তার মধ্যেই তাকে টেনে বাঁদিকের আলটায় এনে ফেলল শাম্‌লী, আর খিলখিল করে হেসে উঠল। দুষ্টুমিটা বুঝেও মোহন বুঝল না, ভালোমানুষের মতো বউএর টানা হয়ে চলতে লাগল, সরু আলের ওপর টলতে টলতে আর টাল সামলাতে সামলাতে। কিন্তু তৈরি হয়েই ছিলসে,

পরের মোড়টায় পৌছোতে না পৌছোতে ওর লাল শাড়িটা ধরে টান দিল এবং ডান দিকের আঁল বরাবর টেনে নিয়ে যেতে লাগল, 'ই দিকে কাছে হবেক, এস কেনে···'

দারুণ হাসতে হাসতে টাল সামলাতে পারল না শামলী, কিন্তু পড়বার আগেই তার কোমর বেড় দিয়ে আটকাল মোহন। এবার দুজনেই হাসছিল কিন্তু শামলী সচেতন হয়ে ফুঁসে উঠল, 'উই দেখ, লোক···', খুব দূরে কাবা যাচ্ছিল একই মুখে, দেখেনি।

এর পরের মোড়ের জন্য দুজনেই প্রস্তুত হয়ে ছিল, দুজনেই দুজনকে টান দিলে কিন্তু হাত-ছুট হয়ে গেল। তখন আর এক খেলা—যে যার নিজের আল ধরে ছুটল, কে আগে কোনাকুনি মোড়টাতে পৌঁছোতে পারে। বোধহয় একই সঙ্গে দুটো ঢেউ এসে পরস্পরের ওপর আছড়ে পড়ল, শাড়িতে-চুলে-জামায় জড়াজড়ি, ওদের হাসিতেও।

আল কোথাও সরু, কোথাও মোটা, দু পাশে কম-বেশি জল জমেছে, দিন পনেরো আগেব রোয়া ধানের গোছ বেশ বড়, সবুজ, অনেকেটা ঘন হয়ে উঠেছে, সিরসির করে বাতাস বইছে ধানেব ডগাগুলোকে ছুঁয়ে, সবুজেব ওপর ঢেউ উঠে ছড়িয়ে পড়ছে। মোহন আর শামলী তাবই মাঝখান দিয়ে আলতো পায়ে ঢেউএর মতো ছুটছে।

মাঠটা পেবিয়ে বনের প্রান্তে যখন ওরা পৌছাল, তখন ওরা একটু হাঁপাচ্ছে আর ঘেমে গিয়েছে। মোহন শার্টটা খুলে আধো ভাঁজ করে কোমরে রাখল, হাতা দুটো সামনে টেনে গিঁট দিল। শামলীর গায়ে জামা ছিল না, বিয়েব লাল শাড়িটাই পবেছিল সে, এখন যেটা ছুটোছুটিতে বিস্রস্ত হয়ে উঠেছিল। শাড়িটাকে গুছিয়ে কোমরে বেড দিয়ে টান করে পরল শামলী, খোলা চুলগুলো মাথার পিছনে এলো খোঁপায় বাঁধল।

'মা-গ', যা ছুটাইছ তুমি।'

একটা গাছের নিচে ছায়ায় দাঁড়িযে পেবিয়ে-আসা মাঠটাব দিকে তাকাল ওরা। যতদূর চোখ যায়, সবুজ ঠাণ্ডা বাতাস, চোখের মধ্য দিয়ে মাথার ভেতবটা পর্যন্ত জুড়িয়ে দিয়ে যায়।

'তুমি কতগুলান জমি রুয়েছ গ ' শামলী আহ্লাদী স্বরে বললে, দূরে তেগাছার দিকে তাকিয়ে, 'আমি রুয়েছি, দাড়াও গণি, এক, দুই, সাত, নয়, পনর, পনরট' ··তুমি ?'

'সবগুলান, সব জমি-এ দু-চার গোছ আছে লিচ্চয়···' হাসছিল মোহন।

'ইঁই দেখ, সব কথায় ল্যাখ্‌রা…' শাম্‌লী ওকে একটা চিম্‌টি কাটল, 'বল না।'

মোহন তার মুগ্ধ দৃষ্টি মাঠের থেকে ফিরিয়ে এনে রাখল শাম্‌লীর মুখের ওপরে। কালো শাম্‌লী, এই ক'দিনেই লাবণ্য উপচে পড়ছে যেন, কালো চোখের ভেতর তারা চঞ্চল। মোহন হাত বাড়িয়ে ওর পাতলা দেহখানা নিজের বুকের ওপর টেনে নিলে, বলিষ্ঠ দুই হাতে নিষ্পিষ্ট করে ওকে গাঢ় চুম্বন দিলে, বুকে পড়ে রইল শাম্‌লী। কতক্ষণ পরে ছেড়ে দিতেই এক রকম করে হাসল শাম্‌লী, 'অ্যাই, চল, ঘরকে যাই ·'

অভিজ্ঞ মোহন বুঝল, তারও বুকের ভেতর আগুনের ছ্যাঁকা দিয়েছে যেন, কাঁচুমাচু স্বরে বললে, 'কিন্তুক বলাই উখেনে আছে, আমি যাব কথা দিছি, শীগ্‌গির চলে এসব ·'

অগত্যা ওরা এগোল দুজনে। সামনেই উঁচু কাঁচা সড়ক, তার ওপর উঠেই থমকে দাঁড়াল মোহন, দু সারি চাকার দাগ, বোধহয় জীপ বা ভ্যানের।

শাম্‌লী রাস্তাটা পেরিয়ে ডাকল, 'এস কেনে, উ দেখে কী হবেক।'

'এই যাই…' অন্যমনস্কভাবে বলল মোহন, কিন্তু হঠাৎ কী ভেবে বললে, 'শাম্‌লী, তুই এক কাজ কর, তুই বরঞ্চ ঘরকে ফিরে যা, কাজ সেরে আমি যাব…'

ঠোঁট ওলটাল শাম্‌লী, 'অ মা-গ', কেনে, এস তুমি…'

আবার কী ভাবল মোহন, কিন্তু তারপরই যেন মন থেকে ঘটনাটা মুছে দিয়েছে এমনিভাবে রাস্তা পেরিয়ে এসে শাম্‌লীর হাত ধরল।

শেষ দুপুরের দিকে গুমোট ছেড়ে দিয়ে বনের ভিতর বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে। পাতাগুলো নড়ছে, ডালপালার ভেতর একটা অস্পষ্ট মিষ্টি সিরসির শব্দ, শাম্‌লীর উত্তপ্ত হাতখানা নরম হয়ে পড়ে আছে মোহনের মুঠির মধ্যে। সেই শিকারের দলে এসে গাছপালার মধ্যে এই রকম আলোড়ন দেখেছিল শাম্‌লী। মাঠের মধ্যে যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ কেবলই ছুটোছুটি করেছে ওরা, এখন বনের মধ্যে ওদের পা মন্থর হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে এর পায়ে ওর পা আটকে যাচ্ছে। আর শাম্‌লী মোহনের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে মিচ্‌কে হাসছে।

বড় গাছের জঙ্গল এখনো আসেনি, কিন্তু ছোট শালগাছের চারা ক্রমেই ঘন হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে ফাঁক এত সংকীর্ণ যে ডালপালা গায়ে এসে লাগে। আর একটু এগোতেই ঝাঁক ঝাঁক টিয়া ওদের মাথার ওপর এদিকে-ওদিকে উড়ে যেতে এবং গাছের ওপর বসতে লাগল। গাছের সরু ডালে বসছে

আর ডালসুদ্ধ ঝুলে পড়ছে দোল খেতে খেতে।

শাম্‌লী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে গেল একবার, একটা বেথাপ ডালে পাখিটা বসতে গিয়ে ডিগবাজি খেয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে, শাম্‌লী পৌছোবার আগেই পাখা ঝাপটা দিয়ে উড়ে পালাল।

'হাই যাঃ · ' ঠোট উল্টে আপসোসের স্বরে বলে উঠল শাম্‌লী, আর একটু হলেই ধরে ফেলত। এরপর আবার ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল শাম্‌লীর, 'অ্যাই, তুমার জামাট' দাও দিকিনি···' মোহন কোমর থেকে জামাটা খুলে ওর হাতে দিতেই ও সেটাকে জালের মতো ছুঁড়ে কোনো একটা পাখিকে জড়িয়ে ফেলতে চাইল, দু'বার চেষ্টা করল, পারল না।

মোহন একটা জিনিস করল, পাখিধরাদের করতে দেখেছিল সে। গাছের ডালপালা ভেঙে মাথায় জড়াল, ডান হাতেও। লম্বা কুশ ঘাস আর গাছের গায়ে ওঠা লতা ছিঁড়ে দড়ির কাজ চালাল। শাম্‌লীকে বলল দূরে সরে যেতে। একটা ঝোপ-ঝোপ শালগাছের ডালপালার মধ্যে ঢুকে দাঁড়িয়ে রইল। অপেক্ষা করতে হল। একটা টিয়া ওর মাথার ওপর পা রেখে ডানার ঝাপটা দিয়ে উড়ে গেল, মোহন ধরবার চেষ্টা করল না। ধরতে হয় চোখে, অর্থাৎ চোখে দেখা এবং ঠিক মুহূর্তে হাতের কাজ করা চাই, মাথার ওপর দেখবে কি করে।

তার পরেরটা বসল ওর মাথায় নয়, সামনের ছোট্ট ডালটায়। বসছে—যখন কচি ডালটা নুয়ে পড়ছে পাখিটার ভারসাম্য স্থির হবার আগেই, তখনই বাঁ হাত দিয়ে খপ করে ধরে ফেলল মোহন। পাখার ঝাটাপটি আর তীক্ষ্ণ ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দ, তারই সঙ্গে মোহনের ডাক, 'শামলী, ধরেছি ·'

একটা দমকা হাওয়ার মতোই বনের ভেতর থেকে ছুটে এল শাম্‌লী, 'আমাকে দাও, আমাকে ··' ওর চুল খুলে গেছে, খুশীতে-আকাঙ্ক্ষায় ওর সমস্ত মুখখানা ফুটফুট করছে। ওকে দেবার জন্যই মোহন ধরেছে পাখিটা, 'নে, নে তুই···', দিলও তার হাতে।

'হাই, কী হল · ' শাম্‌লীর উদ্যত হাত শূন্যে ভাসছে, মুখখানা হাঁ-করা, চোখ দুটো বিলীয়মান পাখিটার দিকে তাকিয়ে ঘূর্ণিত, 'অ মা-গ', তুমি ছাড়ি' দিলে কেনে ?'

মোহন শাম্‌লীর হাতে দিয়েছিল পাখিটা, কিন্তু ঠিক কোনখানটায় ধরতে হবে তা শাম্‌লী জানত না, মোহনও সতর্ক করে দেবার কথা ভাবেনি। শাম্‌লী যেই পাখিটার পায়ে ধরেছে, মোহন ছেড়ে দিয়েছে তখন, অমনি ডানার ঝাপট আর তীক্ষ্ণ ঠোঁটের ঘা দিয়েছে পাখিটা, অতর্কিত আঘাতে, তা সে যত সামান্যই

হোক, যান্ত্রিকভাবে হাতের মুঠি আলগা হয়ে গেছে।

মোহন যখন বুঝল ব্যাপারটা তখন একই সঙ্গে আশ্চর্য হল এবং রেগে উঠল, 'আমি ছাড়ি' দিলম! তুমি ধরলে নাই, উই কবে পাখির পায়ে ধরে, ড্যানায় ধরতে হবেক নাই?'

'তুমি ত ড্যানায় ধরে রইলে, আমি ভাল কবে ধরব তবে ত তুমি ছাডবে, তা লয়, তুমি ছাডি' দিলে কেনে·' ওকে একটা আচম্‌কা ঝাঁকানি দিল শাম্‌লী।

রাগে অভিমানে আক্রোশে পথ ধরল শাম্‌লী, মোহনও এগোল। পাখিটা হাতছাড়া হতে সেও কম বিমর্ষ হয়নি। হঠাৎ ও প্রস্তাব করল, 'দাঁডা, তোকে আর একট' ধরি' দিব···'

ডাল ভাঙতে আরম্ভ করেছিল মোহন, শাম্‌লী ঝাঁপিয়ে পডে ছিটকে দিলে ভাঙা ডালগুলো, 'না, ধরতে হবেক নাই তুমাকে, ধরতে হবেক নাই··'

কাঁচুমাচু মুখ করে নিরস্ত হল মোহন, এটা-ওটা বলে শাম্‌লীকে সান্ত্বনা দেবাব চেষ্টা করলে। ওর হাতখানা মোহন আগেকার মতো ধরতে গেল, হাত ঝিনকে সরিয়ে নিল শাম্‌লী, নিজেও ছিট্‌কে পিছিযে এল এবং পিছু পিছু চলতে লাগল।

আটত্রিশ

কিছুক্ষণ পরেই ওরা সেই গুহাঘরের সামনেকার পাথুবে চত্বরটায় এসে পৌছাল। জায়গাটা সত্যিই একটা আশ্রয়েব মতো, এদিক থেকে খোলা জায়গাটায় ঢুকবার মুখে ঝোপজঙ্গল আছে, বেশ কতকগুলো বড বড় শাল-শিরিষ দাঁডিয়ে আছে বেড়ার মতো, একটা পুরনো ঝাঁকডা আমগাছও। চত্বরের ওদিকে বাঁ দিকের কোণে গুহাঘর, তার ডান দিকে একটা গাছের তলায় একদিন শাম্‌লী জামাকাপড পোডাতে দেখেছিল। ঘরটার ডান দিকে বাঁ দিকে পাথরের পাহাড ক্রমে উঁচু হয়ে গেছে, দেয়ালের মতো ঘিরে রেখেছে যেন। পাহাড়ের ঢালুতে বেশ ঘন ঝোপঝাপ, মাঝারি গাছও আছে, বাঁ দিকে সব চেয়ে বড হচ্ছে অশথ গাছটা, তাছাড়া শিমুল শালও আছে।

বিকেলে সমস্ত জায়গাটা স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল, চত্বরে কোথাও গাছের ছায়া, কোথাও আলো। বাতাসে গাছের নড়া-চড়ার সঙ্গে ছায়াও কাঁপছে, দুলছে। পাখিরা

গাছের ঝিকিয়ে-ওঠা মাথায় ঘুরছে, ডালে বসছে, মাঝে মাঝে ডাকাডাকি করছে।

বলাইকে দেখা গেল। একটা খাটো ধুতি কোমরে, খালি গায়ে কাঁধের ওপর গামছা, ঘরটার মুখে পিছন ফিরে বসে আছে। মোহন মুখে আঙুল রাখল শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে, তারপর পা টিপে টিপে এগোতে লাগল, একটু এগিয়ে শ্যামলীকে ডাকল হাতের ইশারায়, কিন্তু শ্যামলী গেল না, ওখানে একটা গাছের গুঁড়িতে ডান হাতখানা ফেলে দাঁড়িয়ে রইল, পাতার ফাঁক দিয়ে একফালি আলো ওর মুখে, বুকে এসে পড়েছে।

একেবারে পিছনে গিয়ে পায়ের শব্দ করল মোহন, হেসে উঠল, মাটিতে যে তীরের ফলাটা ঘষছিল বলাই, সেটা বাগিয়ে চকিতে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু মোহনকে দেখে সেও হেসে উঠল।

মোহন বললে, 'অস্তরে শান দিচ্ছ আর ইদিকে একেবারে পিছনে এসে শত্তুর দাড়াইছে, খালেই তুমি শত্তুর মারবে ভাল।'

'হেঁ-হেঁ ' বেকুবের মতো হাসল বলাই, কাঁধ থেকে গামছাটা নিয়ে মুখ মুছল। বললে, 'বনাদা এসছিল, তুমার লেগে বসে বসে চলে গেল তারপর।'

'বনাদা এসছিল? কিছু বললে?' মোহনের কণ্ঠে একটা ভিন্ন ধরনের আগ্রহ।

'বললে যে সাঁঝ বেলাকে ইথেনে আসবেক, আট ল'জন হবেক।'

'আচ্ছা···' কী একটা চিন্তা করল মোহন।

বলাই মাটি থেকে একটা শক্ত, মোটা কাঁড় তুলে ওর হাতে দিল, 'দেখ ত, মহন, কী গল্তি আছে না কি এইট'র, গুণ লাগাইতে পারছি নাই।'

'কেনে ·' ভুরু কুঁচকোল মোহনের, কাঁড়টা হাতে নিয়ে পরীক্ষার দৃষ্টিতে দেখে বললে, 'ঠিক ত আছে, গল্তি নাই।'

'গুণ লাগাও দিকি কেনে '

বলতে বলতে উল্টো দিকে বনের মধ্যে চোখ পড়েছে বলাইয়ের, 'আ গ', বউদিদি যে, উথেনে দাঁড়ায় আছ কেনে, ইথেনে এস · '

মুখে এক ধরনের হাসি টেনে শ্যামলী সামনের ঝোপটা কাটিয়ে পায়ে পায়ে চত্বরটা পেরিয়ে এল, 'তুমাদের ভিতরে আমি এসে কী করব, তুমরা সব এখন যুদ্ধ লাগাইবে, হঁ · '

'তা বটেক · ' বলাই কথাটা না বুঝেই হাসল।

মোহন ইতিমধ্যে কাঁড়টা বাঁকিয়ে গুণ দিয়েছে, 'একটুন গায়ের জোর লাগে হে, বুঝলে ··' বলাইয়ের পায়ের কাছে কাঁড়টা ফেলে দিয়ে বললে।

'সাবাশ!' বলাই মোহনের পিঠে একটা থাপ্পড় দিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কাঁড়টার দিকে। তারপর মোহনের ডান হাতের পাঞ্জাটা ধরে টেপাটেপি করে বললে, 'ইদিকে ত বেশ লরম, উদিকে জোর আছে ঠিক!'

ওরা দুই বন্ধুতে হাসল, কিন্তু শাম্‌লী চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার মুখে সেই একই রকম ভাব। বলাই বোধ হয় কিছু বুঝল, ও প্রস্তাব করল, একবার মোহন আবার শাম্‌লীর দিকে তাকিয়ে, 'বউদিদি, তুমার মনট' ভাব-ভার কেনে, এস দিকি খেলি একটুন··' বলে ওকে চত্বরের মাঝখানের দিকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এল।

'অ মা গ', আমি লয় বউ, আমি আবার খেলব···' এবার শাম্‌লী হাসল ঘাড় বাঁকিয়ে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও টানা হয়ে যেতে যেতে।

'কী আবার বউ, এক বত্তি মেয়ে! আমাদের শহরে···' হঠাৎ হোঁচট খেয়ে বসে পড়ল বলাই, পায়ের আঙুলটা দেখতে লাগল, কথাটা চেপে গিয়ে।

মোহনও উৎসাহিত হয়ে উঠল প্রস্তাবে, ওদের কাছে এসে বললে, 'কী খেলা যায়, তিন জনে···'

'কানামাছি···' বলাই উঠল না শুধু, লাফিয়ে উঠল, কাঁধের থেকে গামছাটা টেনে শাম্‌লীর চোখ বেঁধে দিলে।

'উঃ, লাগছে, লাগছে···' শাম্‌লী বলে উঠল।

বলাই কোনো কথা শুনল না, বেশ জোরে বেঁধে দিল এবং মোহনের সঙ্গে ওর চার দিকে ঘুরতে লাগল, 'কানামাছি ভোঁ-ভোঁ···'

মাঝে মাঝে শাম্‌লীর মাথায় টোকা মারছে আস্তে করে, কখনো চুল টেনে দিচ্ছে। শাম্‌লী দুটো হাত আনাড়ির মতো আন্দাজে চারদিকে মেলে ওদের ধরবার চেষ্টা করছে। এ খেলা ওর অজানা নয়, কত খেলেছে। কিন্তু একটু পরেই বিরক্ত হয়ে চোখের বাঁধনটা খুলে ফেলল ও 'দূর ছাই, ভাল্ লাগে নাই···'

ওরা দুজনে মুহূর্তের জন্য বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল, 'কেনে, কী হল···'

কিন্তু ওদের তখন ঝোঁকে পেয়েছে। এবার মোহন প্রস্তাব করল, 'তবে লুকাচুরি খেলা যাউ, কী বল শাম্‌লী···তুই চোর হবি, আমরা লুকাব, হ ঠিক···' সঙ্গে সঙ্গে সব ব্যবস্থা করে ফেলল মোহন, 'তুই ঘরের ভিতরে যা, আমরা লুকাব, কুক্ দিলে তবে বেরাবি, যা···'

শাম্‌লী পায়ে পায়ে ঘরটার মধ্যে ঢুকল, এ ঘরে আগেও সে এসেছে এক আধ বার। ঘর তো ঘর, আসলে একটা গহ্বরের মতো হয়েছে প্রকৃতির খেয়ালে,

দেয়ালে দুই পাথরের জোড় মুখে জল চুইয়ে পড়ার দাগ, পাথরগুলোর কোনোটা বেরিয়ে আছে, কোনোটা ঢোকানো। ছাদটা সমান নয়, একটা দিকে হঠাৎই অনেকটা নিচু।

বাইরে থেকে ডাক ভেসে এল, 'কুক্' 'কুক্', এখান থেকে কেমন চাপা অস্পষ্ট শোনায়।

আলোর থেকে আসবার পর চোখে ঝাপসা ছিল, সেটা কেটে যেতে স্পষ্ট দেখা গেল সব। মেঝেতে একটা বাবুই দড়ির খাটিয়া পাতা, পাশে জলের কুঁজো আর হাঁড়ি, একটা পুরনো ট্রাঙ্ক, ওর মধ্যে কিছু আছে বোধ হয়, দুটো বল্লম দেয়ালে ঠেস দেওয়া, তীর ধনুক, টাঙ্গি, দা কাস্তে সব পড়ে রয়েছে এখানে-ওখানে।

'কুক', 'কুক'—

জিনিসগুলো শাম্লীর অচেনা নয়, ঘরের মধ্যেই অহরহ দেখেছে সে, কিন্তু এখানে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে কী রকম লাগল। বাইরে আবার ডাক পড়ল। বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, ও, অনিশ্চিতের মতো।

'কুক' 'কুক' ডান দিক বাঁ দিক থেকে দুটো ডাক। যতই বদলে ডাকুক শামলী বুঝতে পারল, ডান দিকেরটা মোহনের গলা, অশথ গাছের আড়ালে পাহাড়ের ওপর দিকটায় সে আছে, তার বাঁ দিকে নিশ্চয় ওই গাছটার আড়ালে বলাই।

'কুক', 'কুক' –

একটু হাসল শাম্লী কিন্তু পরক্ষণেই নরম মুখে বসে পড়ল সেই গুহামুখের কাছের জায়গাটাতেই। বারংবার ওদের 'কুক্' ডাকে সাড়া দিল না, বরং ও আর একটা খেলা শুরু করল। আশেপাশে পাথরের নুড়ি পড়ে আছে অজস্র ছোট মেয়েদের মতো তার দু-চারটে নিয়ে ফিঁক-লুফা খেলতে লাগল। একটা নুড়ি শূন্যে কতকটা ছুঁড়ে মাটির ওপর হাতের তেলোর চাপড় দিয়ে তারপর সেই হাতেই ছুঁড়ে-দেওয়া নুড়িটা ধরে ফেলল। সেটার পর আর একটা। এই ভাবে নুড়িগুলো লুফে নিয়ে পরপর সাজিয়ে একটা চূড়ার মতো করল শাম্লী। তারপর থেমে গেল।

'কুক্' ডেকে ডেকে প্রথমে অধৈর্য হয়ে উঠল বলাই। লুকানোর জায়গা থেকে মুখ বের করে মুখোমুখি দেখল শাম্লীকে। শাম্লী দু' হাতে হাঁটু বেড় দিয়ে ধরে সাজানো নুড়ির পাশে বসে রয়েছে, চিবুকটা একটা হাঁটুর ওপর রাখা, দু' পাশে একরাশ চুল ছড়িয়ে রয়েছে, বিকেলের আলো পড়েছে তার মুখের ওপর।

বলাইয়ের বুকের ভেতর ধক করে লাগল, চকিতে ওর সামনে থেকে পর্দাটা সরে গেল যেন, শাম্‌লীর খেলাতে একটুও মন নেই। আর, তার অন্য মানেটা বুঝতেও ওর অসুবিধে হল না। সেও যুবক, বুকের ভেতর একটা তীব্র অস্বস্তির মতো লাগল। আস্তে আস্তে লুকানোর জায়গা থেকে বেরিয়ে এল ও, ভরাট স্বরে ডাকল, 'মহন…'

'কী, বলাই, তুই বেরি' এলি কেনে…' মোহনও অশথ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে এল।

'মহনদা, একট' কাজের কথা তুমাকে বলা হয় নাই, বনাদা বলছিল জঙ্গলের বাইরে দু'ট' অচিনা লোক দেখেছে, একটুন সঁতর থাকতে বললেক '

'হুঁ, তা কী ‥' মোহন সহজ মুখে বললে কিন্তু ওর কুঁচকানো কপালে একটা ছায়া পড়ল।

'না, তাই বলছি, তুমরা থাক কেনে ইখেনে, আমি একটুন টহল দিয়ে এসি…' বলতে বলতে এগোল সে, এবং মোহনের নিষেধ অনুরোধ সত্ত্বেও জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে বেড-দেওয়া হাত আর কোলের মধ্যে মুখ লুকিয়েছিল শাম্‌লী. সে একটা কথাও বলেনি। বলাইয়ের চলে যাওয়ায় হয়তো তার সায় ছিল।

একবার চলে-যাচ্ছে বলাইয়ের দিকে, আবার শাম্‌লীর দিকে তাকাল মোহন। তার দিকে পিছন-ফেরা, শাম্‌লীর পিঠের ওপর একরাশ কালো চুল ছড়িয়ে রয়েছে, আর একটা দিনের সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে গেল মোহনের। এগিয়ে গিয়ে পিঠে বিছানো চুলের ওপর হাত রাখল, আর তখনই অনুভব করল শাম্‌লীর দেহটা একটু একটু কাঁপছে।

'শাম্‌লী…' গাঢ় স্বরে বলল মোহন, বসল ওর পাশে, মুখখানা তুলে ওর দিকে ফেরাবার চেষ্টা করল।

'না ‥' অশ্রুরুদ্ধ চাপা স্বরে ফুঁপিয়ে উঠল শাম্‌লী, কিন্তু পরক্ষণেই মোহনের বুকের ওপর পড়ে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল।

'শাম্‌লী, শুন তুই…' এখন কাঁধের ওপর ফেলা ওর শাটটা দিয়ে শাম্‌লীর চোখ মুছিয়ে দিলে মোহন, গালে পিঠে গলায় ওর আদরের হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগল, ওর মুখ শাম্‌লীর ঘন চুলের ওপর।

কতক্ষণ পরে একটু শান্ত হয়ে এল শাম্‌লী, মোহন বললে, 'চল, ঘরের ভিতরে যাই ‥'

শাম্‌লীর পাতলা শরীরটা জড়িয়ে আস্তে আস্তে গুহার ভেতর নিয়ে এল

মোহন, খাটিয়ার কাছে এনে ওকে বুকের ওপর নিলে। একটু পরেই দুটি উত্তপ্ত মুখের উষ্ণ শ্বাস মিলিত হল।

বাঁ হাত ঘাড়ের নিচে ডান হাত হাঁটুর নিচে দিয়ে শাম্‌লীর শরীরটা তুলে নিল মোহন, শাম্‌লী ওর গলা বেড দিয়ে ধরেছে, চোখ দুটো আধো বোজা, এখনো জলের রেশ বোঝা যায়, ঠোট দুটি স্ফুরিত। মোহন জ্বালা-ধরা চোখে দেখল ওকে, দাঁত দিয়ে ওর ঠোট নিল নিজের মুখে— চকিতে শাম্‌লীর ঘন-চুল মাথাটা নড়ে উঠে সমর্পণে স্থির হল।

খাটিয়াব বিছানায় বাখল শাম্‌লীকে, আধশোয়া মোহনেব বাঁ হাতে তাব শরীব বেড দিয়ে ধরা।

'না, অ্যাই, উ আসবেক...'

'কে, বলাই ? না, উ আব আসবেক নাই ·'

মোহনের কথায় মনে হল শাম্‌লীব শবীব আশ্বস্ত, উৎসুক হয়ে উঠল।

ডান হাতে শাম্‌লীর বুকেব ওপব থেকে সবিয়ে দিল লাল শাড়িব আচল-খানা। কাঁচা, লাবণ্যময় দুটি ফলেব মতো শাম্‌লীর বুকখানা অনাবৃত হল, একটু ওপবে রঙিন পুঁতিব মালাব নিচে গলাটা কাঁপছে, মুখখানা বাঁ দিকে ফেরানো। মোহনেব মুখ নেমে এল তাব বুকেব ওপর, শাম্‌লীর শবীবটা আব একটু এগিয়ে এল মোহনেব দিকে।

উনচল্লিশ

তখনো বেশ বেলা আছে। কিন্তু গাছ-গাছালির আড়ালের জন্য চত্বরেব ওপব ছায়া নেমে, গুহাব ভেতর আবছা গাঢ় হয়ে এসেছে। এখন মোহন শুয়ে আছে খাটিয়ার ওপর, শাম্‌লীর কোলে মাথা রেখে। শাম্‌লীব মুখে আবিষ্ট তৃপ্তির হাসি, তাব বাঁ হাতটা পড়ে আছে মোহনেব বুকেব ওপব, ডান হাতেব আঙুল মোহনের চুলের ভেতব ঘুরে বেড়াচ্ছে। শাম্‌লীর কানে আসছে তখন বাইরের পাখ-পাখালির ডাক, ও আস্তে আস্তে বললে, 'আমার উব্‌বে গঁসা করিছ, তুমি ?'

উত্তরে মোহন ডান হাত উঠিয়ে শাম্‌লীর গলাটা বেড দিয়ে ধবল একবার, তাবপর চিৎ অবস্থা থেকে পাশ ফিরে শুল। শাম্‌লী মোহনের মুখখানা একটু তুলে নিজের থেকে একটা চুমু দিয়ে হেসে ফেলল।

একটু পরেই উঠে পড়ল মোহন।

'কী ' সংশয়ী চোখে মোহনের দিকে তাকাল শাম্লী।

'কী, ঘরে জ্বালুন নাই মনে নাই? চল দিকি, শুকনা ডাল কাটি, বনাদার সঙ্গে কথা বলে বয়ে নিয়ে যাব…'

'হঁ, মা-গ', তুমার ঠিক মনে আছে…' শাম্লী খিলখিল করে হেসে উঠল এবার।

মোহন বিস্রস্ত ধুতিটা মালকোঁচা মেরে পরল। এ কোণে ও কোণে তাকিয়ে দা একটা তুলে নিয়ে ধার পরীক্ষা করল, তারপর কোমরে গুঁজল সেটা।

বাইরে খোলা জায়গাটায় বেরিয়ে এসেই বুঝল, সন্ধ্যার তখনো একটু দেরি আছে, গাছপালার মাথায় আলো। মোহন এপাশে ওপাশে গাছগুলোর দিকে তাকাতে লাগল শুকনো ডালের সন্ধানে।

'হাই দেখ, তুমাকে ডাকিছে, তুমার বন্ধু লয়?…'

ঠিক সেই মুহূর্তে দূরে বনজঙ্গলের ভেতর থেকে একটা রুদ্ধশ্বাস ডাক ভেসে এল, 'মোহন…', এই রকম ডাক আর একদিনও শুনেছিল সে।

'মোহন…মোহন, কুত্তার দল…' ডাকটা যেন গাছগাছালির ভিতর দিয়ে ঢেউ তুলতে তুলতে সবেগে বেরিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলির আওয়াজ, তারপর কেউ আর ডাকল না।

গাছের মাথা থেকে পাখিগুলো আকাশে উঠে ঘুরছে, বাতাসের এক একটা ঝটকা ডালপালার মধ্যে ঝরঝর করছে।

উৎকর্ণ, চকিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মোহন, তার সমস্ত শরীর কাঠ হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো জ্বলছে যেন।

মুহূর্তে লাফ মেরে গুহাঘরটার মধ্যে ঢুকল মোহন, এক গোছা তীর নিল হাতে, গুহার মুখেই পড়ে থাকা সেই তখনকার গুণ দেওয়া কাঁড়টা তুলে নিল।

বাইরে বেরোতেই শাম্লীর মুখোমুখি হল সে, এখন শামলীর চোখে আর এক রকম দৃষ্টি, বিড়ালের চোখের মতো জ্বলজ্বল করছে, বুনো প্রাণীর মতোই বিপদের আঁচ করতে পেরেছে সে, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। এগিয়ে এসে মোহনের বাহুতে আঙুল দিয়ে এক রকম করে খোঁচা মারল, 'কী হইচে?…'

'শত্তুর, শত্তুর এসে গেছে…পুলিস হবেক, লয় মেলেটারি…' বলে মোহন ডান দিকে পাহাড় মতো জায়গাটায় ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে উঠে গেল, তখন লুকোচুরি খেলার সময় যে অশথ গাছটার আড়াল থেকে 'কুক্' দিচ্ছিল, সেখানে গিয়ে অস্ত্রগুলো রেখে এল। আরো অস্ত্র নিয়ে যাবে—চত্বরে নেমেই শাম্লীর হাতখানা ধরল মোহন, 'শাম্লী, তুই আমার বউ, সনা লেঠেলের বিটী, তুই

কুত্তাগুলার কলজে ফুটা করতে পারবি নাই ?'

'পারব ' শাম্লীর আর এক কণ্ঠস্বর, কিন্তু চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। মুহূর্তে তারপর বদলে গেল সে, এলোচুল টান করে বাঁধল, শরীর পেঁচিয়ে কোমরে জড়াল শাড়িটা, তারপর মোহনের সঙ্গে গুহার ভেতর ছুটে গেল সেও। একটা হেঁসো আর একটা বল্লম নিয়ে বেরিয়ে এল।

'দুজনে দুজাগায়, গুহার ভিতরে ঢোক করে থাকবি তুই ? না, উখেনেই পথমে গুলি করবেক উগারা '

'তুমি তুমার জাগায় যাও কেনে, আমি আমার জাগা দেখে লিব ' চাপা স্বরে শাম্লী বললে।

মোহন সায় দিয়ে উঠে গেল ওপরে, অশথ গাছটার আড়ালে। শাম্লী খোলা জায়গাটার চারদিকে একবার চোখ চাবাল, বাতাসে শয়তানের গন্ধ পেয়ে বন্য জন্তুর যেমন হয়, তেমনি ওর চোখের তারা কাঁপছে। একটা জায়গা ওর মনে লেগে গেল, অশথ গাছটার নিচেই একটা ঝাঁকড়া, চাবা শালগাছের আড়ালে বসল ও। পিছনে ওপর থেকে মোহন ফিসফিস করে বললে, 'ঠিক আছে···'

শাম্লী হেঁসোটা রাখল পায়ের কাছে ফেলে, বল্লমটা গাছের গুঁড়ি বরাবর লুকিয়ে শক্ত করে ধরে রাখল। হঠাৎ ওর নজর পড়ল, গুহাঘরের সামনে চত্বরে ওরই সাজিয়ে রাখা নুড়িগুলোর ওপর। একবার ভাবল, ছুটে গিয়ে আঁচলে করে কতকগুলো নিয়ে আসে, কিন্তু বোধ হয় তার সময় নেই, ঠিক হবে না। কিন্তু দরকারও নেই, চোখ ফেলতেই দেখল পায়ের কাছে এপাশে ওপাশে তেমন অনেক ধারালো নুড়ি মাটির সঙ্গে মিশে আছে। তাই কতকগুলো জড়ো করল সে, আর কী ভেবে নিজের মনেই ঘাড় নাড়ল।

সময় কাটতে লাগল। এখন শাম্লীর তীক্ষ্ণ চোখ স্থির, খোলা চত্বরটার ওপর, তার ওপারে গাছগুলোর ভেতরে, বুঝল যে মোহনও সেদিকে তীর লক্ষ করে রয়েছে। বনের ভেতর কোথাও একটু নড়ছে, কি শব্দ হচ্ছে, আর বল্লম-ধরা শাম্লীর মুঠি শক্ত হয়ে উঠছে।

হঠাৎ পাখিগুলো ডেকে চঞ্চল হয়ে উঠল, এ ডালে ও ডালে লাফালাফি করে থেমে গেল, একটা খরগোস চত্বরের মাঝখানে ছুটে এসে অনিশ্চিতভাবে মাথা-তুলে দাঁড়াল একবার, তারপর বাঁ দিকে ছুটে বনের মধ্যে ঢুকে গেল। ওটা যে এদিকে আসতে গিয়েও এল না, ওদের অস্তিত্ব কি টের পেয়েছে?—শাম্লী ভাবল।

শাম্লীর তীক্ষ্ণ চোখ কুঁচকে উঠল এক সময়—যেখানটায় সে প্রথম এসে

দাঁড়িয়েছিল আজ, তারই পিছনে ঝোপঝাড়ের আড়ালে কী নড়ে উঠল, দেখল যে একটা জিনিস চকচক করে উঠেছে, পরেই দেখল সেটা টুপির ওপর একটা চাকতি। নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে রইল সে।

খ্‌ট্‌—গ্‌ম্‌—

হঠাৎ পাখির ঝাঁক আকাশে ছিটকে পড়ল, সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ভয়-পাওয়া ডাক। মোহন ঠিকই অনুমান করেছিল, গুহার মুখটা লক্ষ করে ওরা পরপর অনেকগুলো গুলি ছুঁড়ল, তারপর খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর রাইফেলের নল উদ্যত করে বুনো শুয়োরের মতো বেরিয়ে এল সৈনিকের উর্দি পরা দুটো লোক, বনজঙ্গল মাড়িয়ে।

আঁক্‌—শব্দ করে টলে উঠল বাঁ দিকের লোকটা, খানিকটা টালমাটাল হয়ে পড়ে গেল, লোকটার চোখে একটা তীর সাঁ করে বিঁধেছে।

'পিছু হঠো···ক্যারি হিম···' মোলায়েম কিন্তু পরিষ্কার, কঠিন স্বরে কে আদেশ দিলে। চকিতে বাঁ দিকে তাকাল শাম্‌লী, কণ্ঠস্বরের দিক আন্দাজ করে, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না।

ডান দিকের লোকটা গুলি ছুঁড়েছে একটা, শাম্‌লীদের লাইনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বোধ হয়, কোথায় গিয়ে লেগেছে। এখন হুকুম পেয়ে পড়ে-যাওয়া লোকটাকে পাঁজাকোলা করে তুলতে গেল সে, সাঁৎ—আর একটা তীর তার বাহুতে বিঁধল। কিন্তু পড়ল না, দমল না লোকটা, অপর বাহুতে তুলে লোকটাকে হিঁচ্‌ড়ে টেনে নিয়ে গেল। পরপর তীর গেল কয়েকটা কিন্তু ঠিক কী হল বোঝা গেল না।

বাঁ দিকে আবার তাকাল শাম্‌লী, কোনখান থেকে কথা বলেছে?—কিন্তু এবারেও কাউকে দেখতে পেল না। সমস্ত বনটা চারদিকে যেন এখন থম্‌কে রয়েছে, পাখিগুলোও ডাকছে না। কী মনে করে চোখ ফেলতে ফেলতে ডান দিকে তাকাল শাম্‌লী, সেখান থেকে পিছনে মোহনকে পেরিয়ে, কিছু যেন দেখতে পেলে, একটা পাথরের পাশে, উঁচুতে। ভালো করে দেখবার জন্য দাঁড়াল শাম্‌লী—আর ওর বুকের ভিতর হিম হয়ে উঠল। একটা সৈনিক নল উঁচিয়ে বাগাচ্ছে, সঠিক টোক করার জন্য, মোহনকে দেখেছে সে, স্পষ্টত মোহন তাকে দেখেনি।

ইক্‌—একটা অস্ফুট শব্দ বেরোল শাম্‌লীর কণ্ঠে, কিন্তু বিদ্যুদ্বেগে মাথার মধ্যে বুদ্ধি খেলে গেল ওর—পায়ের কাছ থেকে একটা পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে নিলে শাম্‌লী, ছুঁড়ল অব্যর্থ নিশানায়। রাইফেলের গুলিও বেরিয়ে গেল, কিন্তু লক্ষভ্রষ্ট,

আর মাথায় চোট লেগে টলে গেল লোকটা, নেড়া পাথরের ওপর সামলাতে পারল না, গড়িয়ে সবসুদ্ধ মোহনের এক রকম গায়ে এসে পড়ল। অদ্ভুত ক্ষিপ্র, কিন্তু অত গায়ে গায়ে রাইফেল চালানো সম্ভব নয়, মোহন কিছু করে ওঠার আগেই তাকে জাপটে ধরল। অগত্যা মোহনকেও তাই করতে হল। কিন্তু ওই ছোট জায়গায় ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে দুজনেই গড়িয়ে পড়ল ওপর থেকে, নিচে শাম্‌লীর জায়গাটায় পড়ে দুজনে দু'দিকে ছিটকে গেল। খুব ঢালু জায়গা দিয়ে মোহন গড়িয়ে গেল একেবারে নিচে চত্বরের ওপর, সৈনিকটা গাছে গাছে ঠোক্কর খেতে খেতে।

অসতর্ক হয়ে পড়ল শাম্‌লী, বল্লমটা দিয়ে সজোরে মারল ওকে, কিন্তু গড়ানো অবস্থায় খোঁচাটা ঠিক জোরে লাগল না।

'মথপড়া, বেজম্মা, কুত্তাবাচ্চা…' পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে, বল্লম তুলে খোঁচাতে খোঁচাতে সেও এক রকম গড়িয়ে চত্বরে এসে পড়ে গেল। এবারে লোকটাকে কয়েক জায়গায় গাঁথতে পেরেছে।

মোহন ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে কিন্তু বন ফুঁড়ে ততক্ষণে বুটের অসম্ভব শব্দ করতে করতে জনা পাঁচ-ছয় বেরিয়ে এসেছে।

'মাং মাং শ্যুট করনা, পাকড়ো…' সেই বাঁ দিকের থেকে বেরিয়ে এল ওদের ক্যাপ্টেন, তার হাতে রিভলবার।

উদ্যত ফণার মতো এগিয়ে আসতে লাগল নলগুলো, আবার হুকুম হল, 'মাং শ্যুট করনা…'

মুহূর্তে ব্যাপারটা ঘটে গেল, ওরা ভেবেছিল মোহন এখন নিরস্ত্র, মোহনেরও প্রথম লহমায় নিজেকে তাই মনে হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর কোমরে গোঁজা দা-টার কথা মনে হল, সেইটে বের করে লাফিয়ে পড়ল ও, ছুঁড়ে মারল ক্যাপ্টেনের দিকে।

'মী গড…' বেতের মতো বেঁকে পড়ল ক্যাপ্টেন, কিন্তু বাঁ হাতটা আড়াল না দিয়ে উপায় ছিল না, জখম হতেই হল।

এরপর ওদের দুজনকে পাকড়াও করতে আর কোনো অসুবিধে হল না।

চল্লিশ

ক্যাপ্টেন নরীন্দর সিন্‌হা ছিমছাম ধরনের লোক, সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সের তুলনায় তাকে বেশ কাঁচাই মনে হয়। লম্বায় ছ'ফুটের মতো, পাতলা, অসম্ভব ফর্সা চেহারা, পরিপাটি করে আঁচড়ানো কোঁকড়া চুল, এতখানি ছোটাছুটি সংঘর্ষের পরও কেবল একগাছি চুল কপালের ওপর এসে পড়েছে—এই কোঁকড়া চুল দেখেই শাম্‌লী চিনল যে লোকটা সেদিন রাইস মিল থেকে বেরিয়ে কালো গাড়িতে উঠেছিল। নরীন্দরের ঠোঁট দুটো লালচে, পুরুষের ঠিক সেরকম হয় না, তার ওপর একফালি সরু গোঁফের রেখা, বেশ ঘন কালো উজ্জ্বল, ডান গালে আঁচিল, কথা বলে পরিষ্কার কণ্ঠস্বরে, মোলায়েম কিন্তু জোর আছে।

নরীন্দর সিন্‌হার আরো জোর আছে হুকুম তামিল করার এবং পাল্টা দাবী করার যে তারও হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে। মোহনকে তারই নির্দেশে বেঁধে ফেলা হয়েছে, দুই হাতে, দুই পায়ে, একদিন যে গাছের তলায় বলাইয়ের জামাকাপড় পুড়িয়েছিল, সেই গাছটার সঙ্গে। আগাগোড়া তাকিয়ে রইল ক্যাপ্টেন, চোখ দুটো একটু কটা, কিন্তু দৃষ্টি সজীব আর তীক্ষ্ণ, আত্মবিশ্বাস আছে।

শাম্‌লীকে বাঁধা হয়নি। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে দুজন শক্ত করে ধরে রয়েছে তার দুই হাত। মোহনের দিকে মুখ, ক্যাপ্টেনের ডান দিকে কিছুটা দূরে দাঁড় করানো হয়েছে তাকে। ক্যাপ্টেন শান্ত দৃষ্টিতে এবার তার দিকে তাকাল, শাম্‌লী চেষ্টা করছে হাত ছাড়িয়ে নেবার, 'কুত্তার বাচ্চা, তুদের শিয়াল দিয়ে খাআব, তুদের গত্তয় পুঁতব…', কিন্তু এখন কাঁপা-কাঁপা আক্রোশের মতো এপায়ে-ওপায়ে করছে, ওর বিস্রস্ত, লাল শাড়িখানা, তার বিয়ের শাড়ি, ডান দিকের বুকের থেকে খানিকটা সরে গেছে, ঝাঁকড়া কালো চুল মুখচোখের ওপর এসে পড়েছে, সরাবার উপায় নেই, মাথা ঝিনকে শাম্‌লী চোখের ওপর থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে, গলায় শব্দ করছে মাঝে মাঝেই, ক্রুদ্ধ সাপিনীর মতো।

নরীন্দর সিন্‌হা রিভলবার পুরল খাপের ভেতর, পকেট থেকে রুমাল বের করে বাঁ হাতটা বাঁধবার জন্য চেষ্টিত হল। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মধ্যে বেশ গভীর হয়ে কেটে গিয়েছিল। একজন ইতিমধ্যে তার ব্যাগ থেকে ব্যাণ্ডেজ

এনেছিল, হাত নেড়ে চলে যেতে বললে, 'অ্যাটেণ্ড টু দেম ·', চোখের দৃষ্টিতে বনের দিকে ইঙ্গিত করল ক্যাপ্টেন, প্রথমে যে দিকে আহত দুজনকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুজন সিং যে শামলীর বল্লমের খোঁচায় জখম হয়েছিল সেও ক্যাপ্টেনের নির্দেশে খোলা জায়গাটা থেকে সরে গেছে।

হাতটা রুমালে জড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই রক্তে ভিজে উঠল, সে দিকে একবার তাকিয়েই মোহনের দিকে চোখ তুলল ক্যাপ্টেন, সঙ্গে সঙ্গে যেন চমকে উঠল, চোখাচোখি হতেই। শাম্‌লীর মতো মোহনের শরীরে কোনো আক্রোশ আক্ষেপ নেই, দেহ স্থির, কঠিন কিন্তু তার চোখ যেন ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে ক্রোধে ঘৃণায় অকম্প শিখার মতো জ্বলছে।

মুহূর্তের জন্য ভিতরে সমতা হারাল যেন, তারপর ক্যাপ্টেনের মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল। যেন কথাগুলোকে দোলাচ্ছে এমনি করে উচ্চারণ করল, মোহন দুলে। গাড়ন ড়লেকা শালাকা বেটা ' তারপর চুলকি ভাবটা ছেড়ে পরিষ্কার গম্ভীর স্বরে হুকুম জারির মতো বলে উঠল, 'মিঃ চ্যাটার্জী, মিঃ অমলেশ চ্যাটার্জী···ডু হুড ডিসওন ইয়ো নেম?'

'হোয়াই শুড আই?'

'অমলেশ চ্যাটার্জী, সান অব হরদেব চ্যাটার্জী, এ স্কুল টিচা অব চাণ্ডারনাগোর, ইউ, আ ব্রিলিয়াণ্ট স্টুডেণ্ট অব প্রেসিডেন্সি কলেজ, ফিজিক্স্ অনার্স, পার্ট ওআন ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, সিন্স লেফ্‌ট্ ইন দ্য থার্ড ইয়া ডু ইউ অ্যাড্‌মিট?'

'নাথিং টু কনট্রাডিক্ট

'দিস প্লাজেস মী এনর্‌মাসলি, আই অলসো বিলংড্ টু দ্যাট কলেজ, উইথ অনার্স ইন কেমিস্ট্রি, উই আর দেন ব্রাদার্স, এ?'

'নো, দ্য সেম গ্রাউণ্ড্ নারচারিং এ লিলি অ্যাণ্ড শেলটারিং এ ভেনমাস স্নেক '

'আই সী ' ক্যাপ্টেনের মোলায়েম কণ্ঠস্বর একটু ভাঙা-ভাঙা শোনাল কিন্তু মুখখানা উঠল কঠিন হয়ে।

চেঁচিয়ে উঠল শাম্‌লী, এতক্ষণ অস্থির হয়ে উঠছিল ও, 'কী বুলছ তুমরা, মহন? আমি বুঝাতে লারছি, আমাকে বল কেনে···'

মোহন শাম্‌লীর কথা বলা আশঙ্কা করেনি, চকিতে তার দিকে তাকিয়ে ওর চোখের দৃষ্টি কেঁপে গেল।

তারপর স্থির চোখে তাকাল নবীন্দরের দিকে, 'ক্যাপ্টেন নবীন্দর সিন্‌হা,

অব কম্প্যানি নাম্বা ফর্টি সেভ্ন, ডু ইউ ডিসওন্ ইয়ো নেম অ্যাণ্ড স্ট্যাটাস ?’ যেন ক্যারিকেচার করছে এমনি করে কথাগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে বললে মোহন, ক্যাপ্টেন চমকে উঠল।

মোহন তার চমকটা উপভোগ করে তারই দিকে তাকিয়ে কিন্তু শাম্লীকে উদ্দেশ করে বললে, ‘ক্যাপ্টেন আমার পরিচয় জানতে চাইছিল…আমার নাম অমলেশ চট্টোপাধ্যায়, আমার বাবা হরদেব চট্টোপাধ্যায়, চন্দননগরে আমার বাড়ি, আমি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের খুব ভালো পড়ুয়া।’

একটা অঘটন ঘটল। ইংরেজি কথাগুলো চত্বরে ঘিরে থাকা সৈনিকেরা শাম্লীর মতোই ঠিক বুঝতে পারছিল না, যে দুজন শাম্লীকে ধরে রেখেছিল তারাও। বাংলা শুনে চমকে উঠেছিল, হয়তো একটু অসতর্ক হয়েছে। আর শাম্লী—তার লিকলিকে শরীরটা বাঁকিয়ে প্রচণ্ড হ্যাচকায় হাত দুটো ছাড়িয়ে নিলে, এক ছুটে গিয়ে মোহনের কাছে পৌঁছাল, বেঁধে-থাকা মোহনের খোলা বুকের ওপর মুখ রেখে তাকে জড়িয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল ও, মুখ ঘষতে ঘষতে বলতে লাগল, ‘মহন, মহন, তুমি আমাকে বল নাই কেনে, তুমার নাম বা বুললে. অম অমলিশ, না, আমার মহন…’ শেষ হল না, শাম্লীর চোখের জলে ভেজা মোহনের বুক থেকে কেড়ে নিল ওকে।

সুজন সিং, যে লোকটা শাম্লীর বল্লমের খোঁচায় আহত হয়েছিল, সে ইতিমধ্যে সম্ভবমতো ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ক্যাপ্টেনের পাশে এসে স্যালুট ঠুকে দাড়িয়ে ছিল, এখন দড়ি নিয়ে এগিয়ে গেল, শাম্লীকে বেঁধে ফেলার জন্য। ক্যাপ্টেন ডান হাত নেড়ে ইঙ্গিতে বারণ করল। রক্তাক্ত । হাতটা যন্ত্রণা দিচ্ছে বেশ, আরো রক্ত পড়া বন্ধ করবার জন্যই বোধ হয় কনুইয়ের কাছে মুচে মুঠিটা ওপরে তুলে রাখল, তাতে ক্যাপ্টেনকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দেখাচ্ছিল।

‘মিঃ চ্যাটার্জী, ইফ্ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, আপনার পার্সন্যাল হিস্ট্রি আমাদের জানা, আপনি স্কুল থেকেই স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত, খুব মর্যালিস্ট ছেলে, আই ওআণ্ডা, হাউ ডু ইউ রেকন্সাইল্ বিবেকানন্দ উইথ্ ইয়ো লেনিন, অ মাও-সে-তুং, অ্যাণ্ড দিস ভায়লেন্স ?’

‘ফা, ফা বেটা স্থান ইউ হিপক্রিটস্ রেকন্সাইল ইয়ো গান্ধী উইথ্ দিস নেকেড ভায়লেন্স ইউ পারপ্রিটেট্ !’

‘আর বিবেকানন্দ-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথের স্ট্যাচু আপনারা ভাঙছেন, বিকৃত করছেন…’

‘মিথ্যে কথা, ভাঙছ বিকৃত করছ তোমরাই, তোমাদের মতো করে তাঁদের

দেখাচ্ছে, আমরা সেই মিথ্যে দেখানোটাই ভেঙে তাঁদের একটা রাইট পার্স্পেক্টিব দিতে চাই।'

'মিঃ চ্যাটার্জী, আপনি আমাকে 'তুমি' বলছেন, আমি কিন্তু আপনাকে শ্রদ্ধা করি, মনে করি এক জন ফলেন্ এঞ্জেল…'

'ভণ্ড শয়তানেরা সব সময়ই এই রকম তেলানো ভাষায় কথা বলে প্রলুব্ধ করে।'

'বী ইট, কিন্তু আপনি দেখছেন না যে আপনাদের নেতাদের মধ্যেই নানা ফ্যাকশন, সমাজদার গ্রুপ, ব্যানার্জী গ্রুপ…আপনার মতো খাঁটি ইস্পাতের ছেলেরা কি তাদের দ্বারা ডিউপ্‌ড্ হচ্ছেন না? কার ওপর আপনারা নির্ভর করছেন?'

'এটাও মাথায় এল না, ফুল!…ওঁদের ওপর…' চোখের ইঙ্গিতে বন্দী শাম্‌লীকে দেখান মোহন।

'মহন…' শাম্‌লীর কাতরানো কণ্ঠস্বরে একটা হর্ষ ফুটে উঠল।

ক্যাপ্টেন নরান্দরের উজ্জ্বল, শান্ত মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল, আস্তে আস্তে চোখ ফিরিয়ে তাকান শাম্‌লীর দিকে। অনেকক্ষণ ধরে শাম্‌লীর ওপরই চোখ রাখল ক্যাপ্টেন, কে জানে মোহনের মুখোমুখি হওয়া এই স্থিরবুদ্ধি, দৃঢ় বলে সম্মানিত লোকটির পক্ষে হয়তো সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু চোখ ফেরাল ও, আবার মোহনের দিকেই, 'বাই দি বাই, হু ইজ দিস ইয়ং লেডি? ইয়ো গার্ল্ ফ্রেণ্ড? এ ফ্রাসট্রেটেড, ক্র্যাক্‌হেডেড্ গার্ল্ ফ্রম দ্য সিটি?'

'গার্ল ফ্রেণ্ড! তোমাদের সমাজ-অনুমোদিত উপপত্নী? কখ্‌খনো না, ওঁর নাম শ্যামলী, সনাতন মাহাতোর মেয়ে, আমার বিবাহিতা স্ত্রী।'

'মহন…' একরাশ চুল মুখের ওপর থেকে ঝিনকে ফেলে শাম্‌লী কৃতজ্ঞতায় হাসল।

'বিবাহিতা স্ত্রী! মাহাতোদের মেয়ে!' ক্যাপ্টেন চিবোতে লাগল কথাগুলো, 'আর ইউ শ্যুওর, ইয়ো ওআইফ্ হ্যাজ নট স্লেপ্‌ট উইথ এনি আদা ম্যান? ছোটলোকের মেয়েরা ত তাই করে, বাবুদের কাছে…'

'অন দ্য কনট্রারি, তোমাদের মেয়েরাই পরপুরুষের কাছে শোয়…অ্যাণ্ড ইউ প্যারাসাইট্‌স্, ক্যারিয়ারিস্ট্‌স্, ইউ সেল ইয়ো ডটারস্‌. ওআইব্‌স্ ফ আ লিফ্‌ট্, আ স্ট্যাটাস্…'

আবার চোখের তারা কেঁপে উঠল ক্যাপ্টেনের, গালে থাপ্পড় মেরে লাল করে দিল যেন, কিন্তু নিজেকে সামলে নিল মুহূর্তে, 'লেট গো, আই আস্ক

ইউ, আর ইউ শ্যুওর অব ইয়ো ওআইফ্ ?'

'সার্টেন্লি ! বলি শোন…' দু কথায় মোহন তারক-শাম্লী প্রসঙ্গ বুঝিয়ে দিল ক্যাপ্টেনকে, বললে, 'তোমরা জান ঠগীতে ঘাড় ভেঙেছিল তারক হালদারের, তা নয়, লজ্জায় সে গলায় দড়ি দিয়েছিল।'

'দেন আই কন্গ্রাচ্যুলেট ইয়ো ওআইফ…'বলে নরীন্দর শাম্লীর দিকে ফিরে অভিনন্দনের ভঙ্গিতে মাথাটা ঈষৎ নোয়াল। তারপর পূর্ববৎ মোহনকে বললে, 'ড্যাম্ ইয়ো তারক হালদার। আপনি জানেন গণপতি সিংকে কে মার্ডার করেছিল ?'

'আমি…'

'মহন, মহন…আমি জানতম ! আমি দেখেছিলম !' শাম্লী চিৎকার করে উঠল।

'আপনার সঙ্গে আর কারা ছিল ?'

হেসে উঠল মোহন, কথার উত্তর না দিয়ে হাসতে থাকল।

বারবার চাবুক এসে পড়ছে যেন ক্যাপ্টেনের মুখে, আহত বাঁ হাতটা একবার নামাল, পরক্ষণেই আবার তুলে ধরল।

ওয়েল, আপনার কমরেড সুজিৎ হালদার, ওরফে বলাই, তার ফেট কী হয়েছে জানেন, হু স্টুড্ গার্ড ফ ইউ ?

'দ্য সেম ফেট, তোমার দুজন কুত্তাকে যা আমি দিয়েছি, যে দুটোকে আমি তীর দিয়ে মেরেছি, বিষ-মাখা ফলায়, দেখ গিয়ে এতক্ষণ জাহান্নামে গেছে (চমকে উঠল ক্যাপ্টেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও)…সুজিতের কী হয়েছে আমি জানি কি না…' চিবোতে লাগল মোহন, 'হোআট ডু দ্য মার্ডারার্স্ ডু উইথ দ্য রেভল্যুশনারিজ ? আর আমি এটাও জানি, এখনই তোমরা খুনেরা…'

'স্টপ !' গর্জন করে উঠল ক্যাপ্টেন, এতক্ষণে, 'ইউ নো নাথিং !'

লম্বা, সুন্দর-সুঠাম ক্যাপ্টেনের দেহটা তরঙ্গিত হল যেন, একবার ডান পা আবার বাঁ পায়ের ওপর ভর বদল করল, চোখের দৃষ্টি আনত, মুখখানা টকটকে লাল, গালের আঁচিলটা দ্রুত কাঁপছে। কতক্ষণ পরে চোখ তুলল ক্যাপ্টেন, খাপ থেকে রিভলবারটা ডান হাতে টেনে বের করে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার ডান হাতেই লুফে নিলে। তাকাল মোহনের দিকে আগেকার মতো।

'মিঃ চ্যাটার্জী, আই হ্যাভ্ টু সেট্ল্ উইথ ইউ অন টু স্কোরস্। ইউ স্ল্যাণ্ডার্ড্

আওআ উওমেন। ইউ এ্যাটেম্‌টেড্‌ মার্ডা অন মী হুইচ্‌ আই জাস্ট ম্যানেজ্‌ড্‌ টু ফয়েল উইথ দিস হ্যাণ্ড…' রিভলবারের মুখটা তুলে জখম-হওয়া, তখনও তুলে-রাখা বাঁ হাতটা দেখাল ক্যাপ্টেন।

'লেট ফার্স্ট কাম ফার্স্ট। ইউ টোল্‌ড্‌ মী, ইয়ো ওআইফ, ইয়ো গ্লোরিয়াস হিরোয়িন ডিড নট স্লীপ উইথ এনি আদা ম্যান। গ্রান্টেড্‌। বাট শী শ্যাল লাই উইথ আদার্স দিস ডে, রাইট নাউ · '

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল সুজন, তার দিকে ফিরে ক্যাপ্টেন বললে, 'সুজন সিং, তোমার দাবী আগে, তোমাকেই ওই ছুঁড়ি বল্লম দিয়ে বিঁধেছিল, দেন রহমান, অ্যাণ্ড দেন গণেশ উইল ফলো ইউ…' (শেষের দুজনই শাম্‌লীকে ধরে রেখেছিল)

একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হল যেন, লোকজন সমেত সমস্ত আবহাওয়াটাকে বজ্রাহত করে দিয়েছে।

শান্ত কণ্ঠে ক্যাপ্টেন বলছিল, 'পিছনে ঝোপের আড়ালে নিয়ে যাও, ওয়েল, একলা নয়, তিন জনেই এক সঙ্গে যাও, আ সর্ট্‌ অব আ ওআইল্‌ড্‌ বিচ্‌ অ্যাজ শী ইজ…রাস্কেল, হারামজাদা, শুনতে পাচ্ছ না? আদার্স, অন্যদিকে মুখ ফেরাও · '

মুহূর্তে নির্দেশ পালিত হতে শুরু করল, শাম্‌লীর চিৎকার বনটাকে কাঁপিয়ে তুলল যেন, তিনটে জন্তুর আক্রমণের মুখে একটা বিড়ালীর সমস্ত রোঁয়াগুলো ফুলে উঠেছে, সমানে কামড়াচ্ছে, কামড়াবার চেষ্টা করছে শাম্‌লী, লাথি ছুঁড়ছে। ফাঁকে ফাঁকে 'মহন, মহন · ' বাতাসকে চিরে দিচ্ছে শাম্‌লীর তীক্ষ্ণ, আর্ত কণ্ঠ।

ক্যাপ্টেন শান্ত চোখে মোহনের দিকে তাকিয়ে।

মোহনের শরীর হ্যাচ্‌কায় দড়িগুলোকে ছিঁড়ে ফেলে যেন, প্রথমে হাত দুটো, ফুলে-ওঠা পেশী, তারপর পা, তারপর একসঙ্গে সমস্ত শরীর, বারবার—তারপর দু হাতে ঝুঁকে দেহটা স্থির হল, জ্বলন্ত চোখ ক্যাপ্টেনের দিকে।

একটা অন্তহীন মুহূর্ত যেন দুই জোড়া চোখে স্থির হয়ে রয়েছে, মুখোমুখি, পলক পড়ছে না।

সময় কাটছে, লম্বা সময় কাটছে অন্যদিকে—তার তাল পড়ছে ঝোপের পিছনে শাম্‌লীর বদলে বদলে আসা কণ্ঠের শব্দে। উঁচু চিৎকার ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এল, 'মহন, মহন…' ডাক বন্ধ হল, তারপর গোঙানি, সেটাও মাঝে মাঝে গলায় আটকে যায়, আবার বেরোতে থাকে। তারপর কিছুই শোনা যায় না।

উপযুক্ত সময়ে নিস্তব্ধতা ভাঙল ক্যাপ্টেন।

'মিঃ চ্যাটার্জী···' ডান হাতের রিভলবার শূন্যে ছুঁড়ে আবার আগেকার মতো লুফে নিল নরীন্দর, 'নাউ কামস্ দ্য সেকেণ্ড। ইউ অ্যাটেম্‌টেড মার্ডা অন মী···' রিভলবার তুলে তাক করল সে, 'আপনি দেখবেন আমার হাতের টিপ কেমন। আমার লোকেরা আপনার বাঁধন খুলে দেবে, কারণ চেন্‌ড্‌ লায়নকে আমি শ্যুট করতে চাই না···লায়ন! ইয়েস, আই রেস্‌পেক্ট ইউ···তিনটি গুলি, খুলে দেবার পর আপনি যাই করুন, যেমন অবস্থায় থাকুন, প্রথম গুলি লাগবে আপনার বাঁ দিকের উরুতে, ঠিক মাঝামাঝি, দ্বিতীয় লাগবে ডান দিকের চেস্টে, আপনার জ্ঞান থাকবে তখনো বুঝবার, আমার হাতের টিপ···আর ফাইন্যালি, না, বুকে-হার্টে নয়, মাথায়, ঠিক কপালের ওপর, থ্রু ইয়ো ব্রেন, ইয়েস, ইউ ব্রেনি ইয়ং ম্যান···রেডি···'

ক্যাপ্টেনের ইঙ্গিতে দ্রুত বাঁধন খুলে দিল মোহনের। সিংহের মতোই গর্জন করে লাফিয়ে পড়ল মোহন—হ্যাঁ, ক্যাপ্টেনের দিকেই কিন্তু ওর চোখ পড়েছে গুহাঘরের সামনে শাম্‌লীর সেই সাজিয়ে রাখা নুড়িগুলোর ওপর। সেখানে পৌঁছোতে গেল।

এদিকে ক্যাপ্টেনের তুলে-ধরা অকম্প হাতে রিভলবারের নলটা এক আধ ইঞ্চি স্থান বদল করল ওপরে নিচে, এক সেকেণ্ড পরপর, ওয়ান—টু—থ্রী।

প্রথমে মোহনের ঝড়ো বেগ পাথরে ধাক্কা খেল যেন, দ্বিতীয়ে ওর দেহটা শূন্যে টলে টলে উঠল, তৃতীয়ে আর এক পা সামনে এগিয়েও আধ পাক ঘুরে পড়ে গেল, সেই জড়ো-করা নুড়িগুলোর ওপর, বাঁ হাতটা দেহের নিচে চেপে গিয়েছে।

শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ক্যাপ্টেন। তারপর আস্তে আস্তে এগোল। ঝুঁকে পড়ে দেখল—মোহনের কপালের ওপর, ঠিক মাঝখানে গুলি বিঁধেছে। বাঁ হাতের রুমালটা খুলে ফেলল নরীন্দর, আঙুল ঠেকাল একবার মোহনের কপাল থেকে সদ্য চুঁইয়ে-পড়া রক্তে।

'ওআপস চলো···' নির্দেশ দিল ক্যাপ্টেন। যে দুটো সৈনিক মারা গিয়েছে, তাদের তুলে নিতেও বললে।

ওরা চলতে শুরু করেছে, হঠাৎ ক্যাপ্টেন বিকৃত কণ্ঠে বলে উঠল, 'মুঝে একঠো গ্রেনেড্‌ দো···'

তখনও মোহনের মাথার কাছে দাঁড়িয়েছিল ক্যাপ্টেন। ওরা বুঝল না কিন্তু হুকুম তামিল করল। ক্যাপ্টেন নিজের লোকজনদের একটু তফাতে সরিয়ে

দিলে, তারপর বনের যে দিক দিয়ে তারা চত্বরে ঢুকেছিল সেদিকে ছুঁড়ে মারল গ্রেনেড্‌টা। প্রচণ্ড শব্দের বিস্ফোরণ বনটাকে কাঁপিয়ে তুলল আবার।

'হাঃ-হাঃ-হাঃ···আউর একঠো···' দ্বিতীয়টাও একই রকম ভাবে ফাটিয়ে পাগলের মতো অট্টহাস্য করতে লাগল ক্যাপ্টেন, 'হাঃ-হাঃ-হাঃ···'

তারপর চলে গেল ওরা। চত্বরে পড়ে রইল মোহনের দেহ, আর ঝোপের পাশে ক্রমান্বয়ে ধর্ষিতা, হতচেতন শামলী।

একচল্লিশ

মাস দুই আড়াই পরে, কার্তিক মাসের শেষাশেষি এক সকাল বেলাকার কথা।

গণপতি সিংএর মৃত্যুর পর তার বড় ছেলে নরেন কলকাতায় কিছু দিনের জন্য গা ঢাকা দিয়েছিল, এখন ফিরে এসেছে। মথুর কৌড়িকে ডেকে পাঠিয়েছিল জরুরি দরকার বলে। একদিন বাদ দিয়ে আজই সকালে তার নিজের গোয়ালে কাজকর্ম সারার পর মথুর ওখানে গেল। নমস্কার করে জিজ্ঞেস করল, 'বড়বাবু আমাকে ডাকাইছিলেন ’

নরেন লোকটা দেহে-মনে একটু দুবলা, কিন্তু ফর্সা ধুতি শার্টে ছিমছাম, পায়ে কাজ-করা স্যাণ্ডেল। সদর-কাছারি থেকে মথুরকে নিয়ে গেল ওদের গোচালায়, বারবার তার কোঁচার খুঁটটা মাটিতে পড়ছিল। বললে, 'ডেকেছিলুম কেনে·· এই জন্যে দেখ তোমার সামনে, আমার গোয়ালের অবস্থা কী হয়েছে, দেখ।'

গোটা তিনেক ষাঁড়, দুটো গাই, ছোট-বড় চার-পাঁচটা বাছুর প্রশস্ত চালাটার এখানে-ওখানে বাঁধা। চালাটা এত বড়, আর খড়ের ছাওয়া চাল এতটা নিচু যে সকালেই আব[illegible] দেখায়। ওই দূরের [illegible]কটার চেহারা আর বড় দুই যেন আবছায়ায় মিলে গেছে।

মুহূর্তের জন্য যেন চমকে গেল মথুর কৌড়ি, গোচালার এপ্রান্তে-ওপ্রান্তে সঞ্চরমাণ তার চোখের দৃষ্টি ব্যথাতুর হয়ে এল, 'ই যে শ্মশান-মশান হয়ে গেছে গ', বড়বাবু ’

মথুর কৌড়ি গোপ, তার নিজের গো-সম্পদ দিনে দিনে ক্ষয় পেয়েছে, তার কষ্ট কী তা সে জানে, সেটা এখানেও দেখবে ভাবেনি। বললে, 'দু বছর আগে আমি অন্তত পনর গণ্ডা ষাঁড়ে-গাইএ দেখেছি বটে, হঁ, লক্ষ্মণ বলছিল ঠিক···'

নরেন কতকটা নিজের মনেই হিসেব মেলাবার মতো করে বলছিল, 'আঁধার-নয়ন আর চন্দ্রকোণা থেকে দশ বারোটা গাই-বকনা আনব আমি, লোক পাঠাইছি ··হাওড়া থেকে পাঞ্জাবী ষাঁড় আনাব, বীজের ষাঁড়, ধর, আগাম তিন বছরের মধ্যে আর একটা চালা বানাব আমি, উদিকটায়, পশ্চিম দিকে, পনেরো গণ্ডা নয়, বিশ গণ্ডায় নিয়ে যাব আমি ঠিক দেখো, ছ'মাসেই একটা ডেআরি খুলব, স্টার্ট করব অন্তত···'

'উইট' কী জিনিস, বড়বাবু?'

'সে এক রকম, মানে, ধর, গরু-চাষের কারখানা আর কি, দুধ যাবে শিশিতে, মাখন-ঘি টিনের কৌটায়, ইদিকে মেদ্নীপুর-খড়গপুর, উদিকে বাঁকুড়ো-গড়বেতা পর্যন্ত…'

হাসল মথুর কৌড়ি, 'তা বেশ ত, উ ঘটনা খুব ভাল হবেক। কিন্তু বড়বাবু, আপনার গুয়ালট' খালি হয়ে গেল, আপনারা কলিকাতা চলে গেলেন…'

নরেন ফিরে দাঁড়াল, এতক্ষণ গোয়ালের দিকে চোখ ছিল তারও। বললে, 'মথুর, তোমাকে ডেকেছি কেনে জান, আমার গোয়ালের ভার তুমি লাও, তুমি হলে পয়লা নম্বরের সদ্গোপ, তুমি হাতে নিলে গোয়ালের শ্রী আবার ফিরে আসবেক, তোমার মেহনতের দাম দিব আমি। আমার ঘরে খাবার-দাবার, বছরে দু'বার দু'জোড়া কাপড়, তার উব্রে মাসকাবারি মাইনা ধরে দিব, সব পুষি' দিব…'

তারপর, যেন ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে এমনিভাবে অন্য কথায় চলে গেল নরেন, 'গোয়াল আমার এমন হত নাই, কলকাতায় ছিলম তিন মাস, কত্তার ওই সব হবার পর…সব ছিল তুমি ত জান, স্বচক্ষে দেখেছ, ত ঘরে ছিল বিভীষণ, কত্তা দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিল, কতগুলা গরু ছিল বল দিকি, সব খুইয়ে দিল, কি, বিক্রী করে দিল, কি বিলি' দিল, বিশ্বাসঘাতক, জান ত কার কথা বলছি · '

'না-না…' এতক্ষণ গরুর দুর্দশার কথা শুনতে শুনতে ঝিমিয়ে পড়েছিল মথুর, এখন বসা-গলায় ঘঁ্যাস্ করে উঠল, যেন তেলে-বেগুনে হল, 'উ কথা বলবেন নাই, বড়বাবু। ঠেশ দিয়ে বলছেন কেনে, লক্ষ্মণের নামে উকথা বলবেন নাই, ভাল মানুষের শাপ-সম্পাত আছে…'

'কী বলছ, মথুর, তুমি…' একটু আমতা আমতা করছিল নরেন, মথুরের ক্রোধ দেখে সত্যিই অবাক হয়েছিল, যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। তারপর বলে উঠল, 'তা হলে গরুগুলার হল কী? লক্ষ্মণ নয় ভাল লোক, বুঝলম, কিন্তু তার বুড়িটা, মিটমিটে শয়তান, ঝি-জামাই আছে, যে ক'মাস আমরা ছিলম নাই, ক'বার এসেছে গেছে কে জানে, ঘর ত তখন ফাঁকা…'

কিন্তু পাছে আবার অপ্রীতিকর কথা কিছু উঠে পড়ে সে জন্যে কথা ঘোরাল নরেন, 'থাক গে, পরের কথা ছাড় দাও, তোমার-আমার ওই কথা রইল, কবে আসছ বল…'

'উসব হবেক নাই, বড়বাবু, আমি আপনার ইখেনে কাম করতে লারব।'

গলার ভেতর অস্ফুট শব্দ হল নরেনের, মথুরের দিকে আহত চোখে তাকিয়ে রইল।

'আপনি অন্য লোক দেখেন কেনে, আমি এখন যাই, বড়বাবু, অনেক বেলা হয়ে গেল…'

'কেনে, তুমি কী চাও বল না…'

'চাই নাই কিছু, দরদাম করছি নাই যে আপনি টাকা বাড়াবেন। আপনার ঘরে কাম করতে লারব।'

'সে কী কথা! আমাদের ঘরে কী দোষ হল…' হাসতে চেষ্টা করল নরেন।

'হাসবেন নাই, বড়বাবু, হাসবেন নাই, ই হাসিব কথা লয়। শুনেন, বাবু…' মথুর কাঁধের গামছাটা একবার এদিক আবার ওদিক করতে লাগল, 'আপনি কাল রেতে আসতে ডেকেছিলেন, আমি আসি নাই। কেনে জানেন, আমার পেটে-মুখে এক কথা, বাবু, কার' ধার ধারি নাই, ডরও করি নাই, এখন পাড়ার পাঁচ জন লোকে আমাকে মানে-গণে, ত রেতে এলে বলবেক, আপনার সঙ্গে আড়ালে আমি গুজগুজ-ফুসফুস করছি, উ আমি চাই নাই। দিনের বেলাকে এলম, পাঁচট' লোক দেখলেক, শুনলেক আপনার সঙ্গে কী কথা হল, আপনার কথা আপনি বললেন আমার কথা আমি বললম, বাস্, চুকে গেল…চলি, বাবু, আপনি আমাকে আর ডাকবেন নাই…' বলে মথুর চলে এসেছিল।

বিয়াল্লিশ

শামলীদের ঘরের কাছেই যে পুকুরটা, তার জল এখন কানায় কানায়। পাড়ে পাড়ে সবুজ ঘাস, বড় বড় গাছগুলোতেও ঘন সবুজ পাতা প্রথম সকালের রোদ্দুরে ঝলমল করছে। বৃষ্টি-ধোয়া মাটি-পাতা-ঘাসের ওপর ভাপ উঠছে, গরম নিঃশ্বাসের মতো।

একটু দূর থেকে মাটি-পথের ওপর দিয়ে শামলী আসছিল এই পুকুরটার দিকেই। পুরনো আমলের একটা পেতলের ঘড়া কাঁখে, জল নিয়ে যাবে। এখন সে তার মায়ের কাছে থাকে না, মথুর কৌড়ি নিজের ঘরে তাকে নিয়েছে। মোহনের মৃত্যুর পর লোকটা আঘাতে শোকে এক রকম পাথর বনে গিয়েছিল, লোকে বলেছিল, নিজের ছেলে মরতেও অতটা হয়নি। আঘাতের অবশ ভাবটা একটু কাটতেই মথুর কামিনীকে বলেছিল, 'হঁ গ', মহনের আমি বিয়া দিলম… আমি বিয়া দিলম বেটার মত, তা মহন আমার বেটাই ধর, বেটা গেল ত

বউ রাখব আমার ঘরে, এ্যাদ্দিন ছিল তুমার কাছে, আজ থিকে উ আমার ঘরনী-বউ হল···।'

শাম্‌লীর মায়ের আপত্তি-সম্মতি জানাবার মতো অবস্থা ছিল না। সেই থেকে শাম্‌লী মথুর কৌড়ির ঘরেই আছে।

লম্বা, শুকনো পাটকাঠির মতো চেহারা শাম্‌লীর, খাটো শাড়িটা ফর্সা, কিন্তু গায়ে খড়ি উঠছে, এক রাশ রুখু চুল মাথার পিছনে টান খোঁপায় বাঁধা। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, কেবল মেলাই রয়েছে, বোধ হয় কিছু দেখছে না। রাস্তার ওপর রোদ পেরিয়ে যখনই কোনো গাছের ছায়ার নিচে এসে পড়ছে, তখনই ওর গতি শ্লথ হয়ে আসছে, মনে হয় একটু ঠাণ্ডা লাগিয়ে নিতে চায়।

পুকুরের কোণে ঘাটের মাথায় এসে একটু থমকে দাঁড়াল শাম্‌লী, অনিশ্চিতের মতো। একবার নিজেদের কুঁড়েটার দিকে তাকাল, কিন্তু কোনো পরিচয়ের বা আকাঙ্ক্ষার ভাব ফুটল না। পুকুরের ভাঙা পাথরের পৈঠা দিয়ে নামল যেন সেটা আছে কি নেই। শেষ ধাপটায় বসে কলসীটা পাশে রেখে পা দুটো ডুবিয়ে দিল জলে। হাঁপিয়ে উঠেছে, কলসীর মুড়িটা চেপে ধরল মুঠিতে।

'কুক্ কুক্ ·'

চমকাল না শাম্‌লী, কিন্তু শূন্য চোখে ওপর দিকে তাকাল। ঝাঁকড়া হয়ে ছড়িয়ে পড়া করঞ্জ গাছটায় উঠেছে পচাই, লাল পিঁপড়ের ডিম পাড়তে, গাজনের ভাদ্দর বৌ লখী বলেছে, তার বাচ্চা ছেলেটার হুপিং কাশি হয়েছে তার জন্যে।

'কুক্···শাম্‌লী দিদি, কুক্···'

তাকিয়ে রইল শাম্‌লী, কিন্তু কোনো কথা বলল না। মায়ের কথা জিজ্ঞেস করতে পারত। কে জানে আর এক দিনের সেই খেলা-খেলা অবিশ্রান্ত কুক্ ডাক ওর মনে পড়ছিল কিনা।

'জল নিতে এস্‌ছিস, তুই রাঁদ্‌বি আজ? তুদের আজ কী রান্না হবেক রে '

কে জানে, শাম্‌লী যদি বলত, তা হলে রান্নার সময় পচাইয়ের যাবার ইচ্ছে ছিল কিনা।

' 'আমি কী জানি, কী রান্না হবেক···' বিড় বিড় করে বলল শাম্‌লী। জলে নেমে কলসীটা মাটি দিয়ে ঘষে ঘষে মাজতে লাগল। তারপর স্নান করার জন্য গলা-জলে নেমে পড়ল সে। কালো টলটলে জল, ঠাণ্ডা। যেখানে স্নান করছে, তার দু'পাশে হিংচে আর কলমি লতা ঢেউএ ঢেউএ দুলে উঠল। অদূরে একটা পোঁতা বাঁশের ডগায় একটা মাছরাঙা বসেই চিৎকার করে উড়ে গেল। একটা ছোট মাছ জল থেকে লাফিয়ে উঠে আবার জলে মিলিয়ে গেল।

স্নান করে ঘাটের ওপর উঠল শাম্‌লী, জল ভরে পেতলের কলসীটা কাঁখে নিয়েছে। কলসীর ভারে একদিকে অনেকটা বেঁকে পড়েছে। তারপর ফিরে গেল ওর নতুন বাড়ির দিকে। ভিজে চুলের গোছা দু'হাতে নিংড়ে খোঁপার মতো জড়িয়ে ছিল শাম্‌লী, এখন খুলে গিয়ে কাঁধে-পিঠে বেখাপ্পা লুটোতে লাগল, এক দিকে ঝুলে পড়ে।

পচাইকে কিছু বলেনি শাম্‌লী, পচাইও আপাতত দিদিকে ভুলে গিয়েছিল। খানিকক্ষণ বসে থেকে ওপরে উঠছিল সে, গাছের টঙে পিঁপড়ের বাসাগুলোর দিকে। পাতার সঙ্গে পাতা জুড়ে ঠোঙার মতো ঘর বানিয়েছে পিঁপড়েরা, তার ভেতর ডিম আছে। পুঁটেটা ভুগছে অনেক দিন ধরে। লুস্‌কি বুড়ি অনেক ওষুদ-টস্সুদ জানে, বলে গেছে, লাল পিঁপড়ের ডিম ঘিয়ে, অভাবে তেলে ভেজে, বাতাসা মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

পৌঁছল একটা স্থবিধে মতো জায়গায়। ডালের গায়ে গায়ে লাল পিঁপড়েগুলো যাতায়াত করছে, ওদের চলাপথ বাঁচিয়ে হাত পা রাখছিল পচাই, তবু ওর গায়ে দু-একটা উঠে পড়তে লাগল। ঝটিতি অথচ সন্তর্পণে ঝেড়ে ফেলছিল, কামড়ায় ভীষণ, যেমনি বিষ তেমনি জ্বলুনি। আর একটু উঠে একটা পাতার ঠোঙা নাগালের মধ্যে পেল পচাই। যে সরু ডালের ডগায় বাসাটা, তার গোড়ায় হাত লাগাল, উদ্দেশ্য, ডাল সমেত ভেঙে নিচে মাটিতে ফেলে দেবে, নিচে নামার পর পিঁপড়ে সরিয়ে ডিমগুলো কুড়িয়ে নিতে পারবে।

সরু ডালটা মট্‌কেছে, এমন সময় উত্তেজিত, উঁচু গলায় কথাবার্তা শুনতে পেল। উৎকর্ণ হল পচাই, তাকাল সেদিকে। চোখে পড়ার আগেই বুঝল মথুরের গলা। সঙ্গে আর কে আছে? একটা ঘরের আড়াল পড়েছিল, পরক্ষণেই তার আড়াল থেকে বেরোল মথুর কৌড়ির সঙ্গে লারাণ জেলে।

লারাণ কেমন করে যেন কথা বলছে। ঠিক বুঝতে পারল না পচাই, কিন্তু বুড়োটার রকম-সকম 'সন্দ' হয়। মথুরের একটা কথার উত্তরে লারাণ বলে যাচ্ছিল, 'যে যাই বলুক, মথুরবাবু, আমি তুমার গে জোর গলায় বলব, তুমি একট' যথাত্ত বিরৎ (বৃহৎ) কাম করিছ, সনা মাহাত'র বিটী এক মাস গেল নাই বেধবা হল, নিরাশ্চয় হল, ত তুমি আশ্চয় দিলে। তুমরা হল গে উচ্চ জাত, ত মাহাত'র বিটী, বলে বাম্মণ-চাঁড়াল আন্তর, ত তুমার বুকের পাটা আছে, দিব্যি বলে দিলে, উ আমার পুত্তবধূ হল...' তোষামোদে তেলতেলে হয়ে এল লারাণের কণ্ঠস্বর।

পচাইয়ের মুখখানা থমথমে হয়ে উঠেছে, বুড়ো কথা বলছে জাত তুলে, মনে হল মথুর কৌড়ি যেন এ কথার উত্তর না দেয়, আবার সঙ্গে সঙ্গে ওর ভীষণ কৌতূহল হল মথুর কী বলে তা শুনবার জন্য।

'তা ঠিক বলেছ, লারাণ, অমন লাফা-ট্যাপা টিয়া পাখির মতন মেয়েট', এখন একট' রা-ও কাড়ে নাই, মুখের পানে চাইলে বুক ফেটে যায়!'

'তা আর বুলতে, সিদিন উদিক পানে যাচ্ছিলম (পচাইয়ের মনে হল, বুড়ো এখন সব জায়গায় জোটে, সব দিকে নজর রাখে), ত দেখলম, তুমাদের শুয়াল কাড়ছে, ত কাড়ছেই, গলা খাঁকারি দিলম, ডাকলম মা-লক্ষ্মী বলে, ত দেখেও দেখল নাই, শুনেও শুনল নাই...' এক মুহূর্ত থামল লারাণ, তারপর হঠাৎ ভিন্ন স্বরে বলে উঠল. 'তুমি আমাকে ক্ষেমা-ঘেন্না করে লিবে, মথুরবাবু, ই বিয়াট' ভাল হয় নাই, সেই বিয়ার রেতেই বুলেছিলম তুমাকে, কী জাত বলতে কী জাত, ত আমার কথা ঠিক হল কি না বল, এখন ত সব চিনা-জানা গেল, মহন মহন লয়, বামুনের পো, ত...'

মথুর হনহন করে আসছিল, লারাণের দিকে না তাকিয়েই বললে, 'তা তুমরা যাই বল, মাহাত-তুলে বলে বিয়া দিছলম, বেরাল কিনা মাহাত-বামুন, হউক গে...কী হইচে, আজকাল উসব হচ্ছে ..' এরপর মথুরের কণ্ঠস্বর স্নেহে-বেদনায় ভার হয়ে এল যেন, দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বললে, 'আমার লসিব খুব খারাপ, লারাণ, আমার নিজের ঔরসের বেটা মরল বজ্জর পড়ে, আর এই বেটা মরল মেলেটারির গুলিএ...বেটা বলব নাই ত কী? বাপের মত মান্যি করে আমাকে বরকত্তা করল, গাঁয়ে এত লোক ছিল, কার' কাছে গেল নাই কেনে, অ্যাঁ?'

একটু দম নিল মথুর পায়ের গতি কমিয়ে, একটা অব্যক্ত শব্দ করল, বললে, 'আর, শুন, লারাণ, বলি তুমাকে। সেসব বেত্তান্ত মনে করে বুকের ভিত্‌রে ফেটে যায়। হইচে কি, বিয়ার দিন লোকজন বেশি হয়ে পড়ল, বিয়া-টিয়াতে উরকম হয়, ত বেটা আমার মুখ চূণ করে আমার কাছে এল, কি, না, হাতে এক পয়সা নাই। দিলম উয়াকে টাকা...তিরিশট' টাকা। সে টাকা আমার শোধ করে নাই মহন...পুত্ত আমার টাকা ধারে...আমার কাছে ঋণী হইছে, হা-হা...' হা-হা করে হাসতে গেল মথুর কৌড়ি, যেন কৌতুক করছে, কিন্তু বুকফাটা শ্বাস বেরিয়ে এল কেবল।

গামছাটা তুলে চোখের ওপর রাখল একবার, বোধ হয় মুছল, বললে, 'আর যে কাম সে করেছে, জুয়ান-মরদের মতন কাম করেছে...আমরা হলম সদ্‌গোপ, আমাদের পূব্বপুরুষ রাজপুত, বুঝলে লারাণ, বীর-মরদ আমরা বুঝি, উয়ার

বাপ-মা কে জানি নাই, ত পন্নাম করি তেনাদের পায়ে…' হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল মথুর।

পুকুরে ঘাটের কাছটায় এসে পড়েছিল ওরা। মথুর থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ লারাণের দিকে ফিরে বলে উঠ্‌ল, 'আর শুনেছ, লারাণ, ছ্যা-ছ্যা, আমাকে বলে কিনা তেনাদের গুয়ালে কাম করতে হবেক, ডেইরি খুলবেক, হঁ…'

মথুরের বুকে কথাটা তখনও ছেঁকার মতো লাগছিল—তার বুঝবার মতো অবস্থা ছিল না যে তার শ্রোতা লারাণ জেলে কথাগুলো কীভাবে নিচ্ছিল—তাই সখেদে, ক্ষোভের সঙ্গে বলে উঠল, 'হঁ-হঁ, আর যাই করি নাই কেনে, মথুর কৌড়ি তুমার গুয়ালে ঢুকবেক নাই…'

কিন্তু লারাণ যেন কথাটা পেয়ে লুফে নিলে, 'কে বললে গুয়ালের কাম করতে, কী বিত্তান্ত বল দিকি, বস না, বস একটুন, ছায়রাতে '

'কে আর বলবেক, তুমাদের বড়বাবু গ', লরেন বাবু! বলি জানি ত সব, মহনকে মারল যে মেলেটারি, সেই মেলেটারির সাহেব তুমার ঘরে আসে কেনে, হঁ? সাহেব মেরেছে আমার বেটাকে, আর তুই দিলি সাহেবকে খাতির করে খানাপিনা, থালে তুইও আমার পুত্তঘাতী, ঠিক কি না বল, লারাণ, আমি অলেয্য বলেছি?'

'উইট' কুনু শালা বলতে পারবেক নাই, হঁ…'

'আবার যদি বলে ত মুখের উব্‌রে বলে দিব, আমিও মথুর কৌড়ি, রাজেন্দ্র কৌড়ির জ্যেষ্ঠপুত্ত, হঁ, পুত্তঘাতীর ঘরে কাম করব আমি, হঁ…'

'উ আবার করে মানুষ, মানুষের পেটটা'ই কি সব! বস না, মথুরবাবু, বস কেনে…' বলে লারাণ নিজেই বসবার উপক্রম করল।

'না, বসব নাই, তুমি কুথা যাচ্ছ যাও। বুকের ভিত্‌রে অনেক কথা আছে, লারাণ, খুলে দিলে বান ডেকে যাবেক…ঘরে কাম আছে বিস্তর, এসি এখন…' বলে গামছাটা দুই কাঁধে ঠেকাতে ঠেকাতে এগোল মথুর।

এক রকম আট্‌কাবার মতো করে ওর পাশে এসে গেল লারাণ। সেই তেলতেলে কণ্ঠে আবার বললে, 'আর একট' কথা বলে যাও, মথুরবাবু। মনে মনে ভাবি তাই, ই যে এত কাণ্ড হল, মহন মরল, তার সাঙাৎ মরল, ত সাবাস মরদ, তুমি যথাত্ত বলেছ, ত মাঠে ফসল রেখে গেল উয়ারা, তুমার কী মনে লেয়, গাঁয়ের লোক ঘরে ফসল তুলতে পারবেক?'

'পারবেক, আলবাৎ পারবেক…এই তুমাকে একট' কথা বললম আমি, মালিকের খামারে ই বছর একট' দানাও উঠবেক নাই…'

মনে হয় এ ব্যাপারে মথুরের মত পরিবর্তিত হয়েছিল। ধান রোয়ার সময় রতন দিগারকে সে বলেছিল মালিকের ভাগ মালিককে দিয়ে দেবে।

'হঁ ?...' লারাণ হতবাক।

মথুর চলে গেল।

গাছের ওপর থেকে পচাই দেখল, মুহূর্ত পরে লারাণ জেলের মুখের ভাব বদলে গেল, মুখখানা নিঃশব্দ হাসিতে ফাঁক হয়ে উঠল, ফোকলা মুখখানা। কিন্তু পরক্ষণেই সচেতন হয়ে উঠল লারাণ, ইতি-উতি তাকিয়ে সেও দ্রুত চলে গেল, যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকেই।

'শালাঃ, বুড়া, তুমাকে চিনলম আমি, ছুরি দিয়ে তুমার চোখ গালব, তবে ছাড়ব...' গাছের ওপরে বিড়বিড় করতে লাগল পচাই, ওর আপসোস হতে লাগল সঙ্গে তীর বা ছুরিটুরি নেই বলে।

পটাপট পিঁপড়ের বাসা ভাঙতে আরম্ভ করল পচাই।

তেতাল্লিশ

মাঝে মাঝে মাছ ধরতে যাবার দলে পচাইয়ের ডাক পড়ে। ওদের গ্রাম থেকে মাইল তিনেক দূরে মণ্ডলদের বিলে মাছ ধরা হবে, ওকে বলে রেখেছিল। প্রহরখানেক রাত তখনো বাকি আছে, সেই সময় রাস্তা থেকে ওকে হাঁক দিয়ে গেল, 'পচাই, উঠেছিস, না, ঘুমাইছিস এখন' ?

'না, যাচ্ছি কেনে, অ ছিরুকাকা, দাঁড়াও না একটুন...আচ্ছা, এগাও তুমরা, আমি এলম বলে...'

একটা ঘুরুনি জাল বয়ে নিয়ে যাবার ভার ছিল ওর ওপর, দড়ি দিয়ে বাঁধাই ছিল সেটা, তাড়াতাড়ি মাথায় তুলে বেরিয়ে এল পচাই।

সূর্য ওঠার আগেই মাছ ধরার জায়গায় পৌছোতে হবে, কাজেই আধো-চলা আধো-ছোটা অবস্থায় রাস্তায় পড়েও দেখল, তারা অনেকটা এগিয়ে গেছে, দূরে বাঁকের মাথায় দু-তিনটে আবছা মূর্তি আড়াল হয়ে গেল। পিছনেও বোধ হয় কারা আসছে, কোনো একটা দলে ভিড়ে যেতেও চাচ্ছিল পচাই, কিন্তু অপেক্ষা করে পিছিয়ে পড়ার ঝক্কিও নিতে চাইল না।

কিন্তু একটা জায়গায় ওর গতি মন্থর হয়ে এল, মথুর কৌড়িদের পাড়ায় এসে পড়েছে। জামগাছগুলোর আড়াল পেরোতেই ওদের গোয়াল-চালাটা দেখা গেল,

অন্ধকারে শোয়া-দাঁড়ানো গরুগুলো সমেত নিঃঝুম হয়ে আছে। অথচ শেষ রাত্রে, অন্ধকার একটু ফিকে হয়ে আসতে আরম্ভ করলেই বাঁধা গরুগুলো চঞ্চল হয়ে ওঠে, এক-আধটা ডাকও দেয়।

আরো কাছাকাছি আসতে দেখল, মথুরদের মাটির বেড়া-দেয়ালের দরজাটা খোলা। পচাইয়ের মনে খট করে লাগল, চোরটোর ঢোকেনি তো, না কি ওদের কেউ বেরিয়েছে? কাউকে এদিকে-ওদিকে কোথাও দেখতে পেল না।

'কে গ', সামনে কে?' পিছনের লোকগুলো এসে পড়েছে, 'কে, পচাই? ত অমন লেতিয়ে-মেদিয়ে পড়লি কেনে, চ-চ···' বলতে বলতে পেরিয়ে গেল ওকে।

'হঁ, যাই···'

কিন্তু আবো দু'পা এগোতে না এগোতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও, গোয়াল-চালাটার ধারে একটা মানুষ-মূর্তি নিথর হয়ে বসে আছে। রাস্তার দিকেই মুখখানা কিন্তু তাকিয়ে নেই, বরঞ্চ মাথাটা ঝোঁকানো, যেন কেউ বাতাসের দিকে গরম মাথাটা এগিয়ে দিয়েছে ঠাণ্ডা করার জন্য। শাম্‌লীকে চিনতে পচাইয়েব অসুবিধে হল না।

আরো একটু দাঁড়াল পচাই, তারপর যেন চলছিল বলেই চলতে আরম্ভ করল। 'শাম্‌লী দিদি···' অস্ফুটে উচ্চারণ করল পচাই। কথাটা তার কানে যাবার নয়, হয়তো শুনেও সে সাড়া দিল না।

'দিদিট' মবেই যাবেক ··' মনে হল পচাইয়ের, আর একটা গুম্‌রানো কষ্টের মতো লাগল। কতকটা দূব গিয়ে আবার দাঁড়াল ও, দেখলে শাম্‌লী উঠে দাঁড়িয়েছে, চালাটাব থেকে রাস্তার দিকে পা বাড়িয়েছে, চুল খুলে ফেলে মাথার এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে টেনে টেনে, হাঁটাব পা ঠিক পড়ছে না যেন, একটা কালো প্রেতের মতো দেখাচ্ছে তাকে।

'পচাই, অ অ পচাই, শালা চলে আয় রে, শালা ফিরার মুখে বুনের ঘরে ভাত খাবি···' সামনের দলটার থেকে কেউ হেঁকে বললে।

যেন চাবুক খেয়ে ফিরল পচাই, এবার ছুটতে আরম্ভ করল। মাথার ওপর জালটা ছোটার সঙ্গে দুলছে, লোহার কাঠিগুলো পরস্পরের সঙ্গে লেগে ঠুকঠুক শব্দ করছে।

মাছ-ধরা, ভাগাভাগি হওয়া, এসব শেষ হবার পর পচাই যখন ফিরছিল, তখন বেলা হয়েছে বেশ। গেল বর্ষার পর এখন মাঠ-ঘাট শুকোতে আরম্ভ

করেছে। রাস্তার দুপাশে বেনা-ঝোপ, নলখাগড়ার বন, এখানে-ওখানে আকন্দ গাছে শাদার ওপর বাদামী ছোপ দেওয়া ফুল ফুটেছে। পথের দু'পাশে ধানে-ভরা মাঠ, পরিষ্কার সিরসিরে বাতাসে দুলে উঠছে মাঝে মাঝে।

নিজের ভাগে তিনটে মৃগেল পোনা পেয়েছে পচাই, তাছাড়া আছে চুনো মাছ। ভেবেছে, ঘরে মায়ের কাছে চুনো মাছগুলো ফেলে দিয়ে হাটের দিকে চলে যাবে, পোনা তিনটে বিক্রী করতে।

শাম্‌লীর কথা ওর মনে ছিল না তা নয়, কিন্তু এতটা সময়ের ব্যবধানে এবং মাছ ধরার পরিশ্রমে তার মনের ওপর একটা আড়াল পড়েছিল যেন। তাই মথুর কৌড়ির ঘরের কাছে এসে সে চমকে উঠল, ভিতরে একটা গোলমাল, কতকগুলো লোক কী বলছে, আর চেঁচামেচি করছে।

দ্রুত পা চালিয়ে দরজাটা লক্ষ করে এগিয়ে গেল পচাই, ওরই মধ্যে দেখল চালায় একটাও গরু নেই, ঘাস খাবার জন্য নিশ্চয়ই কোথাও বেঁধে দিয়ে এসেছে। সেই শেষ রাত্রে দেখা শাম্‌লীর মূর্তিটা মনে পড়ল ওর, আর বুকের ভেতর ঢিপঢিপ করতে লাগল। ওর মনে হল, শাম্‌লী মরে গেছে, তখন যা ভেবেছিল। কিন্তু কই, কান্নার মতো কিছু শুনছে না তো।

খোলা দরজা দিয়ে উঁকি মারল পচাই। ওদের ঘরের দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে মথুরের স্ত্রী গিরিবালা প্রতিবেশিনী এক বুড়িকে ধরে হেসে গড়িয়ে পড়ছে, আর অনর্গল কী বকে চলেছে। লুস্‌কি বুড়িও কোথা থেকে জুটেছে, সে এত হৈ-চৈ বাধাচ্ছে না বটে, কিন্তু শাম্‌লীর সামনে উবু হয়ে বসে হাসিমুখে কী বলছে। আর মথুর তার খাটো ধুতি মল্লের মতো পরে একটা লাঠি হাতে নিয়ে সমস্ত উঠোনময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেও কম বক্‌ছে না। একবার লাঠিটা ঠুকে বলে উঠল, 'আজই ফিস্টি লাগবেক কেনে · বড়কী, তোর কাছে পূজার সময় যে টাকাগুলা রেখেছিলম, বার কর দিকি, আমি হাটে যাই, পাঁঠা একট' পেল্লায় রকম চাই···লুস্‌কি দিদি, পচুই যত লাগে জগান দিতে হবে তুমাকে, হঁ · '

'কী হল কী···' বিড়বিড় করে উঠল পচাই। এটা সে তৎক্ষণাৎ বুঝল শাম্‌লীকে নিয়ে ভয়ের ব্যাপার কিছু নয়, বরঞ্চ উল্টো, কিন্তু কী নিয়ে ওদের এত আহ্লাদ, সেইটে বুঝতে পারল না। তার চোখে লাগল, বুড়োবুড়ি দুটো যেন পাগ্‌লাপারা হয়ে গেছে।

সংশয়ী চোখে তাকাতে তাকাতে উঠোনে ঢুকে পড়ল পচাই, জিজ্ঞেস করল, 'কী হইচে গ' তুমাদের, কী হইচে···'

মথুর কৌড়ি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ওর দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল, ওকে

প্রথমটা চিনতেই পারল না। তারপর দুই লাফে এগিয়ে এসে বলিষ্ঠ হাতে অত বড় ছেলে পচাইকে কাঁধের ওপর তুলে নিল, যেন সে ছ'মাসের একটা বাচ্চা। পচাই এক দিকে গামছায় বাঁধা মাছগুলো সামলাচ্ছে, অন্য দিকে ত্যাড়াবাঁকা হয়ে উঠছে, 'ছাড-ছাড়, উই, অঁ···ও জ্যাঠা ··'

অতি অবহেলে মথুরের সবল হাত পচাইয়ের শরীরের আপত্তিটাকে মসৃণ করে দিচ্ছে, আর মথুব মুখে বলছে, 'ছাডব কি গ', তুমি হলে মাতুল, বুঝলে পচাই-বাবু···ইই পচাইমামা, হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ···' অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল মথুর।

'তুমার কঁছডে কী গ', অ পচাইমামা ··' এক সময় দুম করে উঠোনে নামাল ওকে কাঁধ থেকে, 'হুঁ, মাছ ?···'

পচাইয়ের গামছার খুঁটে মাছ তিনটে বাঁধা ছিল, বাঁধনের ফাঁক দিয়ে মাথা বেরিয়ে আছে। মথুব খপ করে পুঁটলিটা পচাইয়ের কোমর থেকে খানিকটা গেরো খুলে খানিকটা হিঁচ্‌কে টেনে নিল, 'মাছ! ইই দেখ লুস্‌কি দিদি, মাছ, শুভযাত্তা!'

পচাই ছাড়া পেয়ে স্থির হয়ে দাঁডিয়েছে, তাকাচ্ছে শাম্‌লীর দিকে। লুস্‌কি বুডির সামনে শাম্‌লী মাথা নিচু করে বসে, সেই শেষরাত্রে গোয়াল-চালার ধারে যেমন করে বসেছিল, কিন্তু ঠিক তেমন প্রেতের মতো নয়, বরঞ্চ মনে হল, মুখ নিচু করে সে হাসি লুকোচ্ছে। পচাইয়ের সংশয় কেটে গিয়ে ব্যাপার কিছুটা বুঝতে পারছে, আর ওর চোখ দুটো ছোট হয়ে পিটপিট করছে।

পচাই এখানে পৌছোবার আগে ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল।

দাওয়াব ওপর বসে গিরিবালা কল থেকে ছাঁটাই করে আনা চাল পাছড়াচ্ছিল। কুঁড়ো তুঁষ উডে তার দু'হাতে মুখে পডেছে, চুলের ওপর একটা পরত জমেছে। মাঝে মাঝে কাশছে, শরীরটা ভালো নয়, সর্দি, জরভাব, তার ওপর এই উড়ুনে গুঁড়ো। উঠোনের একেবারে কোণের দিকে শাম্‌লী ছানি কাটছে গরুর জন্যে। বাইরে গোচালার দিক থেকে মথুরের গলা শোনা যাচ্ছিল, এটা-ওটা বলছে।

মাঝে মাঝেই গিরি তাকাচ্ছিল শাম্‌লীর দিকে, আর মুখখানা বেঁকে উঠছিল। কত্তা এই এক আপদ জুটিয়েছে। নিজের দুঃখধান্দায় কাটছিল গিরির, তারপর যখন মোহনের মৃত্যু হল, তখন মেয়েটাকে ঘরে এনে হাজির। কী, না বেটার বউ! তখন কিছু বলতে পারেনি গিরি, বললেই কি তার কথা থাকত, তাছাড়া মোহনের মরণটা তাকেও অভিভূত করেছিল। কিন্তু এই

মেয়েটা যেন কী, তার ধরন-ধারণ বুঝতে পারে না সে। কারো সঙ্গে রা-টি কাড়ে না, খাবার সময় খায় না, খেতে বসেও মুখে ভাত তোলে না। ঘরকন্নার কাজ তো করবে খুব, যদি কোনো কাজে হাত দিল তো হুঁশ থাকবে না। ওই যে ঘসর-ঘসর করে খড় কাটছে, তো কেটেই যাবে সারা দিন ধরে, যদি না ডেকে তুলে আনা হয়।

কড়ে রাঁড়ি, জুয়ান বয়সে ভাতার মরেছে ঠিক, কিন্তু সেও তো দু-তিন মাস হয়ে গেল। হাত-পা শাঁকচুন্নীর কাঠি, আর চোখমুখ যেন বোশেখ মাসের বাঁজা মাঠ।

'বলি, অ বউ···' একবার হেঁচে নিয়ে বুড়ি বলে উঠল, 'আর কত ছানি কাটবে? যাও কেনে, বাইরে গোবরের গাদাটায় হাত দাও, আর কত দিন ফেলে রাখবে?'

শাম্‌লী খড় কাটতেই থাকল।

'অ বউ···' নিজের কথাটাকেই ভেংচি কাটল যেন গিরি। বেটা নাই, তার আবার বউ!

শাম্‌লীর ছানি কাটার হাত থেমে গেল, বোধ হয় কথাটা কানে গেছে। চাল পাছড়ানো বন্ধ করে তাকিয়ে রইল গিরি। শাম্‌লী ঝুঁকে বসে এতক্ষণ খড় কাটছিল, এখন একটা বাঁশের মতো খাড়া হয়ে বসল, তারপর তার গাটা দুলে উঠল যেন, ঠোঁট দুটো ঠেলা হয়ে কাঁপতে লাগল।

'অ মা, অমন করে কেনে···' কুলো ছেড়ে উঠে দাঁড়াল গিরি।

শাম্‌লী ডান দিকে বেঁকে আদ্ধেকটা ঘুরে গেছে, খড়কাটা বঁটিটা উল্টে পড়ল, ওয়াক-ওয়াক করে বমি করল কতকটা।

'অ মা, কী কাণ্ড···' বিরক্ত হল গিরি, ভয়ও পেল, উঠোনে নেমে এসে বাইরে মথুরকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে ডাকল, 'হঁ গ', শুনছ, ইদিকে এস কেনে···'

'কাজের মদ্দিখানে ব্যাগ্‌ড়া দিস কেনে বল দিকি···' ব্যাজার হয়ে ঢুকল মথুর কিন্তু শাম্‌লীর অবস্থা দেখে সেও ভয় পেয়ে গেল, 'বিমার হইচে উয়ার, বিমার···লুস্‌কি দিদিকে ডেকে আনি আমি। তুই গায়ে হাত দিয়ে দেখ ত গা গরম না কি···' মথুরের বৌমা, কাজেই সে শাম্‌লীর গায়ে হাত দেবে না।

গিরি এগিয়ে গিয়ে শাম্‌লীকে ধরে তুলল, উঠোন থেকে দাওয়ার দিকে তাকে আনতে চাইল ও। কিন্তু হঠাৎ ওর কী হল, সেসব কিছুই না করে মথুরের দিকে তাকিয়ে খিকখিক করে হেসে উঠল, এবং হাসতেই থাকল।

'কী হল কী তোর···' ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মথুর তাকাল গিরিবালার দিকে।

'আ মরণ, আমি চোখের মাথা খেইছিলম। হঁ গ', ভয় নাই গ', তুমার লাতি হবেক, তুমার লাতি…' বুড়োর দিকে তাকিয়ে হাসির ঢেউ দিতে লাগল গিরি।

তারপর যে কাণ্ড বেধেছিল, তারই মাঝখানে এসে পড়েছিল পচাই। যখন সে ব্যাপারটা বুঝতে পারে, তখন কেমন লজ্জা-লজ্জা করছিল তার, সে ছুটে বেরিয়ে গেল উঠোন থেকে, মাছ না নিয়েই।

চুয়াল্লিশ

সব কাজকর্ম সেরে শুতে যেতে বেশ দেরি হল গিরিবালার। রাত নিঃঝুম। মেঝেতে যেখানে শাম্‌লী শুয়েছে, তার পাশে মাদুর-কাঁথা পেতে বালিশ একটা টেনে নিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

বুড়ির সারাদিনটা উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে, মাথাটা দপদপ করছিল। শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল সে, কিন্তু নানা রকম উদ্ভট স্বপ্ন দেখল। একবার দেখল, কোন পুকুরে সে মাছ ধরতে গেছে, অনেকগুলো মাছ পড়েছে জালে, এক জায়গায় জড়ো করে রাখছিল কিন্তু সবগুলো কিছুতেই ঘরে বয়ে আনতে পারছিল না। আবার দেখল, তার ছেলে বংশী গরুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে মাঠে যাচ্ছে, গিরিবালা এত করে বলছে, 'অ বংশী, যাস নাই, ঝড় বিষ্টি মাথায় করে, চারদিক ঘিরে এসছে দেখছিস নাই‥', কিন্তু সে শুনছে না। 'না, ছাড় তুমি…' বলে হাত ঝিনকে ছাড়িয়ে বংশী ছুটে চলে গেল। তার সঙ্গে গরুগুলোও ছুটতে আরম্ভ করেছে। গিরিবালাও ছুটছে পিছনে পিছনে, তাদের নাগালও পাচ্ছে না, ছেলেকে ফেরাতেও পারছে না। তারপর বদলে গেল স্বপ্নটা। বংশী, তারই ছোটবেলাকার কথা। তখন তাদের চালা-ভর্তি গরু। ছেলেটা সেই গরুগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়েছে, গিরিবালা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল, 'হেঁই, হেঁই, পালি' আয়, শিংএ গুঁতি' দিবেক, লাথ মারবেক…' কিন্তু ছেলেটা এঁকে-বেঁকে পিছলে চলে যাচ্ছে। গিরিবালা যেই ওকে ধরবার জন্য গরুগুলোর মধ্যে ঢুকেছে, অমনি একটা হেলে গরু তাকে ফোঁস করে গুঁতোল, 'মা গ'‥' কাত্‌রে উঠল গিরিবালা।

ঘুম ভেঙে উঠে বসল। যে আঁচল পেতে শুয়ে পড়েছিল বুক থেকে সেটা টানা হয়ে পড়ে গেছে, হাঁপাচ্ছে একটু একটু। স্বপ্নের ঘোরটা কাটতে না কাটতেই সব মনে পড়ে গেল ওর। গিরিবালার ঘর খালি, একমাত্র জোয়ান

ছেলে বজ্রাঘাতে মারা গেছে।

সমস্ত শরীরে একটা কাঁপুনির ঢেউ বয়ে গেল যেন, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ও। সে আবেগটাও স্তিমিত হয়ে এল এক সময়, একটানা অস্ফুট গোঙানিতে পরিণত হল, তারপর শুয়ে পড়ল আবার।

ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙল ওর, তখন দেখল শাম্‌লী ঘুমের মধ্যে গড়িয়ে তার কোলের কাছে এসে গিয়েছে। ভীষণ কাঠিপানা হয়ে গেছে মেয়েটা। আব্‌ছা আলোতে দেখা গেল, গাল চিম্‌সে গেছে, মুখটা হাঁ-করা, বাঁ হাতটা বালিশের নিচে দুমড়ে গেছে। কতক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল গিরিবালা, তারপর তার হাতখানা টেনে বের করে দিল। ঘুমোচ্ছে ঘুমোক।

তার পরের দিন রাত্রে মথুর যখন বাড়ি ফিরল, তখন গিরিবালার একটু ভাবান্তর লক্ষ করল যেন। অন্য দিন রাত হলেই তার ভাত ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ত গিরিবালা, মথুরও কিছু মনে করত না, বুড়ি হচ্ছে বউটা, সারাদিন খাটাখাটুনির পর গতরে আলিস্যি আসে, হাজার হোক মেয়েমানুষ তো। সেদিন তখনও তাকে বসে থাকতে দেখে মথুর বললে, 'বড়কী, তুই যে জেগে আছিস এখন', ঘুমাস নাই ?'

গিরিবালা একটু হাসল, 'তুমার ভাত দিব তাই বসে আছি।'

'উঁহুঁ, কী বল…'

এবারও গিরিবালা কিছু বলল না, গাড়ুতে রাখা জলে হাতমুখ ধুয়ে মথুর খেতে বসল। গিরিবালা জিজ্ঞেস করলে, 'হ্যাগ', তুমি যে পাঁঠা কিনতে গেছলে ত কী হল, ঠিক হল কিছু ? তুমার ফিষ্টি কবে হবেক, হঁ ?'

মুখের গ্রাসটা গিলে মথুর খানিকটা জল খেল। বললে, 'লুস্‌কি দিদি মানা করে দিলে, এখন হবেক নাই।'

'কেনে, হবেক নাই কেনে, সব কথা তুমার লুস্‌কি বুড়িকে শুধান চাই !'

'তা শুধাব নাই ? লুস্‌কি দিদি যে সে মানুষ লয় ! ত সে বলল, আর ক'দিন পরেই ত 'বাচ্চা-মারা' হবেক (গোপদের এক রকম উৎসব), উই সময় ফিষ্টি লাগাতে ·'

'সে কি গ', আমি বলি আজ-কাল লাগবেক, বউট' কী মনে লিবেক !'

'কাকে বলছিস তুই ?'

'আমাদের শাম্‌লী গ', তুমি আবার কতগুলান বউ ঘরে এনে রেখেছ ! আজ বিকালা জান, তেল দিয়ে চুল বেঁধে দিলম, মেয়েট'র যত্নআত্তি করার কেউ নাই, আর নিজের কাজ নিজে করবেক নাই। ত বললম, তুমি গেছ পাঁঠা কিনতে,

মেয়েট' হাসল শুনে, ত আমার মনে হল কি, বিটীর ভালমন্দ খাবার ইচ্ছা হইচে, তা আবার হবেক নাই গ', তা দেখ, তুমি এখন ফিষ্টি করছ কর, আমি কিন্তু পাঁচ মাসে সাত মাসে সাধ দিব, হঁ, তখন খরচপত্তরের কথা বলতে পারবেক নাই···' বলতে বলতে বুড়ির কণ্ঠস্বরে আগেকার সব দিনের মতো একটা আদুরে ভাব ফুটে উঠল।

মথুরের খাওয়া থেমে গিয়েছিল, অবাক চোখে তাকিয়ে সে বললে, 'তোর মন বদ্‌লে গেছে বল, মেয়েট'কে তুই ভাল চক্ষে দেখছিস থালে ?'

'আমি আবার উয়াকে মন্দ চক্ষে দেখলম কখন ?'

'কেনে, উ হচ্ছে বিষকন্যে, বিয়ার এক মাস পেরায় নাই ভাতারকে খেল, ইসব বলিস নাই তুই ?'

গিরিবালার মাথাটা নড়ে উঠল, মুখটা আড়াল করল একটু, 'তুমি বেশ মানুষ বট, রাগের মাথায় কবে কী বলেছি, আর সেই কথা ধরে বসে আছ !'

গিরিবালার মনে যে কথাটা ছিল, সেটা সে বলল আরো পরে। মথুর দাওয়ার ওপরই মাদুর পেতে শোয়, এই একটু হিম পড়ছে, এখনও। গিরিবালা কেরোসিনের লম্ফটা নিবিয়ে দিয়ে ওর কাছে বসল, একটু দ্বিধার ভাব ছিল, তবু বললে, 'দেখ, ই এক রকম ভাল হল, ভগমান তুমাকে মতি দিইচে, বউট'কে তুমি ঘরে লি'এসছ, আমি তখন অত বুঝি নাই···আমি কাল স্বপন দেখলম বংশীকে, শুন, তুমার মনে আছে একদিন সাঁঝ বেলাকে মাঠে গেছলম মাটি আনতে ? কি, না বেটা হবেক, ত হল এক রকম···'

'হঁ-হঁ, তুই ত ঠিক বলেছিস রে···' উত্তেজনায় উঠে বসল মথুর, অন্ধকারে গিরিবালার মুখের দিকে তাকাল, 'এইট' ঠিক বলেছিস তুই !'

গিরিবালা কতকটা আত্মমগ্নভাবে বলছিল, 'ত ভগমান ঘরে ঠিক ছেলে পাঠাইছে·· হ্যাঁ গ', তুমি মহনকে বেটা পাতাইছ, থালে তার যে বেটা হবেক, সে আমাদের লাতি হবেক, কী বল···'

একটা নতুন আশ্বাস ওদের দুজনের মনকে ধীরে ধীরে ভরে তুলছিল।

পঁয়তাল্লিশ

কামিনীর স্বাস্থ্য এখন অনেকটা ভালো, এমন কি তার পোড়া ঘায়ের জন্য যে খোঁড়ানো ভাবটা ছিল সেটাও অনেকখানি কেটে গেছে। ভালো করে লক্ষ

না করলে বোঝাই যায় না, তার চলাফেরায় কোনো খুঁত আছে। তাছাড়া, মথুর কৌড়ির পরিবারে যে একটা পরিবর্তন হয়েছে, তার ঢেউ এসে লেগেছে তাকেও। শামলী পোয়াতি হয়েছে এই খবরটা অন্যদের দিতে গিয়ে, অন্যদের জিজ্ঞাসার উত্তরে খবরটা সমর্থন করতে গিয়ে, পান-খাওয়া দাঁত বের করে কামিনী এক গাল হাসছে। এমন কি. পচাইয়ের সঙ্গেও তার দুটো ভালোমন্দ কথা হয়।

কিন্তু ওর হাত এখন খালি। অন্নপূর্ণা রাইস মিলে সে খোঁজাখুঁজি করেছে, মিল চলছে বটে, কিন্তু তার মতো কত মেয়ে ঘুরছে, তারা আর একটাও লোক নিচ্ছে না। এমন সময় মৃত গণপতি সিংয়ের ঘর থেকে নরেনবাবু তাকে কাজের জন্য ডেকে পাঠাল।

সিংবাবুদের কথা তার মনে হয়নি তা নয়। সেখানকারই সে পুরনো কাজের লোক, আর তাদেরই ধান সেদ্ধ করতে গিয়ে সে পা পুড়িয়েছিল। নরেনবাবু বলতে গেলে তার ছেলের মতন, যদি তাকে ডেকে না পাঠায় তা হলে সে যায় কেমন করে। এতদিন তাই সে যায়নি।

সেদিন বিকেলে পচাইকে সে বললে, 'পচাই, বড়বাবু কেনে ডেকে পাঠাইছে, যাই একবার, কাজকাম না করলে ত পেট চলবেক নাই···'

'কেনে, মরতে জাগা পাস নাই যে সিংবাবুদের ঘরে কাম করতে যাবি? যা না, সিংবাবুর ভূত তোর ঘাড় মটকাবেক, যা তুই···'

দোমনার মতো, যাবে কি যাবে না করতে করতে কামিনী পা বাড়াল।

•

খানিকটা অস্বাভাবিক, কিন্তু কামিনী চলে গেলেও পচাই ঘরেই রয়ে গেল। একবার দাওয়ায় বসছে, আবার উঠোনে নেমে নিজের মনে খেলা-খেলা ঘুরপাক খাচ্ছে খানিকটা, একবার এগিয়ে পুকুরপাড় পর্যন্ত এল।

মা যেখানে যাচ্ছে সেই সিংবাবুদের ওদিকেই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত ছিল সে। একটা নতুন ঘটনা, সিংবাবুদের বাড়ির সামনে পুলিস-ক্যাম্প বসেছে। কিছু খবর পৌঁছে দেবার আছে তার, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিল।

সন্ধ্যা নেমেছে সেই সময় ঘর ছেড়ে বেরোল ও। গাছের নিচে নিচে অন্ধকার, কিন্তু খোলা জায়গায় পরিষ্কার দেখা যায়। একটু আগেই এখানে-ওখানে শাঁখ বাজতে আরম্ভ করেছিল, এখন সব থেমে গেছে, হঠাৎ ছমছমে হয়ে আসে।

পচাইদের ঘর থেকে অনেকটা ওদিকে, পাড়ার একেবারে শেষ প্রান্তে বেড়টা, মোহনরা যেখানে প্রায়ই খেলা জমাত। চারদিক গাছপালা দিয়ে ঢাকা, দিনের

বেলা গরু-বাছুর চরে, কিন্তু রাত্রিবেলা কেউ এখানে আসে না। একটু দূরে রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়েও ছায়া-ছায়া নড়েচড়ে বেড়াতে দেখে কেউ কেউ।

সেদিনও ছায়াগুলো এখানে-ওখানে ছিল, গাছের তলায় ঝোপঝাড়ের সঙ্গে মিলিয়ে।

জায়গাটায় পৌছেই পচাই একটু থমকে দাঁড়াল, খানিকটা শুঁকেই যেন বুঝতে পারল বেশ কয়েক জন রয়েছে এখানে। কিন্তু কোনখানে বনা টুডু রয়েছে তা বুঝতে পারল না, পারার কথাও নয়। পায়ে পায়ে বনের একটা গাছের কাছে এসে পড়ল সে।

'উই, ইদিকে শুন ··' বাঁদিকে একটু দূর থেকে চাপা স্বরে ওকে ডাকল, আর একটা খরগোসের মতো নিঃশব্দ ক্ষিপ্র গতিতে পচাই সেখানে পৌছাল।

বনা তার হাতের তীরটা তুলে ওর বুকের ওপর ছুঁইয়ে বলল, 'কী দেখলি, ক'জন কুত্তা আছে ?'

পচাই চাপা কিন্তু উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'চারট', শালা দুট' ভুঁড়ি-আলা, একট' খ্যাংরাকাঠিপানা, আর একট' ঢ্যাপ্‌সা, শালা, একদিন ভুঁড়ি ফাঁসায় দিব···' অন্ধকারে পচাইয়ের শাদা দাঁতগুলো দেখা যেতে লাগল।

'ঠিক, সরে যা···' বনা তীরটায় ঢেউ দিয়ে একটা দিক ইঙ্গিত করল।

'বনাদা · ' পচাই কাঁচুমাচু স্বরে বললে।

'হুঁ, এখন লয়, উদিন তুকে শিখা দিব···'

পচাই মাথা নাড়ল, কুণ্ঠিত স্বরে বললে, 'মা সিংবাবুদের ঘরে কাম করার জন্যে গেছে, আমি বারণ করেছিলম '

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বনা বললে, 'ভাল, উয়ার কাছে খপর লিবি, সিংবাবুর ঘরে কী হয়···'

তখন, যারা আশেপাশে আড়ালে ছিল, তাদের মধ্য থেকে একজনকে ডাকল বনা, বেড়টার অপর প্রান্তের দিকে হাতের তীরটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'উই তালগাছ দেখ, গড়ায় লাগাইতে হবেক, আন্ধার রাত, জোনাক জলবেক আর নিশানা করবি, ঠিক গড়ায়, মদ্দিখানে '

হঠাৎ পিছন থেকে ওর পিঠের ওপর কে আঙুল ছোঁয়াল, আর উঠে ফিরে দাঁড়াল ও—লুস্‌কি বুড়ি, ওর মা।

'তুই, মা ! তুই এখেনে এলি কেনে ?' খানিকটা ভীত স্বরে বলে উঠল বনা, কিন্তু তাকিয়েছিল অন্ধকারে মায়ের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

যে মানুষগুলো গাছতলায় ঝোপে-ঝাপে মিলিয়ে ছিল, কাছাকাছি হয়ে এল

তারা—লুস্‌কি যেন আকাশ থেকে পড়েছে, তাদের অনেক জোড়া চোখ অন্ধকারে তার ওপর আটকে রইল।

ভালো করে দেখার কথা নয়, তবু বোঝা গেল লুস্‌কি রোগা হয়ে গেছে, চুলগুলো ঘাড়ের ওপর মুখের ওপর ঝুলে পড়েছে, খাটো কাপড়খানা নেমেছে হাঁটু পর্যন্ত, বাঁশের লাঠির মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লুস্‌কি, হাত দুটো দুপাশে নেমেছে, হাতে দুটো রূপোর বাউটি অন্ধকারে ঝকঝক করছে।

তীক্ষ্ণ, হাঁপানো গলায় লুস্‌কি বলে উঠল, 'তুই মরবি, বনা ··'

বনা এবং তার সঙ্গে যারা ছিল তারা নিশ্চুপ, যেন বজ্রাহত।

'তুই মরবি, বনা···'

বনা তেমনি স্থির দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, বিড়ালের মতো অন্ধকারেই যেন সব দেখতে পাচ্ছে।

'তুই মরবি, তুই মরবি ··'

হঠাৎ বনার গলার মধ্যে যেন বাজ ফেটে পড়ল, 'হঁ-হঁ, বনা টুডু মরবেক ··'

পরক্ষণেই বনা গাছের তলা ছেড়ে যেন লাফ দিয়ে বেড়টার মধ্যে এসে পড়ল, খোলা জায়গায়, তার পিছনে প্রথমে এল লুস্‌কি, তারপর অন্যরা।

হাতের তীরখানা সহসা সজোরে মাটির ওপর গেঁথে ফেলল বনা, 'ই মাটিএ খুন পড়িছে, মহনের খুন, মহনকে এই বনা টুডু তীরকাঁড়ের তালিম দিছে, মহনের খুন আছে মাটিএ, বনার খুন আছে মাটিএ•••'

যেন বিদ্যুৎবেগে ঘটে গেল, একজন তার তীরখানা বনার তীরের পাশে মাটিতে গেঁথে ফেলল, 'সঁতে বাগ্‌দীকে বনা টুডু তালিম দিছে তীরকাঁড়, সতের খুন আছে মাটিএ·· '

এক দুই তিন এমনি করে নটা তীর বিঁধল মাটিতে, একটা সাজানো সারি হল। সব চোখ লুস্‌কির দিকে।

'থালে বল···' তীক্ষ্ণ, হাঁপানো গলায় লুসকি বলে উঠল, 'ভরব টুডুর খুন আছে মাটিএ, ভরব টুডুর খুন আছে মাটিএ, ভরব টুডুর খুন আছে মাটিএ · '

ভৈরব টুডু ওদের পূর্বপুরুষ, পাঁচ পুরুষ আগে শাদা সেপাইদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল সে, বনে-জঙ্গলে থেকে যুদ্ধ চালিয়েছিল ছ'মাস ধরে, তারপর যখন ঘিরে ফেলেছিল তার দলটাকে, তখন একজনও ধরা দেয়নি, প্রাণ দিয়েছিল লড়াই করতে করতে।

ওরা এক সঙ্গে উচ্চারণ করল, নিচু স্বরে, 'ভরব টুডুর খুন আছে মাটিএ, ভরব টুডুর খুন আছে মাটিএ, ভরব টুডুর খুন আছে মাটিএ !'

ছেচল্লিশ

পরের দিন সকালে পচাই ওদের ঘরের দাওয়ায় বসে সামনে বেলগাছটার দিকে তাকিয়েছিল। সিরসিরে বাতাসে পাতাগুলো নড়ছে, আর অসম্ভব উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়েছে সেগুলোর ওপর। পচাই পুব-মুখে বসেছে বলে এক রাশ আলো এসে পড়েছে তার মুখে, চোখ দুটো কোঁচকানো।

কামিনী পুকুরঘাট থেকে দু-একটা থালাবাটি ধুয়ে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। সে সিংবাড়িতে কাজের আশায় গিয়েছিল গতকাল বিকেল বেলা, কিন্তু গতিক দেখে নিজেই সরে এসেছে। রাত্রে আর পচাইএর সঙ্গে কথা হয়নি। পচাইয়ের নিষেধ সত্ত্বেও সে গিয়েছিল, তাতে সে যেন বেটাব কাছেই অপরাধী। কতকটা নিজের মনেই বকবক করছে এমনিভাবে বলছিল, 'ভ্যালা রে ভ্যালা, বড় বাবু ডাকি' পাঠাইছে, ভাবলম উয়াদের ঘরকন্নার কাম, মাঠাকুরেনদের জল তুলব, বাটনা বাটব, গুয়াল কাডব, তা লয়, উই সিপাই-মেলেটারির চৌকি বসেচে, তার রান্না করতে হবেক, মাগ', ঘেন্নায় মরি, আমাদের মান-ময্যাদ নাই, উমুক (সনাতন, ওর স্বামী) মাহাত উ ঘরে সদ্দার ছিল নাই? বল পাঁচ জনে তুমরা, ছ্যা-ছ্যা…'

পচাই বোধ হয় এই ঘ্যানঘ্যানানিতে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, সে ঝাপ্‌টা মেরে থামিয়ে দিয়ে বললে, 'মুড়ি টুড়ি চাট্টি আছে, দিবি, না কি, ভেগে পড়ব…' বলতে বলতে ওর কণ্ঠস্বর বদ্‌লে গেল, 'মা, শাম্‌লী এস্‌ছে, দিদি…'

'হঁ, দিদি এস্‌ছে! কই…' ধড়মড় করে বেরিয়ে এল কামিনী।

পচাই সংশয়ী চোখে তাকিয়েছিল শাম্‌লীর দিকে, কী রকম নতুন লাগছিল যেন। এখনো সে পুকুরের পাড়ে, কাঁখে কলসী, কেমন নড়বড় করতে করতে হাঁটছে। পরেছে একটা নতুন সবুজ রঙের ডোরাকাটা শাড়ি।

'কী মা, কী মনে করে…' কামিনী দ্বিধাজড়িত স্বরে বললে।

শাম্‌লী উঠোনের ওপর পেতলের কলসীটা নামিয়ে রেখে দাওয়ায় উঠে এল, 'কেনে, এস্‌তে নাই না কি?'

'অ মা, আমি উই বললম কথা দেখ…'

শাম্‌লী বসল না, এমনভাবে দাঁড়িয়ে রইল যেন এই সব ঘরদোর তার অচেনা। তারপর ঝুলে-পড়া আঁচলটা কোমরে বেড় দিয়ে টেনে পরল,

পুকুরপাড়েও তার মাথায় কাপড় ছিল, এখন নেই।

'মা, ইবারে আমি ভাইফঁটা দিব, পচাইকে নিমন্তন্ন করতে এলম, তুমি সুদ্ধ খাবে আমাদের ঘরে, ই যে মঙ্গলবার এস্‌চে, উই বারে ··'

'অ মা, বলিস কী, তুই এত সব করছিস, হঁ গ', কেনে সব ?'

কিছু না বলে শাম্‌লী চুপ করে রইল, মায়ের দিকে অর্ধমনস্ক চোখ তুলে। ওর মুখাখানা পাতলা, শুকনো, কিন্তু মনে হয় চোখের ভেতর কোথাও মৃদু হাসিতে ভরে রয়েছে।

পচাই এক কাণ্ড করল, দাওয়ার ওপর থেকে উঠোনে লাফিয়ে দুই হাতের ওপর ভর দিয়ে কয়েকটা চর্‌কি ঘুরল, তারপর উঠে যেন কাড়ানাকড়ার ওপর ঘা দিচ্ছে এমনিভাবে দু'হাতের ভঙ্গি করে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল, 'দিগ-জিগ-জিজিক-কালা, জিগ-জিগ-জিজিক-কালা '

'থাম দিকি পচাই · ' কামিনী তর্জন করে উঠল, 'তোর লোতন শ্বশুর বুঝি বলেছে ইসব ?'

'হুঁ·· '

মেয়েটা কিছুতেই মুখ খুলছে না, অথচ কামিনী কথা বলা আর কথা শোনার জন্য আঁকুপাকু করে উঠছে। আর কিছু না পেরে কামিনী বললে, 'আয়, বস তুই, দাঁড়ায় আছিস কেনে, চারট' পান্তা ভাত দি, ভাইবোনে খেয়ে লে · '

শাম্‌লী মাটির ওপরই বসে পডল। কামিনী পেঁয়াজ-লঙ্কা-তেল দিয়ে জাম্বাটিতে করে ভাত মেখে দিলে, 'লে, তুই খা, ভাইকে খাই দে, আমি দেখি তুদের খাআ···'

আশ্চর্য এই, শাম্‌লী এতেও আপত্তি করল না, কিছু বললও না, ওকে যা বলছে তাই যেন করে যাচ্ছে, বাধ্য মেয়েটির মতো। পচাই শাম্‌লীর হাত থেকে মুখে ভাত নিতে নিতে বার বার তার দিকে তাকাচ্ছিল, 'দিদি, তোর লোতন কাপড়ট' খুব ফাইন · '

'হঁ রে, কাপড়ট' ত খুম মানাইচে, শ্বশুর কিনে দিলেক বুঝি ?' কামিনীও বললে, এক গাল হেসে।

'হঁ · ' পচাইয়ের মুখে ভাত তুলে এবং নিজের মুখে এক গ্রাস নিয়ে শাম্‌লী বললে, 'শ্বশুর বললেক, শাঁখা-সিঁদুর না পরুক, বউ-মনিষ্যির মতন কাপড়-চুপুড় পরবেক···'

'উ ভাল, তোর শ্বশুর কৌড়ি-বুড়া খুম বুঝদার লোক !'

এবার মুখ মুড়ে হাসল শাম্‌লী, 'আর শথ খুম, জান, উয়াদের বাচ্চা-মারা

হবেক, উই যে গ', এক বচ্ছর দেখেচি আমরা, তুমাদের সব লিমন্তন্ন করবেক, ভাইফঁটার আগের দিন হবেক ত, থালে তুমাদের পরপর দু'দিন খাআ হবেক আমাদের ঘরে '

'তা আবার হবেক নাই, তুর শ্বশুর বড়লোক···আহা, মহনট' যদি আমার বেঁচে থাকত ' কথাগুলো বলে ফেলেই কামিনীর কী হল, মুখের ওপর পাক দিতে লাগল, তারপর মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ডুকরে উঠল।

শাম্‌লী কিছু বলল না। মোহনের উল্লেখেও ওর কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না, এটা পচাইয়ের কেমন লাগল।

খাওয়ার পর চলে যাচ্ছিল শাম্‌লী, পুকুরপাড় পর্যন্ত গেছে, এমন সময় পচাই চেঁচিয়ে ডাকল, 'শাম্‌লীদিদি, তুর কলসীট' রইল যে, জল লি'যাবি নাই?'

'তুদের উখেনে থাক কলসীট', ফিরে এসে লি'যাব।'

'তুই কুথা যাবি, ঘরকে যাবি নাই?' পচাই আবার চেঁচাল।

মনে হল শাম্‌লী একবার উত্তর দেবে না, এগিয়ে গেল পাড় বরাবর। কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে ডাকল, 'পচাই, শুন···'

এক ছুটে পচাই শাম্‌লীর কাছে হাজির হল, 'কা বুলছিস?'

'আমার সঙ্গে যাবি এক জাগায়, আয় ··'

'কুথা যাবি তুই, বল আগে·· '

'যাব একট' জাগা, এক্ষুনি এসব. আয় না তুই।'

পচাই আর আপত্তি করল না, শাম্‌লীর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল।

ভালো লাগছিল পচাইয়ের। সেই একটা সময় গেছে যখন শাম্‌লীর সঙ্গে তার কেবলই ঠোকাঠুকি চলত, মায়ের সঙ্গেও, তারপর মোহনের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ, শাম্‌লীর বিয়ে, মোহনের মৃত্যু, সব কিছু বদলে গেছে। দু'দিন আগেও শাম্‌লীকে দেখে তার মনে হয়েছিল, দিদিটা মরে যাবে। কিন্তু এখন আর তা মনে হচ্ছে না। বুঝতে পারছে না ঠিক, কিন্তু মনে হচ্ছে শাম্‌লীর কিছু একটা হয়েছে।

শাম্‌লী ওকে নিয়ে মাঠের ধারে এসে পড়ল। গাজন দুলের যে জমিগুলো চাষ করেছিল মোহন, তাদের ভাইবোনেরও হাত ছিল, সেইখানে এসে দাঁড়াল ওরা। শাম্‌লী বললে, 'ইখেনে এলম, বুঝলি বোকা, জমিট' দেখতে এলম···'

তারপর কতক্ষণ আর কোনো কথা বলল না শাম্‌লী। মোহনের জমিটা দেখল, চোখ তুলে সমস্ত মাঠটার দিকে তাকাল। ফসল পেকে উঠছে। সবুজ রঙ তখনো মিলিয়ে যায়নি, কিন্তু পাকা রঙের ছোপ পড়তে আরম্ভ করেছে।

পচাই ছুটে গেল আল ধরে মাঠের মধ্যে, উচ্চ কণ্ঠে বললে, 'ই বছর খুব ধান হইচে, নারে দিদি?'

'হাই, অ পচাই, তুই করছিস কী!'

শাম্লীও ঠরঠর করে নেমে পড়ল আলের ওপর, 'ধানগুলা পা দিয়ে মাড়ায় দিছিস...'

প্রথমটা থতমত খেয়ে গিয়েছিল পচাই, তারপর হেসে উঠল, 'তুই পাগ্লা হই গেছিস, দিদি, কত লোক আল দিয়ে যাচ্ছে, তাদের পা পড়ে নাই? আর দু'দিন বাদে ধান কাটা ধান ঝাড়া হবেক, তখন ধান লষ্ট হবেক নাই।'

কথাগুলো বোধ হয় শাম্লীর কানে গেল না, ধানের যে শীষগুলো আলপথে হেলে পড়েছিল, সেগুলো যত্ন করে আল থেকে নামিয়ে জমির ওপর শুইয়ে দিতে লাগল। কতক্ষণ এমনি করার পর বললে, 'দুট' শীষ তুলি, কী বল পচাই?'

'দাঁড়া, আমি তুলে দি'...' পচাই খুব ফলন্ত দেখে দুটো শীষ তুলে ওর হাতে দিল।

হাসল শাম্লী, শীষের বোঁটা দুটো খোঁপাতে পাকিয়ে মুঠিতে ঝুলিয়ে নিলে, বললে, 'আয়, যাই...।'

সাতচল্লিশ

ভাইফোঁটার আগের দিন দুপুর বেলা গোপপাড়ার দিকে মাদল বেজে উঠল, ডুম্ডুম্-ডুডুম-ডুম্-ডুম্-ডুম্, একটানা বাজতে বাজতে এক সময় আওয়াজটা এগিয়ে আসতে লাগল। পড়িমড়ি করে রাস্তায় এসে পড়ল লোকজন, একঝাঁক ছিটকে-পড়া পাখির মতো বাচ্চা-বুঁচকিরা তখন চেঁচাচ্ছে, 'বাচ্চা-মারা হবেক, বাচ্চা-মারা...'

একটু পরেই দলটা এসে পড়ল। যাচ্ছে ওরা সেই বেড়টার দিকে, যেখানে সে রাত্রে বনার দল তীরকাঁড়ের তালিম আর শপথ নিচ্ছিল।

সবার আগে দুটো লোক মাদলে ঘা লাগাচ্ছে, নাচের আর চলার তালে একবার করে পিছনের দিকে মুখ করছে আবার ফিরে এগোচ্ছে। ওদের পিছনে মথুর কৌড়ি একটা বাচ্চা শূয়োর কাঁধে ফেলে আসছে। তার খালি গা, মল্লের মতো ধুতি পরা, তার ওপর কোমরে একটা নতুন লাল গামছা কষে বাঁধা। তার পিছনে অন্য লোকেরা, মেয়ে-পুরুষ, দশ-বারোটা গাই বাছুর নিয়ে আসছে।

তাদের হাতে বড় বড় লাঠি। শুকনো রাস্তার ধুলোতে, মানুষের হল্লায়, গরুর ডাকে সে একটা দারুণ অবস্থা।

বাজা-মারা দলে মেয়েদের সঙ্গে ছিল শাম্‌লী, তাদের নিমন্ত্রিত পচাইও ছিল—আগের লোকগুলোর সঙ্গে। সেখান থেকে একবার চেঁচিয়ে পচাই ডাকল, 'দিদি · শাম্‌লীদিদি' কিন্তু মাদলের শব্দে আর হল্লায় ডাকটা সে শুনতে পেল বলে মনে হল না।

বেড়টায় আগে থেকেই লোকজন আসতে আরম্ভ করেছিল এই দলটা সেখানে পৌছতেই মাঠের মধ্যিখানের জায়গাটা ঘিরে দাড়াল সবাই। মাদলের আওয়াজে গাছের মাথায় পাখিগুলো পাক দিয়ে ঘুরতে লাগল, কতকগুলো উড়ে গেল অন্য দিকে।

'হট যাও, হট যাও ·' মথুর হেঁকে বলল, জায়গাটার মাঝখানে ঢুকতে গিয়ে। 'অ্যাই, বাজি থামাও ··' হাত লম্বা করে বাড়িয়ে নির্দেশ দিল ও। হঠাৎ সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

'[illegible] ··' জায়গাটার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মথুর, তার কাঁধে শূয়ার বাচ্চাটা ঠিক রয়েছে. শাদা-কালোয় বাচ্চাটা, তখনও ভালো করে বোঁয়া ওঠেনি, মথুরের কাঁধের ওপর কিঁচ্‌কিঁচ্‌ শব্দ করে ভয়ে লাফিয়ে পড়তে চাচ্ছে কিন্তু একটা বজ্র-মুঠি ধরে রেখেছে সেটাকে।

মথুরের গলার স্বর যেন গাকগাক করছে, তবু একটু জড়ানো, যেমন সে তেমনি তার দলের পুরুষগুলো পচুইয়ে চুবচুব হয়ে উঠেছে—'এই শালাঃ, বুদিকে লি'আগ ইদিকে···'

গরুগুলোর মধ্যে অধিকাংশই গাই. দু-একটা বড় বাছুরও আছে যাদের শিং বেরোতে শুরু করেছে। আজ ভোরেই গরুগুলোর পুজো হয়েছে, তাদের গায়ে-মাথায় শিংএর গোড়ায় তেল হলুদ সিঁদুর মাখানো। মেয়েরা যারা গরু এনেছিল তারা পুরুষদের হাতে সেগুলোকে দিয়ে সরে দাঁড়াল। পুরুষরা বাচ্চা-কাঁধে মথুরকে মাঝখানে রেখে এক হাতে গরুর দড়ি অন্য হাতে লাঠি নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াল। পচুই খেয়ে সবারই মথুরের মতো অবস্থা। অন্য দিকে দর্শকরা সবাই গুম খেয়ে রয়েছে, কী হয় কী হয়।

পচাই শাম্‌লীর কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল, শাম্‌লীর মুখে-চোখে উত্তেজনার ছাপ. বললে, 'পচাই, তুই যা, তাড়নেবালা হবি।'

'হুঁ, আমি কেনে···' বলল বটে পচাই, কিন্তু তারও শরীরে তখন গরম ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। মথুরের কাঁধে বাচ্চা শূয়ারটার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল সে।

হঠাৎ কেন জানি শাম্‌লীকে ও বললে, 'তোর কবে বাচ্চা হবেক রে ?'

মথুরের চোখ ঠিক পড়েছে পচাইয়ের ওপর, বাচ্চাটাকে কাঁধ বদল করে গাঁক গাঁক করে উঠল, 'পচাইমামা, তুমি দাঁড়ি' কেনে, লাও লাও লাঠিটি' লাও··' বলে ওর নিজের লাঠিটাই পচাইয়ের দিকে ছুঁড়ে দিলে। পচাইও সেটা তুলে নিয়ে চক্রে গিয়ে দাড়াল।

বাচ্চা-মারা অনুষ্ঠানটা গাই-বাছুরের কল্যাণে, চাষবাসের, চারা ধানেরও— শূয়ারের বাচ্চা মেরে। পচাইরা আগেও দেখেছে, কিন্তু তার মানে জানত না। পচাই গিয়ে লাঠি হাতে দাঁড়াতে হাসল শাম্‌লী, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি ক্রমেই তীক্ষ্ণ, তারপর জ্বলে উঠতে লাগল।

মথুর হাঁকল, 'বাজনা বাজা··' বলে ও ডান পাটা বাড়িয়ে মাটিতে ঠুকে ঠুকে যেন বাজনার তালটা দেখিয়ে দিতে লাগল।

ডুম-ডুম্-ডুডুম ডুম-ডুম-ডুম—

গাছে-বসা পাখিগুলো আবার ছটকে পড়ল, মানুষগুলো চিৎকার দিল, ভয়-পাওয়া গরুগুলো ডাক ছাড়ল।

মথুর ইঙ্গিতে বুদি গাইটাকে মাঝখানে আনতে বলল, বড় বড় শিংওয়ালা গরুটাকে টেনে আনল মাঝখানে।

মথুর মুখে বিচিত্র হুম্‌হুম্ শব্দ করতে করতে বাচ্চাটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে বুদির সিংএর কাছে ধরল, একবার গাইটার দিকে এগিয়ে দিল তারপর পিছিয়ে নিল, যেন দোল দিচ্ছে। বুদি প্রথমটায় ভয় পেল কিন্তু সেই ভয় থেকেই উত্তেজিত হয়ে উঠল। এগোন-পিছোন দোল দিতে দিতে যেই বুদি গুঁতোবার মতো করে তেড়ে এল, মথুর ছেড়ে দিল বাচ্চাটাকে। একটা গোঁত্তা খেয়ে লুটিয়ে পড়ল বাচ্চাটা, কিন্তু পরক্ষণেই উঠে পড়ে প্রাণের দায়ে ছুটল। তখন চারপাশে ঘিরে থাকা লোকগুলো লাঠির খোঁচা দিয়ে শূয়োরটাকে এক একটা গরুর সামনে ঠেলে দিতে লাগল।

একটু পরেই দু-তিনটে গাই মিলে বাচ্চাটাকে যখন শিং দিয়ে মাটিতে চেপে ধরেছে, তখন সেই উত্তেজিত জনতার মাঝখানে শাম্‌লী চিৎকার করে হেসে উঠল, তার সমস্ত শরীরটা দুলছে।

আটচল্লিশ

ধীরে ধীরে এগোচ্ছে, বদলাচ্ছে সব কিছু। বর্ষায় রাস্তাঘাটে যে সব খানাখন্দ সৃষ্টি হয়েছিল আর জল জমেছিল, সে সব শুকিয়ে খটখটে হয়ে উঠল। এবড়ো-খেবড়ো এত শক্ত যে তার ওপর পা ফেললেই যেন বল্লমের খোঁচা মারে। তারপর তাতে পা পড়তে পড়তে ফাটল ধরে, ভেঙে যায়, শেষে গুঁড়ো হয়ে ওঠে। খাল-বিল-পুকুর টলমল করছিল জলে ভর্তি হয়ে, এখন সে জল নিচে পড়েছে, পুকুরের কোলে হিঞ্চে-কলমির লতা শুকিয়ে গেছে, ফুলের ওপর ফড়িং বসে দোল খায় না। দিনের বেলা রোদের তাপ বেশ চড়া, রাত্রে ঠাণ্ডা পড়ে।

তারপর অঘ্রানের দিনগুলো আসে, ভরন্ত হয়, আবার গড়িয়ে যেতে থাকে। উত্তুরে বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে, গাছের পাতাগুলো সিরসির করে কাঁপে, আর মাঠের রং বদলে যেতে থাকে। ধানগাছগুলো এখন শুয়ে পড়েছে, গোছা-গোছা শীষের ভারে. এবারে ফসল ফলেছে ভালো। এক কালের হালি রং যেন নীল হয়েছিল, এখন হলদেটে সাদা, তার এখানে-ওখানে মেটে রঙ। আর কটা দিন, তারপরই [illegible]।

গ্রামের বাড়ি-ঘরেরও বদল হচ্ছে। বছরে একবার করে কালিঝুল ঝাড়া হয়, কেউ করে আশ্বিন মাসে, কেউ ধান কাটার আগে। পুরনো মরাই কোরই পরিষ্কার করে ছাতা দেওয়া হয়, খামার চেঁছে-ছুলে গোবরমাটি দিয়ে লেপেপুঁছে তকতকে করে, কাটা ধানের বোঝা এনে এখানে ফেলা হবে বলিদানের পরে পশুর মুণ্ড যেমন করে এনে বেদীর ওপর রাখা হয়।

মানুষের চলা-ফেরা, কথাবার্তাও বদলাচ্ছে।

আড়াইকোশী মাঠটায় লোক যায়, কখনো একলা, কখনো কয়েক জন এক সঙ্গে, শুয়ে-পড়া, দাঁড়িয়ে-থাকা ধানগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে, চোখে শিকরে পাখির দৃষ্টি। সকালে যায়, আবার বিকেলেও যায়। অন্য লোকগুলোকে দেখে, একই দৃষ্টিতে। কবে কে প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়বে!

অবশেষে এক সকালে জন তিনেকের একটা দলকে দেখা গেল মাঠের দিকে এগিয়ে যেতে। বাচ্চা-মারা বেড়টা পেরিয়ে গেল ওরা, মাঠের মুখে হিজল গাছটার তলায় দাঁড়াল একবার। সামনে পড়ে-থাকা মাঠটার দিকে তাকাল, পাতলা কুয়াশার জন্য দূরে ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণভুঁইএর জঙ্গল একটা

ঝাপসা কালো পোঁচের মতো দেখা যায়। একটু বাঁ দিকে কুয়াশা ভেদ করে আলো এসে পড়ছে মাঠের ওপর।

'লে, বিড়ি খা, ফকুরে…'

ওদের মধ্যে বুড়ো গোছের লোকটা ডোরা-কাটা ময়লা চাদরের মধ্যে হাতড়াতে লাগল, ট্যাঁক থেকে বিড়ি বের করবার সময় নতুন শান দেওয়া কাস্তেটা চেপে ধরল বাঁ বগলে। ফকির ছোকরা গোছের, সে গেঞ্জির ওপর কেবল কোঁচার খুঁটটা জড়িয়ে নিয়েছিল, তার কাস্তেটা কোমরে গুঁজে সে বিড়িটা ধরাল, ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'মামা গ', তুমিও ধরি' লাও গা তাতি' লাও…'

ধোঁয়ার মধ্যে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা, তারপর মাঠের দিকে, শীতে হাত পা কাঁপছে একটু একটু, চোখ কোঁচকানো আর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। এক মুহূর্ত সেইভাবে তাকিয়ে থেকে মাঠের মধ্যে তরতর করে নেমে পড়ল ওরা, মোটা আলের রাস্তা ধবে। তিন জনেই কাস্তেগুলো তখন হাতের মুঠিতে ধরেছে, নতুন শানানো লম্বা ফলাগুলো ঝকঝক করছে, দুলছে চলার তালে তালে।

কিছু দূর এগোনর পর একটা মোড়ের মাথায় এসে পড়ল ওরা। এখন ডান দিকে দূরে সিংপুকুরের উঁচু বাঁধ, বাঁ দিকে তেগাছার পথ। বাঁ দিকেই আরো খানিকটা এগিয়ে ডাইনে নামল মাঠের মধ্যে, এখন সরু আলপথ। আলগুলোর ওপর ঘন ঘাস, তার ওপর এদিক-ওদিক থেকে ধানের শীষ লুটিয়ে পড়েছে।

'ইস্…শালা, সাপ্…' ফকির লাফ দিয়ে পিছিয়ে পড়ল, ভালো করে দেখবার আগেই হিলহিল করে ধানের বনে ঢুকে গেল সাপটা।

'চ-চ · ' বুড়ো লোকটা বললে, উদাসীনভাবে।

'শালাঃ, আর একটু হলেই চটি' দিত !'

'তুদের যেমন · ' বুড়ো লোকটা ঘড়ঘড়ে গলায় বললে, 'দেখলি নাই, বাঁয়ে ঠিঙে ডাইনে গেল, শুভযাত্তা, লে, চ…'

ওদের লক্ষস্থল জমিটার আলে এসে দাঁড়াল ওরা। আলের ওপর কাস্তেগুলো শুইয়ে রাখল। সকালের রোদে ঘাসের শিশির আর কাস্তের ফলাগুলো চকচক করে উঠল।

বুড়োটা গায়ের চাদর বুকের ওপর পাক দিয়ে জড়িয়ে নিলে। ফকির কাপড়ের খুঁট গা থেকে খুলে কোমরে বেড় দিয়ে কষে বাঁধল, অন্য জন চাদরটা বাঁধল কোমরে।

জমির একটা কোণে নামল ওরা, একটা ইঁদুর লাফিয়ে পালাল, উচ্চিংড়ে

লাফাতে আরম্ভ করল কতকটা জায়গা জুড়ে, তাদের নিশ্চিন্ত বাসভূমি আক্রান্ত হয়েছে। ফকিরের পায়ের নিচে একটা উচ্চিংড়ে চটকে গেছে।

ফকির বুড়োকে বলল, 'তুমি আম্ব (আরম্ভ) কর দিকি, হেতের ধর তুমি আগে···'

বুড়োটা পুবমুখো হয়ে দাঁড়াল। দু'হাতে কাস্তের বাঁটটা ধরেছে, তুলল মাথার ওপর দুটো হাত জড়ো করে প্রণাম করার ভঙ্গিতে, কাস্তেটা আলোতে উঁচু হয়ে রয়েছে, মুখ নিচের দিকে, যেন মন্তর পড়ছে এমনিভাবে ঠোঁট নড়ছে। তারপর ওপর থেকে হাত নামাল।

নিচু হয়ে বাঁহাতে ধরল একটা ধানগোছের গোড়া, ডান হাতে গলায় বেড় দেবার মতো কাস্তে দিয়ে ঘিরে নিল গোছটা, একটা শুকিয়ে-ওঠা কেঁচোয়-তোলা মাটি ভেঙে পড়ল, তারপর ঘ্যাচ্ করে টান পড়ল একটা। ধানগাছের সঙ্গে কয়েকটা ঘাসও কাটা হয়ে উঠল বুড়োর হাতে। বুড়ো গোছটা বাঁ হাতে তুলে ঘুরিয়ে নিয়ে এল এক পাক, তাতে শুয়ে-থাকা অন্য গোছগুলোর থেকে সেটা বিচ্ছিন্ন হল, তারপর সেই কাটা গোছটা সমেত অন্য গোছের গলা চেপে ধরল। এই রকম তিন-চারটে গোছ কাটার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতটা ভরে উঠল, রাখল জমির ওপর, একটা হালা পূর্ণ হল, এই রকম দু'হালায় এক আঁটি ধান হবে।

বুড়োটা এক আঁটি কাটার পর, অন্য দুজনও কাটতে আরম্ভ করল। শব্দ হচ্ছে ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্ করে, পোকামাকড় লাফাচ্ছে, মরছে দু'একটা। ধান কাটার পর শুইয়ে রাখছে সবুজ সবুজ ঘাসের ওপর, ঘাসগুলো একেবারে উল্টো ছবি, রোদ লেগে যেন ঝিকঝিক করছে। ক'দিন পরে ধান তুলে নিয়ে গেলে গরুবাছুর নিঃশেষে মুড়িয়ে খাবে ওই ঘাসগুলোই, চৈত্রে-বৈশাখে ওগুলোর মূল পর্যন্ত শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, পরের বর্ষায় আবার কচি পাতা মেলবার আগে।

উনপঞ্চাশ

এপার-ওপার বালিতে-চড়ায় ধূ-ধূ করছে, মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে জলের একটা ফালি, গ্রামের লোকেরা বলে শিয়াল-পেরোন নদী। একদিন বর্ষার ঘোলাটে জল প্রথম এসে পড়ল। আর, মাত্র কয়েক দিনের, এমন কি কয়েক

ঘণ্টার মধ্যে তাতে বান ডেকে গেল, স্রোতে আবর্তে বিস্তারে তার বিস্ময়কর রূপ।

এক সকালে বুড়োটা ফক্‌বেদের নিয়ে যার সূচনা করল, চার-পাঁচ দিনের মধ্যে চাঁদসোলের আড়াইক্রোশী মাঠে সেটা বহুবিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, অসংখ্য মানুষ নেমে পড়েছে মাঠের মধ্যে, ফসল তুলে ঘরে নিয়ে যেতে হবে।

স্রোতে যেমন ভাঙে, তেমনি কখনো কখনো নতুন কিছু গড়ে তোলে, আগে থেকে কিছুই বোঝা যায় না, হঠাৎ একটা চর জেগে উঠল, সবাই দেখল আর স্বীকার করে নিল।

সেই ধান চাষের সময় মথুর কৌড়ি বেশ উৎসাহ আর কাজ দেখিয়ে ছিল, আর এই ধান কাটার সময় কী করে সে যেন সমস্ত কর্মধারার কেন্দ্র হয়ে উঠল, অথচ কেউ তাকে বলেনি, নির্বাচিত করেনি, নিজে সে জানতও না।

সেদিন সকালে মথুর কৌড়ি মাঠের দিকে বেরিয়ে পড়েছে। তার সঙ্গে আছে আরো পাঁচ-সাত জন, আজকাল কিছু লোক সর্বদাই থাকে তার সঙ্গে, তাদের মধ্যে শাম্‌লীর মা কামিনীও আছে।

বিপরীত দিক থেকে একটা লোক আসছিল, শীতের কাপড়ে-চাদরে বেশ জবুথবু ভাব কিন্তু পা ফেলছিল বেশ লম্বা-লম্বা, কাছে আসতেই বোঝা গেল লারাণ জেলে।

'হেঁই গ', রাজাদাদা, তুমার কাছেই যাচ্ছিলম…'

এই কিছুদিন থেকে লারাণ মথুরকে রাজাদাদা, রাজাবাবু বলে ডাকতে আরম্ভ করেছে। মথুররা সদ্‌গোপ, তাদের পূর্বপুরুষ রাজপুত, পরে এদেশে বিয়ে-সাদীর চল হয়েছে—কিন্তু সে জন্যে নয়, হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়েছে, মথুরের দু'দিক দুই বাহুর মাঝখানে একই রকম জায়গায় বেশ বড় ধরনের রক্তাভ দুটো জড়ুল চিহ্ন আছে। ভিতরের দিকে বলে বিশেষ কারুর চোখে পড়ত না, মথুরের নিজের চোখে পড়লেও লক্ষ করত না, কিন্তু সেটা লারাণের নজর এড়ায়নি। সে বলেছিল, 'হঁ-হঁ, ই ত রাজালোকের চিহ্ন, তুমি রাজা হবে, আর রাজা নয় ত কা, তুমি এখন ত আমাদের রাজা হইচ বটে, ই তল্লাটে দশট'-বিশট' গাঁয়ের লোক তুমার ডাকে সাড়া দিবেক, ই কথা আমি হাঁক দিয়ে বলব…'। সেই রাজাদাদা ডাক এখন অনেকের মুখে।

যাই হোক, লারাণের কথায় মথুরের চলার বেগ একটু কমল, ভুরু কুঁচকে বললে, 'কেনে, সাত সকালাই আমার কাছে কেনে?'

'তুমার কাছে এস্‌ব নাই ত যাব কার কাছে! আজ থিকে থালে ধান বওয়া আম্ব করব কি?'

মথুরের সোজা জবাব, তাছাড়া লারাণের মতিগতি সম্বন্ধে মন দেবার মতো মনের অবস্থা নয় ওর, বললে, 'অ! সে কথা আমি ত বলে দিইচি সক্কলকে, ধান কাটা আর এঁটানা হলে তুলে ফেলবেক, আগের সুবাদে দু' রোদ তিন রোদ লাগাইতে হবেক নাই, দিনকাল সে রকম লয়, বুঝলে লারাণ?'

লারাণ আবার কৃতার্থের হাসি হাসল। সে পিছন পিছন বলতে বলতে চলল, 'ই কথাটি শুধাবার জন্যে তুমার কাছে ছুটে এইছিলম। তুমি একবার হুঁ বললে, তবে আমি জেলে-পাড়ার সব ছেলে-ছোক্‌রাকে বলে দিব। উয়ারা ত সব উচ্‌কে উঠেছে একবারে, কেউ বলে লারাণদা তুমি বল, কেউ বলে লারাণজ্যাঠা তুমি বল, আমি বললম ই আমার মাথার কাম লয়, রাজাদাদা যা বলবেক তাই হবেক…' লারাণের গলায় ভেজা জায়গার ওপর দিয়ে কথাগুলো গড়াতে লাগল যেন।

'উ সব কথা ছাড়ান দাও…' বলল মথুর, তারপর লারাণ উপলক্ষ হলেও সবাইকে লক্ষ করে সে দরাজ গলায় আবার বলতে লাগল, 'ই যে তুমরা সব রাজসূয় যজ্ঞি আরম্ভ করলে, ভাই, দেখ, সাবধান, যেমন দক্ষযজ্ঞি না হয়ে যায়, ইঁ-হ, বাবা, যে-সে বাও-য়া নয়!'

মথুর বেশ বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে, লারাণ একটু পিছিয়ে এল। পাশে কামিনীকে পেয়ে বললে, 'তুমিও চললে থালে, দিদি, ধান কাটতে তুমিও লাগছ থালে?'

কামিনীর পা একটু নেংচানো হলেও জোরে চলছিল ঠিক, বললে, 'না গ', আমি ধান কাটব নাই, আমি বওয়ার কাম করব, উনি ত তাই বললেন…' উদ্দেশ্যে মথুরকে বোঝাল সে।

'বেশ, বেশ, আমি যাই থালে, পাড়ার লোকগুলাকে আবার খপর দিতে হবেক…' মাঠে পড়বার আগে একটা মোড়ের মাথায় অন্য পথ ধরল সে।

আড়াইকোশী মাঠটায় পড়বার মুখেই গাজন দুলের জমি। সেখানে শ্যামলী আর দুলির মা আগেই এসে গিয়েছিল, ধান কাটতেও শুরু করেছিল। দুজনেই সদল মথুরকে দেখে ধান কাটা ছেড়ে দাঁড়াল, শ্যামলী মাথায় কাপড় টেনে দিলে।

মথুর সবেগে আলের ওপর নেমে পড়ল, চলতে চলতেই বললে, 'বৌমা, ধান কেটে ফেলায় বাধবেক নাই, কাটবে, এঁটাবে আর তুলে লিবে, মাঠে কারো ধান পড়ে থাকবেক নাই…' শেষ কথাটা বেশ জোরে জোরে বলল ও,

যেন আর পাঁচ জনেও শুনতে পায়।

'তুলির মা, তুমি থালে আজ বৌমার জমিএ লাগিছ। বেশ, বেশ, কাম করলেই হল, মাঠ থিকে সব ধান উঠাইতে হবেক, ই কি চাট্টিখেনি কথা, বলে রাজসূয় কাণ্ড, লাগ লাগ, কাজে লেগে যাও…'

'তা তুমি ভাই বিয়ানকে শুদ্ধ লিয়ে চললে যে, বলি শুনছ · ' তুলির মা কাস্তে সমেত হাতটা দোলাতে লাগল, 'বলি, তুমরা যুগল-কি'র কুন জমিএ লাগবে গ', বিয়াই-বিয়ানে একসঙ্গে লাগলে বাকি থাকবেক কিছু, খি-খি · '

তুলির মার রঙ্গরসের সঙ্গে সকলেই পরিচিত, মথুর সমেত সবাই ফিকফিক করে হাসতে লাগল। কামিনী মুখ মুড়ে বলে উঠল, 'মরণ! সক্কাল বেলা…'

মথুরকে রাজাদাদা বলেছিল নারাণ, তার চেহারা কতকটা সেই রকমই বটে। বেশ দীর্ঘাকার, হাত চারেকের মতো হবে, তেমনি লম্বা হাত-পা, একখানা কাস্তে হাতে নিয়ে দ্রুত আলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। মোটা ধুতি খাটো করে হাঁটুর ওপুর পরা, পেটে মেদ নেই, শক্ত করে কোমরে কাপড়ের বেড দেওয়া, এই শীতেও কেবল একটা গেঞ্জি গায়ে, চাদরটা গায়ে নেই মাথায় পাগড়ী হয়েছে। হাঁটছে তেমনি দৃঢ় লম্বা পদক্ষেপে, মাটির ওপর যে শিশিরের এক পুরু ভিজে ছিল, সেটা ভেঙে গিয়ে শুকনো ধুলো দেখা দিচ্ছে, ওর পায়ের ছাপ পড়ে যাচ্ছে রাস্তার ওপর।

সকাল বেলার উজ্জ্বল আলো পড়েছে মাঠের ওপর, ঘাসের ওপর শিশির ঝিকঝিক করছে। মথুর পুব মুখে যাচ্ছে বলে চোখে রোদ লাগছে ঝলক দিয়ে। বাঁ হাতে চোখে আড়াল দিয়ে দূরে তাকাচ্ছে মথুর, মুখে একটা গর্বের হাসি ফুটে উঠছে। ইতিমধ্যে মাঠের অনেকখানিতে কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে, তাছাড়া চার দিকের গ্রাম থেকে সারি দিয়ে লোকজন বেরিয়ে আসছে, আহার সন্ধানে পিঁপড়ের মতো। ঝপাঝপ কাস্তে হান্‌ছে, যতজন কাটছে ততজন আঁটি বাঁধছে। কাটা ধানগাছগুলো ওদের হাতে হাতে শূন্যে উঠছে, ঘুরপাক খাচ্ছে, তারপর মাটিতে শুয়ে পড়ছে গোছায় গোছায়। সমস্ত মাঠটাই তাদের মৃত্যুশয্যা হয়ে উঠেছে, যেখানে চাষের ঋতুতে খাদ্য-পানীয় টেনে নিয়ে সেগুলো পুষ্ট হয়ে উঠেছিল।

হঠাৎ পিছন ফিরে কামিনীকে সম্বোধন করে বলে উঠল মথুর, 'কেমন দেখছ গ' বিয়ান, মাঠের হালচাল কেমন দেখছ?' আজকাল সে কামিনীকে কখনো বিয়ান, কখনো বউদিদি বলে ডাকে। তারপর তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না

করে যোগ করল, 'আজ দিনমানে বার আনা কাটা হয়ে যাবেক, কী বল্ল, আর সিকি উঠে যাবেক মাঠ থিকে ···'

'হুঁ···' বলল কামিনী, কিন্তু সে কী বলছে তার ধারণাই ছিল না। তার চোখে বোকা বোকা বিস্ময়ের ভাব, কেবল এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। আসলে, যদিও এই গ্রামেই তার সারাটা জীবন কেটেছে, চাষী আর মুনিষদের মধ্যে, তবু মাঠের কাজ, বিশেষ করে চাষবাসের সঙ্গে তার কোনো পরিচয়ই ছিল না। যতদিন সনাতন মাহাতো জীবিত ছিল, কামিনী ঘরকন্নার কাজ করেছে, স্বামী মারা যাবার পর অন্য লোকের বাড়িতে কখনো করেছে ঝি-গিরি, কখনো সেদ্ধ-শুকনো, ক্বচিৎ রান্নার কাজ।

জমির পর জমিতে কাটা ধানের আঁটি শোয়ানো রয়েছে সারে সারে, তার কাছে সেটা অবাক দৃশ্য। সে পাশের মেয়েটাকে বললে, 'ই কী কাণ্ড! কত কুড়ি লোক লেগেছে বল দিকিন ···' তারপর হঠাৎ আক্ষেপের স্বরে বলে উঠল, 'ধানগাছগুলাকে নিমুন করে দিলেক গ', বিছায় দিছে দেখ, মড়াচিরে যেমন কাঠ বিছায় দিছে, হঁ ·'

তার জনান্তিকে উক্তি মথুরের কানে গেল না, সে আবার তাকেই বললে, 'বিয়ান, বৌমাকে দেখলে, তুমার বিটীকে, পাকা চাষী গিন্নীর মত ধান কাটছে! শুন, মহনের ধান সব উঠবেক গাজনের ঘরে, সব ধান, আর বেতের বেলাকে তুমি থাকবে সেখেনে, পচাই আর তুমি, বৌমার ধান, কিন্তু বৌমাকে আমার গিন্নী ছাড়বেক নাই, সে আজকাল খুব শাউড়ী হইচে, হাঃ-হাঃ··· '

মথুর হাঁটছে আর আশেপাশের জমি থেকে কথা বলছে ওর সঙ্গে, মেয়ে-মদ্দ, জোয়ান-বুড়ো সবাই, যার যেমন গ্রাম-সুবাদ, নইলে মথুরকে রাজাবাবু বলে! তাদের উত্তর দেবার ফাঁকে ফাঁকে কামিনীকে মথুর আবার বললে, 'হুঁ, আসল কথা ভুলে যাও নাই ত, তুমার আসল কাম? ধান তুমি ই বেলা যত পার বয়ে লাও, দুফর থিকে মাঠে আর আসবে নাই, বিকালা সেই ধান পাটা পেতে ঝাড়বেক, তুমাকে আরও লোক দিব আমি, আর কাল থিকে সিদ্ধ-শুকনা, বুঝলে? তারপর ত তুমার ঘরে লোতন চালের ভাত. ভোজ লাগায় যাবেক · '

মথুরকে এখন সব দিক ভাবতে আর সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। ধান কাটা আর ধান তোলার যে কাজকে সে রাজসূয় যজ্ঞ বলছে, তার জন্যে দূর দূর গাঁ থেকে অনেক লোকজন আসছে, আরো আসবে। তারা মজুরি পাবে না, ধান নিয়ে যাবে ন্যায্য ভাগে। কিন্তু দু-দশদিন গাঁয়ে থাকবে তারা, চারটি তো খেতে দিতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় তাই অন্নসত্রের ব্যবস্থা করতে

হচ্ছে। কামিনীকে তাদের পাড়ার ভার দেওয়া হয়েছে।

কামিনী ইতিমধ্যে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, বললে, 'উ আমি ঠিক পারব, তুমি দেখে লিবে…'

বেলা বাড়ার সঙ্গে লোকজন বেড়েছে, কাজের পরিধি আর পরিমাণও। মথুরকে মাঠের এখানে ওখানে ঘুরে আসতে হচ্ছে, যেখানে যেতে পারছে না সেখান থেকে লোক মারফত খবর নিচ্ছে, খবর পাঠাচ্ছেও। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে এমন সময় নিজের কাজের জায়গায়—সেই রতন দিগারের সঙ্গে চষা জমিতে এসে কতকটা সুস্থির হতে পারল ও। আলের ওপর বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে টান দিতে লাগল। অনেক আগেই সে মাথার পাগড়া আর গায়ের গেঞ্জি খুলে ফেলেছিল।

সেই সময় কামিনী গ্রাম থেকে ধানের বোঝা নামিয়ে ফিরে এল, এর মধ্যে দু ক্ষেপ করেছে সে। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, গায়ে-মুখে খড়ি উঠছে, চুলগুলো ঝুলছে শণনুড়ির মতো।

এবার মথুরেরই রসিকতা করার ইচ্ছে জেগে উঠল, বললে, 'বিয়ান, ধান বয়ে বয়ে তুমি হাল্লাক হয়ে গেলে যে, এস এস, ই আলটা'য় বস দিকিন, বিড়ি খাও একট'…'

'ধুর, তুমার এক কথা! খাও কেনে তুমি…' বলতে বলতে এগিয়ে এল কামিনী। একটু দূরে আলের ওপর বসে পড়ল, সেও একটু বিশ্রাম করে নিতে চায়।

একটু পরে সে নিজেই কিন্তু উঠে পড়ল, বললে, 'আর জিরালে চলবেক নাই, কাম সেরে তারপর গড়াব. গা-গতরে খিল ধরে যাচ্ছে গ', লাও উঠ দিক, বঝা বাঁধ…'

মথুর ওর মাথায় বোঝা তুলে দিয়ে বললে, 'তুমার আর আসতে হবেক নাই, বিয়ান, এইট' তুমার খামারে ফেলে দিয়ে জিরাও গে…'

মথুর ফিরে এসে বসল আলটায়, বিড়ি ধরাল আবার। ও চার দিকে তাকিয়ে কী রকম একটা আমেজ অনুভব করছে। পাশের জমি থেকে এক বুড়ো এসে বসল ওর পাশে, বললে, 'একট' বিড়ি দাও দিকি, রাজাদাদা…'

'তুমিও উই বুলি ধরলে…' কাঁচুমাচু হল মথর।

বিড়িতে টান মেরে কেশে উঠল বুড়োটা, 'তা বলব নাই? আলবাৎ বলব…' কাশিটা একটু সামলে হাসবার চেষ্টা করল সে, 'তুমার বিয়ান লোক ভাল, রাজাদাদা!'

'কেনে…' মথুর ভুরু কুঁচকোল কিন্তু পরক্ষণেই যোগ করল, 'হুঁ, ভাল ভাল, সবাই ভাল লোক, তুমি ভাল আমি ভাল…'

'এইটা' তুমি কী রকম বলছ, রাজাদাদা, দুনিয়ার সব লোক ভাল? খালে…'

ঘাড় নাড়তে লাগল মথুর, 'বুঝলে মণ্ডল, এক সময় মনের মধ্যে আমার কষ্ট ছিল খুব, নির্ব্বংশ হলম গো, রাজপুত সদ্গোপের বংশ আমাদের, বাপের বংশ… এই তুমার সেই জমি, এখেনেই, সেই উখেনটায় বজ্জাঘাত হয়ে মরে গেল বেটা, কার মনে দুঃখ হয় নাই বল, বউটা পাগল হয়ে গেছল, তার জোগাড়…তুকতাক করল, ঝাড়ফুঁক করল, মাটি নি'গেল জমি থিকে, এই জমিটা, ত ছেলে হল নাই। ত কালচক্ক দেখ, মদন আমার বেটা হয়ে এল, কিন্তু মন্দ কপাল, সেনাপতি মরল যুদ্ধে, কিন্তু তায় আমার দুঃখ নাই, বৌমা আমার গর্ভবতী, তুমাদের আশীর্বাদে ভালয় ভালয় হয়ে যাক, বংশটা রক্ষে হউক ব্যাপার বুঝ, মদনকে তুলে এনে জানতম, ত কি, না বামুনের ছেলে…'

বুড়োটা আমতা আমতা করে আপত্তি করল, 'কিন্তু তুমার রক্ত লয়, তুমার বংশ…'

মথুর খুব সজোরে কিন্তু সহর্ষে বলে উঠল, 'উ কথা বলবেক নাই, মণ্ডল, দত্তক নিয়েছি মনে কর, আমাদের রাজপুত রাজবংশে দত্তক নিয়ে কত চলেছে, সেসব শাস্তর আমি জানি, হাঃ হাঃ…তাই বলছিলম, আমার মনে কুনু দুঃখ নাই, আর কী জান, আপ ভাল ত দুনিয়া ভাল, সব লোক ভাল…'

ঠিক সেই সময় ফুরফুর করে একটা বাতাস বয়ে গেল। উঠে দাঁড়াল মথুর। বাতাসের দিকে মুখ করে কেন জানি বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলে ও।

দু-তিনটে জমির অন্তরে একজন লোক তার বউএর মাথায় ধানের বোঝা তুলে দিচ্ছিল, বউ টাল সামলাতে না পেরে ফেলে দিল বোঝাটা। মেয়েটা ভয়-খাওয়া চোখে কুতকুত করে তাকাচ্ছিল স্বামীর দিকে।

'আহা-হা, কর কী, জুতসই করে বঝা তুল…' বলতে বলতে মথুর এগিয়ে গেল। মেয়েটা লজ্জা করে মুখ ফেরাচ্ছিল, কিন্তু মথুর তার স্বামীর কোমর থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে ভাজ করে ফেলল, মেয়েটির মাথায় বসিয়ে তারপর বোঝাটা নিজে তুলে দিল। ওরা হাসল সলজ্জ এক রকম করে।

মথুর হেসে বলে উঠল, 'মাঠের বাহার হইচে দেখেছ, দেখ-দেখ…'

আশেপাশের কর্মরত মেয়েপুরুষ ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে কাছ থেকে তাকাল দূরের দিকে। একটিই ঢেউ, নানা জনের মধ্য দিয়ে নানা রকম করে এগিয়ে যাচ্ছে। কেউ ধান কাটছে, কেউ আঁটি বাঁধছে, তারপর বোঝা বাঁধা, তারপর

বয়ে নিয়ে যাওয়া। গ্রামের থেকে ফিরে আসছে আবার। মুখোমুখি হচ্ছে, কথা বলছে। কাজ করছে সবাই।

পঞ্চাশ

কিন্তু ঢেউ এক রকম বয় না। পাল্টা ঢেউ আসে, আড়া ঢেউ বয়। কাটাকুটি চলতে থাকে।

সেদিনই সন্ধ্যের দিকে মালিক পক্ষের লোক—তাদের অনেকেই ছিল মাঠের মধ্যে, মথুর সমগ্র মাঠ জুড়ে কাজের যে মূর্তি দেখেছিল তারই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে মিলে—তারা যখন মালিকের খামারে ধান বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন আটকাল তাদের অন্য লোক। সাহায্য করবার জন্য এল ক্যাম্পের পুলিস, তারা বললে, যে যার ন্যায্য পাওনা নিয়ে যাবে। সংঘাত বাধল। মরল একটা চাষা, আহত হল জন আষ্টেক।

তারপর পাল্টা ঢেউ এল। রাত্রের অন্ধকারে মরল তীরবিদ্ধ হয়ে—ক্যাম্পের দুটো পুলিস।

তারপর চার-পাঁচটা দিন ধরে সে এক তুমুল কাণ্ড, সবটা এক সঙ্গে মনের মধ্যে ধরা যায় না। একটা ব্যাপার খুব দৃশ্যমান হল, আড়াইক্রোশী মাঠের পুরোটা থেকে কেটেফেলা ধানগাছগুলোকে দশ বিশটা গাঁয়ের লোক তুলে নিয়ে গেল, পশুরা যেমন করে শিকারের দেহটা টেনে নিয়ে যায় গর্তের মধ্যে। কিন্তু সবাই জানে, যে কোনো সময় কঠিন পাল্টা তোড় আসবে, যে কোনো সময়।

এই সময়কার এক রাত্রির কথা, তা রাত তখন প্রায় দুপুর। চারদিকে অন্ধকার, নিষুতি।

গাজন দুলের ঘরের মেঝেতে পচাই কাঠ হয়ে পড়ে রয়েছে, ঘুম আসছে না। এই ঘরটাই তাদের মা-বেটার রাত্রের আস্তানা হয়েছে এখন, মথুর কৌড়ির নির্দেশক্রমে, যদিও তাকেই এখন দেখা যাচ্ছে না, মথুর গা ঢাকা দিয়েছে। শাম্‌লীর এখানে থাকার কথা ছিল না, কিন্তু সেও থাকছে, ঘরটার ওপ্রান্তে শুয়েছে কামিনীর সঙ্গে একই বিছানায়।

তার শাশুড়ী তো সেই নিয়ে হাসনহাটি বাধিয়েছিল, সেই প্রথম দিন। সন্ধ্যে-বেলা শাম্‌লী আসার পরই গিরিবালা এসে হাজির, 'বউমা, তুমি চল দিকিনি, বাপু, হঁ গ', ইখেনে পুরুষমানুষ নাই, কেউ নাই, তুমি থাকবে কী করে?'

‘বাবা বলেছে আমি থাকব…’

‘তিনি বলেছে, কই শুনি নাই ত, তেনাই তুমার মাথা খেয়েছে সুহাগ দিয়ে দিয়ে ·’

গিরিবালা ফিরে যাচ্ছিল গজরাতে গজরাতে, প্রতিবেশিনী একজন জিজ্ঞেস করলে, ‘ই গ, কী হইচে?’

‘কী আর হবেক, পর কখন’ আপনার হয়, না, জংলী-মাহাতর’ ঝি পোষ মানে, পেটে পুঁটুলি এসেছে তাই, তা নালে বুড়ার (ওর স্বামীর) মতন আমার আদেখ্‌লেপানা নাই, হঃ।’

সমস্ত সময়টা পচাই দাঁড়িয়ে দেখেছিল। শাম্‌লীর মুখখানা টান হয়ে রয়েছে, বুঝতে পারে সে কারও কথা শুনবে না। মাঝে মাঝে শাম্‌লীকে কেমন মনে হয় পচাইয়ের। মনের ভেতর কিছু একটা হয়। ‘পেটে পুঁটুলি এসেছে’— চকিতে শাম্‌লীর দিকে তা করেছিল পচাই, জবু হয়ে বসা, পেটটা উঁচু, কেমন বেঢপ। আর এক দিনের কথা মনে পড়েছিল পচাইয়ের। বিল থেকে মাছ ধরে ফিরে আসছিল সে, শাম্‌লীর ছেলে হবে বলে বুড়োবুড়ির সে কী মাতামাতি!

কটা পেঁচা কোথায় ডেকে উঠল—চমকে উঠল পচাই। পাশ ফিরে শুল, পাঁজরার নিচে কোনো একটা জায়গায় খোঁচার মতো লাগছে। একটা তালাইয়ের ওপর ছেঁড়া কাঁথা পাতা, বোধ হয় একটা কঞ্চি-ভাঙা বা ইটের টুকরো ঢুকে থাকবে। হাত চালিয়ে দেখল, কিন্তু কিছু পেল না পচাই।

হঠাৎ আবার উৎকর্ণ হতে হল পচাইকে। যেদিকে মা আর শাম্‌লী শুয়ে আছে, অন্ধকারে সেদিক থেকে একটা চাপা গোঙানির শব্দ শুনল, মা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মাঝে মাঝে ওই রকম করে। শব্দটা একটুখানি থেমে আবার শুরু হল, এবারে চাপা একটানা কান্নার মতো। অনেকক্ষণ চুপ করে পড়ে থেকে কান্নাটা শুনল পচাই। কেউ মরে গেলে গাঁয়ের মেয়েরা খুব ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদে, তারপর ক্লান্ত হয়ে পড়লে যেমন করে টেনে স্বর তোলে, এটা সেই রকম। অন্য সময় কান্নার বা গোঙানির শব্দ শুনলেই পচাই হাঁকডাকে মায়ের ঘুম ভাঙিয়ে দিত, এখন তা করল না। শুনতে শুনতে তার নিজের বুকের ভেতরে কেমন করতে লাগল, ঘাড়টা দুমড়ে বালিশে মুখ গুঁজল পচাই।

এই ক'দিনে পচাই বদলে গেছে। তার চর্‌কির মতো বেড়ানো নেই, ধানের কাজ সে করেছে তাতে প্রাণ নেই। তার চোখের সামনে এতগুলো ঘটনা ঘটে গেছে, কিন্তু সে কিছুই করতে পারেনি, কেউ তাকে কিছু করতেও বলেনি। সে তীর ছোঁড়া শিখেছিল, ছুরি ধরতে শুরু করেছিল। সামনে একটা কিছু

আসছে সে জানত। সেটা এসেছে এবং চলে গেছে, আর গোয়ালের পাশে ছুঁড়ে-ফেলা জঞ্জালের মতো সে পড়ে আছে এখন।

লোকজন গ্রামের মধ্যে এখন মেলাই। কাজও চলছে পু'রা দমে। এইসব ধান কাটা ধান তোলার ব্যাপারে যে সর্দার হয়ে দাঁড়িয়েছিল, গাঁয়ের লোক সেই মথুর কৌড়িকে আর দেখতে পাচ্ছে না। আর বনা, যে পচাইকে তালিম দিয়েছিল, যে নির্দেশ দিতে পারত, সেও নিরুদ্দেশ হয়েছে। অথচ পচাই জানে, সব কাজ বনা সাঁওতালের।

ঘটনাগুলো ভাবছিল পচাই। উত্তেজনায়, ক্ষোভে, লজ্জায় অস্থির হয়ে উঠছিল। ঘুম তার আসবে না। ওদিকে থেকে থেকে মায়ের একটানা কান্না চলছে, শাম্‌লী কী করছে কে জানে। তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বা নড়াচড়ার শব্দও পাওয়া যায় না। তারই মতো জেগে পড়ে আছে হয় তো।

পচাই এই ক'দিন দেখছে শাম্‌লীকে, তার সঙ্গে বেশি কথাবার্তা বলে না। দুলির মাকে নিয়ে নিজের মনে পাটায় ধান আছড়ায়, কুলোতে পাছড়ায়, ধামায় করে থলিতে ভরে রাখে। ওর এখন সর্বক্ষণের সহায় হয়েছে দুলির মা, সে কত রঙতামাসা করে শাম্‌লীর সঙ্গে, কিন্তু তার সঙ্গেও কথা বলে না, ওই একটু মুখ চিরে হাসে।

অথচ আগেকার মতো শাম্‌লীকে আর মরা-মরা মনে হয় না, নিজের মনেই বেশ খুশিতে রয়েছে যেন। গ্রামে যে এত কাণ্ড হয়ে গেল, সে সব যেন ওর গায়েই লাগেনি, কোনের কাছে কুলোর ওপর ধান মেলে দিয়ে বাছতে থাকে, হাত বুলোয় যেন, আদর করছে। 'উয়ার নিজের ধান হইচে ত, তাই · ' মনে মনে ভাবে পচাই।

হঠাৎ একটা বিরক্তির মতো লাগে পচাইয়ের। এই যে পাঁচ-দশটা গাঁয়ের লোক ধান নিয়ে এত মাতামাতি করছে, কেন? কী হয় এতে, কী ভাবে ওরা?

অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করল পচাই, তারপর এক সময় নিঃঝুমের মতো হয়ে এল। তন্দ্রার মধ্যে আধো-স্বপ্নের মতো দেখল, সে নিজেই ধান কাটছে, ধান বইছে। তাহলে? অন্যদের দোষ দিয়ে কী হবে।

আচ্ছা, মনে হয় পচাইয়ের, যে সব জমিতে সে ধান কেটেছে, সেগুলো কাদের জমি? তাদের নিজেদেরই জমি ছিল শুনেছে, সনাতন মাহাতোর আমলে। কোন মাঠে জমি ছিল তাদের, কোন জমিটা?

তার বাবা ছিল ভয়ানক লাঠিয়াল। বড় বড় গোঁফ ছিল, লাঠি ধরে হাঁক

দিয়ে দাঁড়ালে কেউ এগোতে সাহস পেত না। মালকোঁচা মেরে দাঁড়িয়েছে সনা মাহাতো, লাঠি ধরার আগে ধুলোতে হাত ঘষে নিচ্ছে। হ্যাঁ, গোঁফ খুব বড়, টান করে বেঁধে নিয়েছে ঘাড়ের পিছনে। কটমট চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছে আলের ওপর। ছুটে যাচ্ছে পচাই, সনা মাহাতোর কাছে, বাবার কাছে। সনা মাহাতো ধান ঝাড়ছে না, কিন্তু লাঠি বাগিয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভোর বেলা পচাইয়ের ঘুম ভাঙতেই ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। চোখ রগড়ে দেখলে, মেয়ে দু'জন আগেই উঠে গেছে। কামিনী গেছে তাদের নিজেদের বাড়িতেই, মথুর নেই কিন্তু তার ব্যবস্থামতো দিন দুই হল সে রান্না-বান্না করছে, ভিন গাঁ থেকে আসা লোকদের খাওয়াবার জন্য। আর শাম্‌লী তার নিজের ধান ঝাড়া-পাছড়ানোর কাজে লেগেছে, বাইরে তার শব্দ শোনা যায়।

শাম্‌লীর পাশ দিয়েই হনহন করে বেরিয়ে গেল পচাই।

'এই শুন, পচাই, কুথাকে যাচ্ছিস···'

ধানেব গাদা থেকে আঁটি টানছিল শাম্‌লী, স্পষ্টত, দুলির মা আসার আগেই সে এগিয়ে তৈরি থাকতে চায়।

'যেখেনে যাই কেনে···' কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে পচাই চলে গেল। ওর মরিয়া ভাবটা বিস্মিত করল শামলীকে।

একান্ন

এদিকে কামিনী তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগোচ্ছিল। একই পাড়ায়, দু'পা গেলেই পুকুরটা পাওয়া গেল। ঘাটের ধাপিতে নেমে চোখেমুখে একটু জল ছিটিয়ে নিলে। উঠোনে পৌছে দেখলে, উনুনের পাশে দুটো কুকুর শুয়ে আছে কুণ্ডলী হয়ে, অদূরে দু-একটা কাক এসে বসেছে।

'হেই, হেট্-হেট্···' শব্দ পেয়ে কুকুর দুটো উঠে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সরে গেল, বেল গাছটার নিচে যেখানে ঝাড়া খড়ের স্তূপ জমে আছে, সেখানে একটা সুবিধেমতো জায়গা খুঁজতে লাগল। স্পষ্টত, ওখান থেকে সরে যেতে চায় না, দিন দুই যে ভোজন-পর্ব চলেছে তার লোভেই।

ভিন গাঁ থেকে যে সব ধান কাটার লোক এসেছে, তাদের কয়েক জনের কামিনীর ঘরে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। তখনও তারা ওঠেনি।

কামিনী দেখলে, দাওয়ার ওপর সারি দিয়ে ঘুমোচ্ছে জনা তিনেক, ঘরেও কিছু আছে। লোকগুলো শুয়ে রয়েছে কেমন করে! প্রথমে খড়ের আঁটি বিছানো হয়েছে, তার ওপর চট, মাদুর বা কাঁথা পাতা, তার ওপর মানুষগুলো, মরা খড়ের ওপর মানুষগুলোও যেন মড়ার মতো টান হওয়া। সেদিকে একটুখানি তাকিয়ে থেকে কামিনী বলে উঠল, 'কই গ', তুমরা সব গা ভাঙ, আর কত ঘুমাবে, কাগ-কোকিল উই কখন বাম দিইছে, উঠ-উঠ...'

কামিনীর কণ্ঠস্বরে সমাদর অথচ আদেশের ভাব, পুরো এক গৃহিণীর মতো, এটা তার পক্ষে নতুন বটে।

এক পাশে খ্যাংরা পড়ে ছিল, সেইটে তুলে নিয়ে খরখর করে ঝাঁট দিতে লাগল উঠোনটা, নিজের মনে গজগজ করতে লাগল, 'কাম আছে কত, লখী কখন আসবেক উই জানে...'

ঝাঁট শেষ হলে মাটির হাঁড়িটা তুলে নিল কামিনী, পুকুর থেকে জল এনে গোবর গুলে খানিকটা ছড়া দিল, খানিকটা ন্যাতা, তারপর বড় উনুন দুটোর গহ্বর থেকে ছাই বের করল, ফেলে দিয়ে এল একটু দূরের দিকে।

দাওয়ার দিকে অনিশ্চিত চোখে তাকাল কামিনী, তখনো ওঠেনি লোক-গুলো। চলে গেল উঠোন থেকে দাওয়ার ওপর। চালের ধর্নার দিকে চোখ তুলে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাল—ছেঁড়া থলে খুঁজছিল ও, শুকনো পাতা কুড়িয়ে বয়ে আনার জন্য, জ্বালানির কাজে কতকটা সাহায্য হবে। নাঃ, একটাও নেই, লোকগুলো থলে কাঁথা চাদর যা পেয়েছে তাই দিয়ে আগাপাস্তলা মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। বিরক্ত হঁয়ে চেঁচিয়ে উঠল কামিনী, 'হঁ গ, তুমরা সব কেমন ধারা মরদ, এখন' পড়ে পড়ে ঘুমাইচ, কাজ-কাম করবে কখন!'

ওরা ধড়মড় করে উঠে বসতেই কামিনী বললে, 'ছাড় দিকি, বাছা, চটগুলান ছাড়, ডালপালা আনতে হবেক...' ওখান থেকে চলে যাবার সময় বলল, উঠোনের একটা কোণ দেখিয়ে, 'উই দেখ, টুকুনি কাঠ-কুটা আছে, চারট' কাঠ যগাড়-যন্ত করে রেখে তবে কাজে যাবে, নালে পেটে আজ পড়বেক নাই কিছু।'

বুড়ো গোছের গোবর্ধন ঘুম-ভাঙা ঘোলাটে চোখ পিটপিট করতে করতে বললে, 'হবেক গ', কামিনীদিদি, কাঠকাট যগাড় করতে হবেক, যাও তুমি যে কাজে যাচ্ছ।'

তখন বেশ খানিকটা বেলা হয়েছে, দুপুরের কাছাকাছি। দেখা গেল যে আসর ভোজন-পর্বের জন্য কাজ অনেকখানি এগিয়েছে।

কামিনী ছাড়া আরো দুটি মেয়ে কাজ করছে। দাওয়ার ওপর শিল পেতে হলুদ-লঙ্কা বাটছে ঝুনী বুড়ি, তার পেশা মুড়ি বিক্রী করা, এখন এই কাজে যোগ দিয়েছে। অন্য জন লখী, কমবয়সী বউ, পুঁটের মা, যার জন্য পচাই একদিন লাল পিঁপড়ের ডিম পেড়েছিল। বউটার মেজাজ খুব নরম, কালোপানা নাদুস-নুদুস চেহারা, ডাগর চোখ, তার খুব উৎসাহ এই 'মচ্ছবে' মাঠের কাজে যোগ দেবার, কিন্তু তার স্বামী সুজন তাকে দাবড়ে দিয়েছে, 'উ শালা পারব নাই, শালা মাগ-ভাতারে ধান কাটছে ধান বইছে এক সঙ্গে, ধুর্-ধুর্, বেল্লিক, ধুর্-ধুর্ ···', তাই এখন লখী এখানে জুটেছে। দাওয়ারই আর এক দিকে, যেখানে রাত্রে লোকগুলো শুয়েছিল, সেখানে বঁটি নিয়ে বসেছে লখী। একটা কুমড়ো ফালা করেছে, পাশেই জড়ো করা রয়েছে সের পাঁচেক কচু আর এক বোঝা পুঁই।

উঠোনের মাঝখানে জোড়া উনুনে বড় বড় দুটো মাটির হাঁড়িতে রান্না চড়িয়েছে কামিনী, একটাতে খেঁসারির ডাল সেদ্ধ হচ্ছে, অন্যটাতে ভাত। এখন, মথুর কৌড়ি তার ওপর রান্নাবান্না আর লোক খাওয়ানোর ভার দিয়েছে, এবং এই ঘর-উঠোন কামিনীর নিজেরই, সে জন্যও বটে, কামিনী বেশ গিন্নির ভাব নিয়ে কথা বলছে আর অন্যরাও সেটা মেনে নিচ্ছে।

কতকগুলো পুঁচ্কে ছেলেমেয়ে ওদের উঠোনটায় জড়ো হয়েছিল, কখনো খেলছে কখনো কৌতূহলী হয়ে রান্না দেখছে। ছুটোছুটির মুখে কামিনী একবার ধমকে উঠল, 'তুরা কি উনানে পুড়ে মরবি নাকি, মুখপড়ারা, যা না, ছাড়া গরুর মতো ঘুরছিস কেনে, কুথাও ধান ঝাড়ার কাজে লেগে পড় না, যা···'

এই তল্লাট জুড়ে এখানে-ওখানে গাছতলায় খামারে ধান আছড়ানোর অবিরাম ছপছপ শব্দ, কামিনী সেটা লক্ষ করেই বলেছিল। ছেলেগুলোর মধ্যে কেউ কেউ সরে গেল, কেউ দাঁত বের করে হাসল।

বউটা একটু আমুদে, সে বললে, 'উয়াতে হবেক নাই, পিসী, চেলাকাঠ লিয়ে মার···' ওর চোখমুখের ভঙ্গিতে সবাই হেসে ফেলল।

'হি-হি, পালি' আয়, পালি' আয়, চেলা কাঠ মারবেক···' ছেলেগুলো এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়ল।

একটু পরেই ঝুনী বুড়ি কতকটা নাকী সুরে বলে উঠল, 'হুঁ গ', আর কতটুন নংকা বাটতে হবেক, হাত যে জ্বলে গেল, আমি উঠে পড়লম কেনে···'

কামিনী উনুনের মধ্যে ঘুঁটে আর কাঠ ঢোকাচ্ছিল, নতুন পাকিয়ে ওঠা ধোঁয়াতে ওর দম বন্ধ হবার যোগাড়, মুখ ফিরিয়ে আড়াল করে বললে, 'তা কি

হয়, দিদি, দশজন লোক সেবা হবেক, আমাদের কষ্টকে কি কষ্ট মনে করতে আছে !' বলতে বলতে একটা দায়িত্ববোধের ভাব ফুটে উঠল ওর কণ্ঠস্বরে।

'আচ্ছা, পিসী, আজ কতজন লোক খাবেক ?' লখী জিজ্ঞেস করলে।

'কী জানি, বাছা, এত বেলা হল, কেউ কিছু ত বলে পাঠাল নাই, শেষে কি আমার নাম খারাপ হবেক !'

'নাম খারাপ হবেক কেনে, তুমি তরকারী নামি' রেখে ভাতের হাঁড়ি চাপি' রাখ, ছাড়ান দিও নাই···'

'হঁ-হঁ, বউ ঠিক কথা বুলছে · ' ঝুনী কতকটা নীরস কণ্ঠে বললে, 'বউ, তুই বাছা এগ্‌বার শিলে আয় দিকি, মাইরি বলছি, হাত খুম জলছে···'

কামিনী বাঁশের চোঙা দিয়ে উনুনে ফুঁ দিচ্ছিল, একটু পরেই দপ করে জলে উঠল আগুন, ধোঁয়াটা আস্তে আস্তে কেটে গেল। হাঁড়ির মধ্যে কাঠি দিয়ে দেখল ভাত সেদ্ধ হয়েছে কিনা—এখনো গোটা আছে, তবে এক্ষুনি হয়ে যাবে, একেবারে সদ্য-তোলা ধানের চাল তো।

কামিনী মাঝে মাঝে কাঠ ঘুঁটে শুকনো পাতা উনুনে ঠেলে দিচ্ছে, আর হাঁড়ির মুখে সরা ঢুটোর ওপর তাকিয়ে আছে, গরম উর্ধ্বমুখ বাষ্পে নড়ছে সরা ঢুটো। কিন্তু কোন কার্যকারণে কে জানে, ওর শুকনো ধোঁয়া-ঝুলি লাগা চোখ-মুখে একটা অদ্ভুত কমনীয় ভাব ফুটে উঠছে, ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে।

ওর সামনেই একটা রূপান্তর চলছে, একদিকে শুকনো পাতা কাঠ পুড়ছে, হাঁড়ির ভেতর চাল-জল ফুটছে, আর অন্য দিকে এত কাণ্ডের চালগুলো ভাত হয়ে উঠছে।

বাহান্ন

বেলা প্রায় তিন প্রহর, সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে, রোদের চখ ভাবটা ক্রমে কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সিরসির করে হাওয়া দিতে শুরু করেছে, এমনি সময় কামিনীদের ঘরে লোকের বেশ ভিড় জমেছে। দশ বারো জনের প্রথম দল খেতে এসেছে, ধান ঝাড়া বন্ধ করে, ওদের হয়ে গেলে আর এক দল আসবে, খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করার পর আর এক দম কাজ করে সাঁঝ বেলা ছেড়ে দেবে।

কিছু লোক কামিনীদেরই পুকুরে স্নান করে নিয়েছে, বাকি ক'জনও গেছে

তাড়াতাড়ি একটা ডুব দিয়ে আসতে। উঠোনের এদিকে-ওদিকে ভিজে কাপড় মেলে দিচ্ছে ওরা, যাদের আরো কাপড় আছে তারা পরেছে, একজন ভিজে গামছাটাই পরে রয়েছে, গায়ে দিয়েছে একটা শুকনো গেঞ্জি।

সেই পুঁচ্‌কে ছেলেমেয়েরা এদিকে-ওদিকে ঘুরঘুর করছে, রান্নার খুসবু উঠেছে, তাতেই লুভিয়ে উঠছে ওরা। কামিনী ওদের বলেছে, শেষবেশ ওদের দেবে কিছু, সেই সাঁঝের বেলা নাগাদ, কিন্তু জায়গাটা থেকে সরে যেতে পারছে না ওরা।

কামিনীর ব্যস্ততার শেষ নেই। উঠোনের এক পাশে, উনুন থেকে একটু দূরে, জল তড়তড়া দিয়ে আস্তে আস্তে ঝাঁট দিয়ে নিল কামিনী, যাতে ধুলো না ওড়ে। লখীকে বললে, 'বউ, পাত করে দে।'

ঝুনী অনেক আগেই মশলা বেটে দিয়ে চলে গেছে, কামিনী বলেছিল যা রান্না হয়েছে খেয়ে নিতে, কিন্তু সে খায়নি, বলে গেছে আবার ফিরে আসবে। বউটাই আগাগোড়া কামিনীর সঙ্গে রয়েছে, ঠিক ছায়ার মতো। কামিনী খায়নি বলে শত অনুরোধ সত্ত্বেও সেও খায়নি।

লখী তাড়াতাড়ি দুটো পাত করল। কাঁচা শালপাতার অভাব নেই এ অঞ্চলে, সাঁওতাল-মাহাতোরা গোল গোল থালার মতো পাত তৈরি করে। সেই রকম দশ-বারোটা পাতা এক সঙ্গে বিছিয়ে বেশ বড় বড় দুটো পাত তৈরি করল লখী, যাতে খাবার জন্য এক সঙ্গে পাঁচ-ছ'জন বসতে পারে।

'বউ, তুই খাআর জল লি'আয় দিকি, আমি ততখন ভাত বাড়ি···'

লখী বউটি বেশ সলজ্জ, নম্র, মাথায় ঘোমটা ছিলই, এখন কাপড়-চোপড় টেনেটুনে দিয়ে ঘরের ভিতর থেকে একটা কলসী বের করে আনল, অনতিমন্থর পায়ে চলে গেল পুকুরের দিকে, একই পুকুরের জলে ওদের স্নানপান সবই চলে।

কামিনী হাঁড়িসুদ্ধ ভাত ঢালছিল পাতের ওপর, দুই পাতে দুটো হাঁড়ি ঢালল। তারপর যেমন করে নৈবেদ্য সাজায়, তেমনি করে চূড় করে দিতে লাগল, গরম ভাপ উঠছে ভাতের থেকে, তাই সবাতে রাখা জলে হাতটা ডুবিয়ে নিচ্ছিল মাঝে মাঝে। একেবারে নতুন চালের ভাত, ঝরঝরে হয়নি, একটু ড্যালা-ড্যালা।

যারা খাবে তারা দাঁড়িয়ে দেখছে। স্নান করার পর রুক্ষ ভাবটা চলে গেছে ওদের গা আর মুখ থেকে, একটু তেলতেলে, চোখে বেশ লোভলোভ কিন্তু স্নিগ্ধ ভাব। জোয়ান গোছের পুটুরাম ইতিমধ্যে চুলে চিরুনি চালিয়ে নিচ্ছিল, সে হেসে বললে, 'ফেন গাল নাই, মাসী?'

জবাব দিল বুড়ো গোবর্ধন, যে সকাল বেলা কাঠ যোগাড় করে দিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, 'না হে, ছকুরা, ডাল পড়লে স্বয়াদ হবেক ভাল, কথায় বলে ফেনে-ডালে পুঁই-কুমড়ায় !'

কামিনীর ব্যস্তসমস্ত ভাব, 'বসে পড় দিকি তুমরা। দাদা, তুমি বস আগে, বাবা পুটু, লে বাবা, দেরি করিস নাই !'

লখী এসে গিয়েছিল, পাত দুটোর কাছাকাছি ভিজে কলসীটা নামিয়ে রাখল সসম্ভ্রমে, মাথার ঘোমটা আর একটু টেনে দিলে, কলসী থেকে জল উপ্‌চে কোমরের কাপড়টা ভিজে গেছে।

'পিসী, এখন আর কিছু করতে হবেক ?' লখী ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলে।

'তা আবার হবেক নাই ! তুই ডালট' ঢাল দিকি, ভাতের উব্‌রে বসি' দে।'

পায়ে পায়ে এগিয়ে এল লখী, উনুনের পাশে রাখা হাঁড়ি থেকে দুটো জাম্বাটিতে ডাল ঢালল, তারপর একটা করে এনে ভাতের চূড়ার ওপরই বসিয়ে দিল। সেখান থেকে দরকার মতো খাউনেরা নিয়ে নিতে পারবে।

গোবর্ধন বলল, 'লাও গ', বসে পড় সবাই, এস···'

এইটেরেই অপেক্ষা করছিল ওরা, বয়োজ্যেষ্ঠ গোবর্ধন বলার পর সবাই ঝুপঝাপ করে বসে পড়ল, একটাতে ছ'জন আর একটায় পাচজন বসল গোল হয়ে, পাতটাকে চারদিকে ঘিরে।

যে ছেলেগুলো সমস্ত ব্যাপারটা দেখছিল তাদের একজন বলে উঠল, 'হেই দেখ, কত ভাত খাবেক, যেমন পাহাড় করি' দিছে···'

হেসে উঠল ওরা, গোবর্ধন সবার উঁচুতে, বললে, 'ই কী পাহাড দেখছিস তুরা, আগে হলে জন্‌কে এক একট' কাঁড় শেষ করতম আমরা···কি গ', পুটু, তুমি ত আমাদের মধ্যে জুয়ান আছ, চালাও দিকি, কতট' দৌড় তুমার দেখি।'

পুটুরাম চকিতে একবার লখী বউএর দিকে তাকিয়ে নিয়ে লজ্জা-লজ্জা মুখ করে বলে উঠল, 'না-না, আমি লারব, তুমাদের মতন কি আমরা পারি ?'

ওদিকের দলের একজন অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল, 'গোবদ্ধনদাদা, লাও, তুমি আম্ব করে দাও দিকি, কার কত দৌড় কাজেই বুঝা যাবেক···'

'ই ভাল কথা, আম্ব কর থালে···' বলে গোবর্ধন হাতের তেলোয় কিছুটা জল নিয়ে মাটিতে ছিটিয়ে দিল, অস্ফুটে বিড় বিড় করল, চূড়ার ওপর জাম্বাটি থেকে এক থাব্‌লা ডাল তুলে নিয়ে কাঁড়ির নিচের দিকের চারটি ভাতে মাখল, তারপর আস্তে আস্তে মুখে দিয়ে বন্ধ করল মুখ। মনে হল চিবোচ্ছে না, মুখের ভেতর ধরে রেখে দিয়েছে, আস্তে আস্তে বুড়োর শিথিল মুখের ওপর একটা

তরল স্নিগ্ধতা ফুটে উঠল যেন। একটু পরেই গ্রাসটা গিলে নিয়ে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল, তখন আরম্ভ করল আর সবাই।

কামিনী ডাল ছাড়া পরিবেশন করল আর দুটি পদ, কল্মি শাক ভাজা আর পুঁই-কচু-কুমড়োর চচ্চড়ি। বললে, 'রাঁধ্‌তে-টাঁধ্‌তে পারি নাই, দাদা, ইসব জানি নাই কুনু কালে...' ওর গলায় একটা সত্যিকার সংকোচের ভাব।

শুধু গোবর্ধনই নয়, দু'টো দল থেকে আরো দু'তিন জন প্রতিবাদ করল হুঁ-হুঁ করে। একজন বললে, 'তা বললে কি চলে, দিদি, ই তুমার পাকা হাতের রান্না, কেমন সৈরব উঠেছে, না কি, বল ভাই তুমরা?'

'হুঁ-হুঁ, তা আর বলতে!'

লজ্জায় আনন্দে কামিনীর দু'চোখ জলে ভরে উঠল যেন, সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। চোখাচোখি হয়ে গেল লখী বউএর সঙ্গে, আধ-ঘোমটার ভেতর সে হাসল।

এগারোখানা হাত দুই পাতের ওপর নামছে আবার উঠে আসছে, লোক-গুলোর মাথা একবার ঝুঁকে পড়ছে সামনে আবার একটু উঠছে। প্রথম কিছুক্ষণ প্রায় নীরবে খাওয়ার পর ওরা কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করল।

কামিনী আর লখী কখনো জলের গেলাস ভর্তি করে দিচ্ছে, কখনো তরকারী এনে দিচ্ছে, আর তাকিয়ে আছে ওদের মুখগুলোর দিকেই। বদলে যাচ্ছে ওদের মুখের ভাব, সারাদিনের পরিশ্রান্ত দেহ, আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ, দেহের প্রতি কণিকাই কিছু চাইছিল, উঠেছিল উৎসুক হয়ে, এখন তা পরিতৃপ্ত হচ্ছে, ওদের মুখের টানটান ভাবটা চলে গিয়ে স্নিগ্ধ তরল ভাবটা ফুটে উঠতে লাগল।

'কানাই মামার হাত ভেরে এল না কি?' একজন তার বিপরীত দিকে বসা লোকটাকে প্রশ্ন করল।

'আমি আর পারছি নাই, বাবু, তুমরা চালাও।'

এ ওর কথা বলল, ভাত ঠেলে দিল অন্যের দিকে, তারপর এক-আধজনের হাত থেমে গেল। এক সময় পাত দুটো পরিষ্কার হয়ে উঠল, ওরা চেটেপুটে খেয়েছে।

'লাও, উঠ ইবার...' গোবর্ধন বললে, ঢেকুর তুলে।

'হুঁ, একটুন জিরায় লিতে হবেক, বাবু, ইয়ার পরে...' আর একজন বললে।

'হুঁ-হুঁ, ভাত-গড়েন দিতে হবেক নাই, হবেক ত...' কামিনী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল।

সবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে কামিনী। লখী বউও তাকিয়েছিল, সে হাসল, কিছু বলতে গেল কামিনীকে, কিন্তু হাসল আবার।

কেবলই পরিবর্তন, কেবলই রূপান্তরের মধ্যে একটি ভরন্ত মুহূর্ত—ভাসমানতার মধ্যে একটি রঙিন বুদ্‌বুদের মতো রূপ নিল যেন।

তিপ্পান্ন

সেই দিনটা কেটে গেল, তারপরের দিন বিকেলে যখন চারদিকে আব্‌ছা নেমে এসেছে, তখন শাম্‌লী গুটিগুটি এগোচ্ছিল তার নতুন শ্বশুরবাড়ির দিকে। দেখলেই বোঝা যায়, মেয়েটা সারা দিন খাটাখাটুনি করেছে, পা যেন চলতেই চায় না। ধানের গুঁড়োর ধুলোতে গায়ে-মুখে খড়ি উঠছে, পরনে তার শ্বশুরেরই দেওয়া একখানা রঙিন শাড়ি কিন্তু ময়লা চিটুনি। রাস্তা থেকে মথুরের ঘরটার দিকে তাকাল শাম্‌লী, চালার পাশে ধানের আঁটি জড়ো করা, চালায় একটাও গরু নেই, হয়তো ফেরেনি এখনো, দুটো কুকুর জড়াজড়ি করে শুয়ে রয়েছে, শাম্‌লী এগিয়ে আসতেই ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

আধখোলা দরজার কাছে এসে ভেতরে উঁকি মারল শাম্‌লী, কেউ আছে বলে মনে হল না। আস্তে আস্তে ভেতরের উঠোনে ঢুকে পড়ল। উঠোনের চারদিকেই আলগা ধানের গাদা, ঝাড়াই-মাড়াই একেবারেই শুরু হয়নি। বিস্মিত হল শাম্‌লী, তার নিজের কাজ তো এক রকম শেষ হয়ে গেছে।

দাওয়ার ওপর উঠে একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল শাম্‌লী, 'মা গ'…', নিছক ক্লান্তিবশত হাই তুলল, মাথার ওপর হাতের তেলো দুটো জড়াজড়ি করে রাখল। দাঁড়ালে যা হয় না, এই অবস্থায় ওর পেটটা বেশ বড় দেখাচ্ছে। একে পেটে ছেলে এসেছে, তার ওপর এই পরিশ্রম, ওর দেহটা তেমনি কাঠিপানা হচ্ছে।

'কে গ', কে উখেনে…' তীক্ষ্ণ কিন্তু ভয়-পাওয়া কণ্ঠস্বর গিরিবালার, খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে উঠোনের মধ্যে পা দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। একটু আগে পাড়ার মধ্যে গিয়েছিল, কোঁচড়ে কিছু ভরে নিয়ে এসেছে।

শাম্‌লীও চমকে উঠেছিল, এদিকে ফিরতে না ফিরতেই গিরিবালা চিনতে পেরে বলে উঠল, 'অ মা, তুই…', তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ওর হাত ধরল, 'ইখেনে মাটিএ বসে আছিস কেনে, ঠাণ্ডা হিম, তোর নিজের ঘর ত, আয় ঘরে বসবি আয়…'

শাম্‌লীকে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল গিরিবালা, বিছানার ওপর বসিয়ে ওর চিবুকে হাত দিল, মাথায় হাত বুলোল, 'কী কালিষ্টি হয়ে গেছিস মা, তোর মা-ও একটু যত্ন-আত্তি করে নাই গ ?'

হাসল শাম্‌লী, 'মা দিনরাত তার ঘরে রাঁধছে আর লোক খাওাচ্ছে, সেই রাত এক পহর হলে আমার ঘরে আসবেক আর মড়ার মতন পড়বেক বিছনায়···'

'অ মা, তাই না কি ··' বোঝা গেল গিরিবালা গ্রামের মধ্যে থেকেও গ্রামের কিছু জানে না। শাম্‌লীকে পেয়ে সে কী রকম উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল, 'আয় দিকি মা, তোর চুল বেঁধে দি।'

শাম্‌লী শাশুড়ীর হাতে চুল ছেড়ে দিয়ে বললে, 'মা একট' কথা শুধাইচি, পচাই তুমাদের এথেনে এস্‌ছিল ? এগবারও আসে নাই !'

'না, কেনে বল দিকি ?'

'তুদিন উয়াকে দেখতে পাই নাই, উদিনে সেই ভোর বেলাকে বেরি' গেল, তারপর আর ফিরলেক নাই।'

'উই-উই, উই হইচে রোগ, উই যে আমাদের ইনি, তোর শ্বশুর গ', সাত দিন দেখা নাই, পথম দিন খালি ভূতা তুলেকে দিয়ে খপর পাঠাইছিল, কিছু ডর নাই, ধয্যি ধরে থাক···হুঁ গ', বল তুই, তোরা কেউ নাই, আমি একলা মেয়েমানুষ···' দেখতে দেখতে গিরিবালার গলার স্বর ভারী হয়ে এল, হাত কেঁপে গিয়ে থেমে গেল, কান্নায় ভেঙে পড়ল ও। শাম্‌লী ঘুরে বসল, কিন্তু কোনো সান্ত্বনার কথা বলতে পারল না, কেমন বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে রইল।

'লোকট' রইল কি বেঘোরে পরানট' দিল, কী জানি মা !'

'উ কথা বল নাই···' এবার শাম্‌লী একটু জোরেই বলে উঠল, 'শ্বশুর বাঘের ছাঁ, উয়াকে কেউ কিছু করতে পারবেক নাই !'

তবু গিরিবালা প্রবোধ মানল না, কতক্ষণ কেঁদে কেঁদে নিজেই শান্ত হল।

অন্ধকার হয়ে এসেছিল, উঠে কেরোসিনের ডিবেটা জ্বালাল গিরিবালা। বললে, 'হেই দেখ মা, ভুলেই গেছলম, কঁছড়ে ছলা ভাজাগুলা রয়েই গেছে, মুড়ি খা দিকি তুট'···'

বোঝা গেল, শাম্‌লীকে পেয়ে খুব খুশি হয়েছে গিরিবালা, অন্তত তার নিঃসঙ্গতার অসহ্য ভার নামাতে পেরেছে। এ বাড়ির অনেক কথা শাম্‌লীকে জানাল সে। কোনো দিন রান্না করে, কোনো দিন করে না, আজ করেনি। রাত্রে মুড়ি খেয়েই থাকবে, উনুন জ্বালবে না, তাই পাড়াঘরে চারটি ছোলা ভেজে

আনতে গিয়েছিল। শাম্‌লীকে সেই ছোলা-ভাজা আর মুড়ি খেতে দিল।

'মা, ধানগুলা গোছগাছ হয় নাই?' শাম্‌লী মুড়ি চিবোতে চিবোতে জিজ্ঞেস করলে।

মাথা নেড়ে মুখ মুড়ে গিরিবালা বলল, 'আমি উসব করতে লারব, যার ধান সে এসে যা হয় করবেক। আমি লারব।'

শাম্‌লী বললে, 'আমাদের ধান সব গোছ হয়ে গেছে। আমি সব করেছি, আর উই দুলির মা ··আমি যাই, দুলির মা আবার আমার জন্যে বসে থাকবেক ··' বলে উঠে পড়ল শাম্‌লী, মুড়িগুলো কোঁচড়ে ঢেলে নিলে, 'যেতে যেতে খাব ··'

গিরিবালার ছেড়ে দেবার ইচ্ছে নয়, কিন্তু বাধাও দিল না, সেই প্রথম দিন গাজন দুলের ওখানে গিয়ে যেমন গিন্নিপনা ফলিয়েছিল আর ক্যাটক্যাট করে কথা শুনিয়ে এসেছিল, ওর সে তেজ আর ছিল না। ও বরঞ্চ আলনা থেকে একটা চাদর পেড়ে নিয়ে বললে, 'ই হিমে খালি আঁচলের বেড় দিয়ে এসেছিস, এইট' লিয়ে যা···' বলে সেটা ভালো করে শাম্‌লীর গায়ে মাথায় জড়িয়ে দিলে।

যাবার মুখে শাম্‌লী বললে, 'আমি দু'দিন পরে ইখেনে চলে এসব, মা, আমি এসে সব গোছ করব।'

'কী জানি, বাছা···' ভাঙা-ভাঙা স্বরে গিরিবালা বললে। একটা কথা বোঝা গেল, গিরিবালা এত দুঃখেও স্বামীর বিরুদ্ধে কিছু বলেনি, এমন কি গাজন দুলের ঘরে শাম্‌লীর যে থাকার ব্যবস্থা করে গিয়েছিল তার স্বামী, সেটা যেন মেনে নিয়েছে বলে মনে হল।

চুয়ান্ন

সবে রাত্রি নেমেছে গাঁয়ের ওপর, অন্ধকার বটে কিন্তু ততখানি গাঢ় নয়, পথঘাট সব পরিষ্কার দেখা যায়। গিরিবালা গায়ে চাদর জড়িয়ে দিয়েছিল বলে বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। কোঁচড় থেকে চারটি চারটি মুড়ি-ছোলা তুলে মুখে পুরছে শাম্‌লী।

নিজের ঘরের কাছাকাছি আসতে একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগল শাম্‌লী, সব কিছু চেনা বলেই নয়, এই ঘরটার চারদিকের মূর্তিটা যে বদলে গিয়েছিল. সেটা গড়ে তুলেছিল শাম্‌লী নিজেই, বোধ হয় সে জন্যেই। বাঁশ ঝাড়ের নিচেই আন্ধেক দেওয়া খড়ের গাদাটা, অনেক খড় এখনও ছড়িয়ে রয়েছে, ওই গাদায়

তুলতে হবে। দাওয়ার ওপর দেয়ালের গায়ে লাঙলটা ঝোলানো, বেশ বড় মাপের লাঙলটা, মোহন এটা দিয়েই চাষ করেছিল, তারপর সেই থেকেই অমনি রয়েছে, তার নিচে ধান-পাতকুটির স্তূপ হয়ে রয়েছে। উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় উঠল শাম্‌লী, সেখান থেকে ঢুকল ঘরে। ঝাড়া-পাছ্‌ড়ানো ধান কতক সে থলেয় ভরেছে, কতক খোলা অবস্থায় মেঝেতেই ঢেলে রেখেছে। আজকাল চুরিচামারির ভয় নেই, গ্রামে সবার ঘরেই ধান এখন।

লম্ফ জ্বালতে যাচ্ছে এমন সময় শাম্‌লীর মনে হল, দুলির মা কোথায়?

'ঠাকুমা…'

দুলির মার তো এখানেই থাকার কথা, দাওয়ার ওপর সে কুলোতে করে আকড়া পাতকুটি পাছড়াচ্ছিল, সে কি না বলেই চলে যাবে?

'ঠাকুমা…' বাইরে বেরিয়ে এসে একটু জোরে ডাকল শাম্‌লী।

কেউ সাড়া দিল না, কেমন যেন লাগল ওর।

ফিরে আবার ঘরের মধ্যে চলে যেতে চাচ্ছে, এমন সময় ঝাঁকড়া বটগাছের তলা থেকে দুটো ছায়ামূর্তির মতো বেরিয়ে এল যেন ভূতের তাড়া খেয়ে ছুটে আসছে।

'ঠাকুমা, মা, তুমরা…'

'ঘরে ঢুক, শাম্‌লী, চল চল, পরে শুনবেখন সব…'

'মা, তুমি ইয়ার মধ্যে চলে এলে যে, তুমার রান্নাবান্না…' শাম্‌লী ঘরে ঢোকার কোনো লক্ষণ দেখাল না।

'আর রান্নাবান্না! খাবেক কে, সব মরদ-মুনিষ পালাইচে…' কামিনী নয়, দুলির মা-ই শাম্‌লীর প্রশ্নের উত্তর দিল।

'পালাইচে! কী হইচে খুলে বল দিকিনি…'

'হ গ', দুট'-তিনট' সিপাই মেরেছে, ত ইয়ারা সব মনে করল রাজার মাথা কেটে লিয়েছে…ই রাবণের গুষ্টি! সদর থেকে গাড়ি গাড়ি সিপাই এসেছে, ঘিরে ফেলছে সব, বলছি, চল না কেনে ঘরে…'

ঘরের ভেতর ঢুকে কেরোসিনের লম্ফ জ্বেলে শাম্‌লী ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, 'ই ক'দিন ত তুমার ভয়-ডর দেখি নাই, ঠাকুমা, আজ এমন হাতে-পায়ে কাঁপ্‌ছ কেনে?'

'কাঁপছি কি সাধে? পুরুষমানুষগুলা সঙ্গে ছিল তখন, আর এখন একট' মরদের মুখ দেখি নাই গ'!'

মোটামুটি খবরটা শোনাল দুলির মা। প্রথম ঘটনা ঘটেছে আজ ভোরে,

চণ্ডীতলার মোড়ে। জেলা সদর থেকে একটা পুলিসের গাড়ি গ্রামে ঢুকছিল, কারা তীর ছুঁড়েছে গাড়ির ভেতর। গাড়িটা তখন আর গ্রামের মধ্যে ঢোকে-নি, ফিরে চলে গিয়েছিল। তারপর দুপুরের পর থেকে সাতটা গাড়ি পরপর গ্রামের মধ্যে ঢুকেছে, আরো আসবে। পুরুষ দেখলেই তাকে ট্রাকে তুলে নিয়েছে, এরপর না কি গ্রামের এপ্রান্ত-ওপ্রান্ত চুঁড়ে বেড়াবে, গ্রামে মানুষ রাখবে না।

কথায় বলে, ওপর থেকে পড়ল তাল, যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত। কামিনী আর দুলির মা, বুড়ি দুটো সেই রকম বলাবলি করতে আরম্ভ করল, ছাড়াছাড়া ভাবে।

চিরটা কাল দুলির মা পুরুষের গা ঘেঁষে কাটিয়েছে, বোধ হয় সেটাই তার মনকে ভীষণ নাড়া দিচ্ছিল. সে কতকটা নিজের মনে বলছিল, 'আমাদের ভরসা বল, বুকের পাটা বল, সব পুরুষমানুষ, বেটাছেলে…'

কামিনী একটা চ্যাটাই পেতে শুয়ে পড়েছিল, ভয় অপেক্ষা বেশি মুষড়েই পড়েছিল সে, কী রকম ভাঙা-ভাঙা স্বরে সে বললে, 'রান্নাবান্না সব করেছিলম, কিন্তু দু'পহর তিন পহর বেলা গেল, সাঁঝ বেলা এল. একট' জনপ্রানী এল নাই, সব ভাত-তরকারী দুয়ারেই রেখে এসছি, থাক শিয়ালে-কুকুরে…' বোঝা গেল সে নিজেও কিছু খায়নি।

'তুমার এখেনে রাতট' থাকলম, লাত্‌নী, এখন আন্ধারে আমি পথে যেতে লারব…' বলতে গিয়ে থমকে গেল দুলির মা, দেখলে শাম্‌লী কোলের ওপব দু'হাত রেখে কাঠ হয়ে বসে আছে, কোনো কথাই তার কানে যাচ্ছে না।

'লম্ফট' লিমি' দাও, লিমি' দাও…' দুলির মা বলে উঠল। কিন্তু শাম্‌লীর কোনো সাড়া নাই দেখে নিজেই নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারে বোধ হয় শুয়ে পড়ল।

তখনও ভোর হয়নি, ভাঙা দরজাটার নিচে দিয়ে অন্ধকার ফিকে হওয়ার আভাস আসছে, দুলির মা উঠে বসল বিছানা ছেড়ে। শীতের রাত এমনিতেই বড়, তার ওপর এক রকম ঘুমোতে পারেনি, কাছে দূরে শেয়াল কুকুরের ডাক শুনেছে, আর ঘুম ভেঙে গেছে, দু'একবার ঘরের বাইরে যেন মনিষ্যির প্যায়ের শব্দ পেয়ে শীতের মধ্যেও ঘেমে উঠেছে। রাত্রে জেগে থেকে কত রকম শব্দ যে কানে আসে তার ঠিক নেই।

'হঁ গ', তুমরা কেউ জেগেছ, লাত্‌নী ?'

'হঁ, জেগেছি, কেনে ?' শাম্‌লী নীরস কণ্ঠে বললে।

সঙ্গে সঙ্গে কামিনী উঠে বসল, সে বললে, 'সারারাত চোখে-পাতায় হইচে

যে আগব ! মা গ', কী খ্যাকখ্যাক শব্দ, সেইট' জন্তু না মানুষ কাশছে কী বুঝি, হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদাচ্ছে আমার, উঃ…'

'লাত্‌নী, আমি এখন যাচ্ছি আমাদের ঘরকে, সারা রাতট' খালি পড়ে আছে, কী হইচে কে জানে, একটু বেলাকে এসব আমি…'

কামিনী সমর্থন করল, 'হঁ', যাও কেনে, এগ্‌বার দেখে এস…' সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল, তার নিজের ঘরও রান্না ভাতটাত সমেত অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে, সেখানে যাওয়া দরকার।

ঢুলির মা উঠে দরজা খুলল, বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলে যাতে ঠাণ্ডা বাতাস না ঢোকে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার দড়াম করে দরজা খুলে গেল, ঘরের মধ্যে ঢুকে ঢুলির মা কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে উঠল, 'দাঁড়ি' আছে, উই বটগাছতলায়…'

'কে দাঁড়ি' আছে, কী…'

রাত্রে ওরা আলাদা আলাদা কে কী শুনেছিল তার ঠিক নেই, সেটা মনের ভুলও হতে পারে, কিন্তু এখন ওরা তিনজনেই এক সঙ্গে শুনল, বট-গাছটার দিকে মানুষের গলার আওয়াজ এবং তারপর ভারী জুতোর শব্দ এগিয়ে আসছে।

ঢুলির মা আটকানো গলায় বলে উঠল, 'পালি' যাই, পালি' যাই চল, সব তছলছ করি' দিবেক…'

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র, সেই পায়ের শব্দগুলো দরজার বাইরে এসে থামল।

একজন হেঁকে বললে, 'যো সব জানানা আদমী হ্যায়, বাহারমেঁ আ যাও।'

অপেক্ষাকৃত মৃদু অথচ স্পষ্ট উচ্চারণে আর একজন বলল, 'ভিতরে পুরুষ যারা আছে, তারা ভেতরে থাক, মেয়েরা বাইরে এস।'

প্রথমে বেরিয়ে এল ঢুলির মা, তারপর কামিনী। ঢুলির মা বললে, 'ইখেনে পুরুষমানুষ কেউ নাই ত, দাদা…'

'পুরুষ আছে, আমরা জানি, মথুর কৌড়ি এখানে আছে…'

'মাইরি বলছি, মা কালীর দিব্যি, পুরুষ নাই, উনি নাই…হঁ গ', পুরুষ কে থাকবেক ই ঘরে ?'

হিন্দী-বলা পুলিসটা একটা ছুট কথা বলল। অন্য জন যোগ করল, 'মেয়ে-মানুষ আছে ত বেরিয়ে আসুক, আমরা ঘর সার্চ করব।'

'আছে, বাবা, আছে, আমার বিটী আছে…' বলতে বলতে আবার ঘরে ঢুকল কামিনী, 'এই, বেরি' আয়…' কিন্তু একটু পরেই নিরাশ হয়ে ফিরে

এল। বলতে পারল না যে শাম্‌লী কিছুতেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে না, খানিকটা গলা-গলা স্বরে বলল, 'উয়ার দেহট' ভাল নাই, অসুখ হইচে।'

অফিসার আর দেরি করল না, দু'জন পুলিস নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল, বাকি তিন জন রইল বাইরে। ঘরের মধ্যে ঢুকে টর্চ জ্বালল, ভেতরটায় তখনো পরিষ্কার হয়নি। আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল, ঘরের মধ্যে ধানের বস্তা সাজানো, কোনোটার মুখ বাঁধা, কোনোটা খোলা, মেঝেতে বিছানা পাতা, কোণে কাঁথা-কাপড় সব জড়ো করা। টর্চটা ঘুরিয়ে শাম্‌লীর মুখের ওপর ফেলল অফিসার, অজান্তেই চমকে উঠল, উসকো-খুসকো চুল ঝুলে পড়েছে মুখের ওপর, আর মুখখানা কঠিন যেন লোহা, মেঝেতে বিছানার ওপর উবু হয়ে বসে আছে।

'জানলাটা খুলে দাও…' নির্দেশ দিল অফিসার।

জানলা খোলা হল, পুবের থেকে আলো এসে পড়ল ঘরের মধ্যে। অফিসারেব নির্দেশ মতো জিনিসপত্র সরিয়ে দেখবার জন্য এগিয়ে গেল পুলিস দু'জন। জড়ো-করা কাঁথা-কাপড় মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল, দুটো উঁচু ধানের বস্তার মুখ খোলা ছিল, সরাতে গিয়ে ধান ছড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপর, গড়িয়ে এসে পড়ল বসে থাকা শাম্‌লীর পায়ের কাছ পর্যন্ত।

মনে হল, অফিসার হতাশ হয়ে বললে, 'ছোড় দো।'

বেরোবার আগে শাম্‌লীর দিকে না তাকিয়ে পারল না অফিসার। তখন সকালের আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। শাম্‌লী তেমনি উবু হয়ে বসে রয়েছে, মেঝের থেকে তুলে নেওয়া একটা খড়গাছি নখ দিয়ে হিংস্রভাবে কুটিকুটি করছিল, টান হওয়া মুখখানা একটু ফাঁক হয়ে আছে, অপরিষ্কার দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে একটু, ক্রোধ আর ঘৃণা ফেটে বেরোচ্ছে যেন।

পঞ্চান্ন

কামিনী তার নিজের ঘরে গিয়েছিল, ঝাঁটপাট দিয়েছে, হাঁড়ি-কড়াইগুলো পুকুরের জলে ধুয়ে মুছে যার যা জিনিস তার কাছে পৌছে দিয়েছে। গেল ক'দিন ধরে ওদের ঘরে যেন বিবাহের উৎসব লেগে গিয়েছিল, আজ সেখানটায় খালি, যেন খাঁ-খাঁ করছে। সেই ছেলেগুলো পর্যন্ত নেই, সব যেন নিমেষে উবে গেছে।

ছুলির মা তার প্রস্তাব মতো নিজের ঘরে একবার গিয়েছিল, দুপুরের আগেই ফিরে এসেছে। মনে হল, সকালের ঘটনার প্রথম ঘোরটা কাটিয়ে উঠেছে সে, ইতিমধ্যে স্নান সেরে একখানা কাচা কাপড পরে এসেছে, মুখে পানের রঙ।

মা আর মেয়ে, দু'জনকে দুই অবস্থায় দেখল দুলির মা। দাওয়ার ওপর কামিনী বসে রয়েছে, মাথার চুল খুলে সামনে ঝুলিয়ে দিয়ে, আঙুল চালিয়ে চালিয়ে পরিষ্কার করছিল। আর ঘরের ভেতর পুলিসের ছড়ানো ধানগুলো ধামায় করে তুলছিল শামলী, থলেতে আবার ভরবার জন্য। দু'জনেই চুপচাপ, কেউ কারো সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছে বলে মনে হল না।

কামিনীর সামনে দাওয়ার ওপরই একটা খড়ের আঁটি পেতে বসল দুলির মা, তার ফর্সা কাপডখানা বাঁচাবার জন্যে। বললে, 'লাত্নী, রান্নাবান্নার কুন্থু কিছু দেখছি নাই, কী কাণ্ড, আজ কি সব উপাস না কি?'

ওরা কেউ কিছু বলছে না দেখে যোগ করল, এবার কামিনীকে উদ্দেশ করে, 'তুমাব ঘবে ত মজ্জিবাড়ি বন্ধ, থালে ভাতে-ভাত কর কিছু এখেনেই, বলি, পোড়া পেটে কিছু দিতে হবেক ত?'

এই প্রস্তাবে কামিনী মনে হয় খুশী হল, একটা কিছু করতে পাবে বলে। উঠে পড়ল সে।

দুলির মা এরপর ধামা কুলো টেনে নিয়ে কালকের অসমাপ্ত কাজ, পাতকুটি ঝাড়তে বসল। অনেকক্ষণ কারুর সঙ্গে আর নিজের থেকে কথা বলবার চেষ্টা করল না। মা মেয়েতে, বিশেষ করে শামলী যেন মুখ এঁটে রয়েছে।

সেই কাল বাত থেকে মেয়েটা যেন আর এক রকম হয়ে গেছে, দেখলে আশঙ্কা হয়। মুখ থমথমে হয়ে রয়েছে, পেলে যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চিবিয়ে খায়। কাজে বসবার আগে উঁকি মেরে ঘরের ভিতর দেখে এসেছে দুলির মা, শামলী ধানগুলো আবার সাজিয়ে রাখছে যত্ন করে, তুলে নিয়ে যাচ্ছে যেন ছেলে আদর করছে।

কিন্তু গল্প করা দুলির মার স্বভাব, এক সময় কামিনীকে বললে, 'তুমার বিয়াই-বাড়ি হয়ে এলম গ', উখেনের খপর শুনেছ?'

কামিনী উনুনে ফুঁ দিচ্ছিল, মুখ তুলে বললে, 'কী খপর, ই?'

'তুমার বিয়ান মেয়েছেলে, একা মনিষ্যি, সব লণ্ডভণ্ড করে দিছে গ'! জান, তুমার বিয়াইকে খোঁজ করতে সিপাই ইখেনে এসছিল ত, উখেনেও গেছল। তেনাকে পাবেক কুথা, ই তল্লাটে তিনি থাকলে ত। ত উয়াতেই যাত্তা (যাত্রা)

শেষ লয়, সিংবাবুদের লোক এসে উয়াদের সব ধান তুলে লি'গেছে…ত তুমার বিয়ান কী বলেছে জান, লি'যাও তুমরা, সব লি'যাও, মানুষট' নাই, ত ধান কী হবেক ?'

'হঁ, বল কী · ' কামিনীর হাতের কাজ থেমে গিয়েছিল।

'হঁ, তাই ত দেখলম, সব শূন্যি, খাঁ-খাঁ করছে। ভিতরে উঁকি মেরে দেখলম কি, তুমার বিয়ান দুয়ারে কাঁথা মুড়ে শুয়ে আছে, রোদের মধ্যে, দেখলে ছাতি ফেটে যায়, ত আমার মুয়ে একট' রা এল নাই যে কাড়ি, মানে মানে পালি' এলম…'

'হেই মা, উনিদের এই আবস্তা ! উনির কাছে যাব আমি, ভাতট' হক. তুমরা চারট' মুয়ে দিয়ে লাও, তারপর…'

বাস্তবিক, এর আগে কোনো দিন মথুর কৌড়িদের বাড়ি যায়নি কামিনী, শাম্‌লী ওদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেও নয়, সংকোচের জন্য। এখন ওর সে ভাবটা কেটে গেল, বললে, 'উনিরা মানী লোক, ইসব কী কাণ্ড বল দিকি !'

বিকেল গড়িয়ে এসেছে এমন সময় শাম্‌লী কামিনীকে বললে, 'মা, তুমি যে উথেনে আমার শাউড়ীর কাছে যাবে বলেছিলে, যাও কেনে, এখন গেলে ঠিক দেখতে পাবে তেনাকে…'

দুপুরে কামিনী একবার গিয়ে ঘুরে এসেছিল, গিরিবালাকে ঘরে পায়নি। আবার বোধ হয় সেখানে যাবার ইচ্ছা ছিল না, একটু ইতস্তত করতে লাগল। কিন্তু শাম্‌লী তাকে পাঠিয়ে দিলে এবং বলে দিলে যে রাত্রে যেন সেখানেই থাকে।

কথাগুলো বুঝিয়ে দিয়েই শাম্‌লী বেরিয়ে পড়ল। কামিনী এবং দুলির মা দু'জনেই হাঁ-হাঁ করে উঠল, 'কুথাকে যাচ্ছিস তুই, বনে-বাদাড়ে শিয়াল (সিপাই) ঘুরছে · '

মুহূর্তের জন্য এক রকম চোখে তাকাল শাম্‌লী, তারপর চলে গেল। ওর চাউনির সামনে ভয় পায় ওরা। দুলির মা একটু সামলে নিয়েই বলে উঠল, 'দিদি, তুমি যেথেনে যাবে যেও, আগে তুমার বিটী ফিরে আসুক, ই সাঁঝ লাগতে চলল, আমি একা ই ঘরে থাকতে লারব…'

কিন্তু সাঁঝ লাগলে কামিনীর পক্ষেও অত দূরে মথুর কৌড়িদের বাড়ি যাওয়াও সম্ভব নয়, তাই তাকে যেতে হল।

এদিকে সন্ধ্যার একটু পরেই ফিরে এল শাম্‌লী, কিন্তু সামনের যে চওড়া রাস্তা দিয়ে গিয়েছিল সেখান দিয়ে নয়, পিছনের বন-বাদাড়ের মধ্যে থেকে

বেরুল। ঘরের মধ্যে যখন ও ঢুকল তখন অন্ধকারেও চকচক করে উঠল—ওর বাঁ হাতে একটা রাম-দা, আর ডান হাতে লম্বা বল্লম।

সঙ্গে সঙ্গে তুলির মাও ঢুকল ঘরের মধ্যে। অন্ধকারে তখন জিনিস দুটো সুবিধে মতো জায়গায় রাখছিল শামলী। ভয় খাওয়া স্বরে বলে উঠল, লাতনী, ই সব তুমি কী করছ বল দিকি, তুমার মতলব কী ঠিক করে বল, থালে আমি থাকব, নালে এই আমার ঘরকে চললম…'

তুলির মা ভেবেছিল শামলী তখনকার মতো আবার একটা ধামটা দেবে, কিন্তু যেন কিছুই হয়নি, এমনি হাল্কা ভাবে বললে, 'সাম্তাল পাড়া গেছলম, ঠাকুমা, একমুনি দিল বইগুলান, আমার সই…'

'কী করবে উসব?'

'কী করবে উসব?…' পাল্টে শামলাই প্রশ্ন করল, আবার নিজেই বলতে লাগল, 'শুয়ার মারে, শিয়াল মারে, তুমাই শিয়ালের কথা বলছিলে নাই, তখন? দেখ, ঠাকুমা, উই বছর পরবের দিন শিকার মারতে গেছলম, বামুভনডুইর জঙ্গলে, ত একটা শজারু পারা শুয়ার পড়ল সামনে, ত দিলম ইফুঁড় উফুঁড় করে, আর একদিন একটা শিয়ালকে মেরেছিলম, ত একবারে লিকাশ করতে পারি নাই…'

'বল কি লাতনী, উসব পার তুমি?'

'ঠাকুমা, তুমি রাম-দাটা নিবে, আমি নিব বল্লমটা, শিয়াল ঢুকবেক কি দিব পেট ফুঁড়ে…'

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারল তুলির মা। কিন্তু যেটা বুঝতে পারল না, সেটা শামলীর একান্ত নিজের। গতকাল যখন থেকে গ্রামে সশস্ত্র পুলিসের আসার কথা শুনেছে, তখন থেকেই ওর এত দিনকার একটা ঘুমন্ত স্মৃতি হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, কিছুতেই ওকে স্বস্তি দিচ্ছে না। তার ওপর আজ সকালের ঘটনা। বুকের ভেতর ধিকধিক করছে ও।

তুলির মা কিন্তু মাথা নেড়ে বলল, 'উসব আমি লারব না, লাতনী, উসব আমার ধাতে নাই সাতপুরুষে।'

ছাপ্পান্ন

কামিনী গিরিবালার কাছে গিয়েছিল, কিন্তু তুলির মা তার ঘরে ফিরে যায়নি। অন্তর ধরবার মতো মন ওর না থাকলেও, কলার বাসনার মতো ভেঙে-পড়া

নয়, যদিও তার চব্বচাটি শুনলে সেই রকমই মনে হতে পারে। তাছাড়া, এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে শাম্‌লীকে ছেড়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

পাশাপাশি ছুটো জায়গা একই বিছানায়। ছুলির মা শুয়েছে, কিন্তু শামলী বিছানার শেষ প্রান্তে বসে রয়েছে, পাশে মাটির ওপর বল্লমটা শুইয়ে রেখে। রাম-দাটা রয়েছে একটু দূরে, দেয়াল ঘেঁষে।

শেষবেশ একটু আগে একটা জিনিস করেছে ওরা, সেটা ছুলির মার পরামর্শক্রমে। বাইরে দাওয়ার ওপর গাজন ছুলের থেকে পাওয়া মোহনের যে লাঙলটা ঝোলানো ছিল, সেইটে খুলে নিয়ে এসে দরজায় খিল লাগানোর পরও ভেতর থেকে ঠেকনো দিয়ে রেখেছে। ছুলির মা মন্তব্য করেছিল, 'যা তাল-পাতার মতন দরজা, কুকুরে লাথ মারলে ছাত্‌রে পড়বেক···', তাই এই ব্যবস্থা।

এখন শাম্‌লীকে বললে, 'তুমি কি সারা রাত বসে থাকবে না কি? একটুন গড়ি' লাও···', কিন্তু শাম্‌লী সে কথার কোনো উত্তর দিল না, কালো কালো স্থির চোখে লম্ফটার দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

রাত এগোচ্ছে, ছুলির মা কাপড়চোপড় একটু টেনেটুনে ঘুমোবার চেষ্টা করল, কিন্তু শুধু এপাপ-ওপাশ করতে লাগল। শেষে খানিকটা ঘুমোয়, খানিকটা জেগে থাকে, ঘুমোলে চম্‌কা লেগে ঘুম ভেঙে যায়, বোধ হয় কিছু শব্দ পেয়ে। এক সময় চোখ মেলে দেখলে, ঘর অন্ধকার, শাম্‌লী শুয়ে পড়েছে, নিঃশ্বাসের শব্দে মনে হয় ঘুমোচ্ছে।

এইটেতেই ছুলির মার মুশকিল হল, ঘুমটা গেল একেবারে উবে। শাম্‌লী জেগে ছিল বলে খানিকটা নির্ভয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু এখন বুকের ভেতর যেন হিম ধরতে লাগল। বাইরে নিষুতি, গভীর রাত্রের ঝিঁ-ঝিঁ, কে জানে বাইরের থেকে শুনছে না কি কানের ভেতর অনুভব করছে। মাঝে মাঝেই উৎকর্ণ হচ্ছে, আর চমকে উঠছে। রাস্তার দিকে, বোধ হয় বটতলায়, শেয়াল ডেকে উঠে থেমে গেল। চালের ওপর প্রথমে পাখির ঝাটপটি, তারপর বিড়ালের ফ্যাঁসফ্যাঁস উঠল। দূরে বড় রাস্তার দিকে একটা গ্‌র্‌র্‌গ্‌র্‌র্‌ শব্দ উঠল, স্পষ্ট হল, আবার দূরে মিলিয়ে গেল, পুলিসের গাড়ি টহল দিচ্ছে। পরপর তিনটে গাড়ি, বোধ হয় গ্রাম থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল, শব্দ শুনে তো তাই মনে হয়। আবার নিষুতি। একটা কুকুরের একটানা ডাক অনেক দূরে উঠে আরো দূরের দিকে মিলিয়ে গেল।

বোধ হয় তন্দ্রার মতো আসছিল ছুলির মার। হঠাৎ তড়াক করে ঘুম ভেঙে

গেল। শামলীর গায়ে ঠেলা দিয়ে চাপা স্বরে বলে উঠল, 'শুনতে পেইছিস?'

শামলী জেগেছে, শুনতে পেয়েছে। টুক্‌টুক্‌টুক্‌—তাদের দরজাতেই শব্দ হয়ে থেমে গিয়েছিল।

চকিতে বিছানায় উঠে বসল শামলী, হাত বাড়িয়ে বল্লমটা টেনে নিলে।

ঠক্‌ঠক্‌- এবারে শব্দটা আরো জোরে হল, মনে হয় দরজাটা নড়েও উঠল।

বিছানার ওপর উঠে দাড়াল শামলী, তাড়াতাড়ি শক্ত করে কোমরে কাপড় বেঁধে নিলে। বল্লমটা তুলে নিয়ে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, ঢুকলেই গাঁথবে, এই রকম ভঙ্গি করে।

'বউমা শামলী মা…' ধরা-ধরা মোটা গলায় ডাকল।

অন্ধকার ভারী হয়ে আছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে যেন।

'শামলী মা, জেগে আছিস, শামলী…' আবার ডাকল, সঙ্গে সঙ্গে দরজায় শব্দ হল।

'মথুরদাদা, তুমি!'

'বাবা!'

এক সঙ্গে বলে উঠল ওরা। মথুর বাইরে থেকে আবার সাড়া দিল, কথা বলল।

দুলির মা খুশী-খুশী গলায় বললে, 'দাড়াও, লাঙল-টাঙল সব আছে, দেরি হবেক। শামলী, আলো জ্বাল আগে…' পরক্ষণেই দুলির মা আবার সতর্ক হয়ে উঠল। 'ভাল করে সাড়া দাও দিকি, মথুরদাদা, রেতের বেলা অনেক মুখপড়া গলা ভাঁড়ায়।'

'না গ', দুলির মা, খুল দরজা, বিয়ান নাই?'

'তুমার গলাটা অমনধারা লাগছে কেনে?'

'দুলির মা, খুল দিকি কপাটটা…' মথুর যেন একটু বিরক্ত হয়েছে।

শামলী আলো জ্বেলেছে। দু'জনে মিলে লাঙলটা সরিয়ে দরজা খুলল। ঘরের মধ্যে ঢুকেই আবার দরজা বন্ধ করল মথুর, তারপর ওদের দিকে ফিরে দাঁড়াল। খালি পা, এই শীতের রাত্রেও, কিন্তু আগাগোড়া একটা পুরনো মোটা বাদামি রঙের আলোয়ান গায়ে জড়ানো, ওর দীর্ঘ পুরুষালি উপস্থিতিতে মেয়ে দু'জন বিহ্বল হয়ে উঠল, যে যার নিজের মতো করে।

দুলির মা ফ্যাক করে হেসে ফেলল, 'আমি বলি কুন মুখপড়া দরজায় টকা মারছে, রেতের বেলায় একলা মেয়েছেলের ঘর দেখে…'

শামলী একটু কাছে এসে গড় হয়ে প্রণাম করল, যা এতদিনের মধ্যে এক

দিনও সে করেনি। মথুর শাম্‌লীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করল। ছেলেমানুষের মতো হেসে বললে, 'তুমরা আমার গলা চিনতে পার নাই থালে! চিনবে কী করে, হিম লেগে সর্দি হইচে খুব, তাই গলাট' বসে গেছে, হাই যাঃ, লাঙলট' এখেনে কেনে…'

সব শুনে হা-হা করে হেসে উঠতে গিয়েও থমকে গেল মথুর, 'শালাঃ, প্রাণ খুলে দুট' কথা কইব, তার উপায় আছে? ফুন শালা শুনে ফেলাবেক…'

এরপর ফিসফাস করে কথা বলতে লাগল ওরা।

মথুর বললে, 'লাঙলট' শালা ঘরের জায়গা মেরে দিচে এগ্‌বারে, উট'কে ফাঁকে রেখে দি…' বলে দরজা খুলে পাশে দাওয়ার ওপর রেখে এল।

একটু পরে দেখা গেল, আর একটা পাতা বিছানায় একটা বালিশে ভর দিয়ে আড-শোয়া অবস্থায় রয়েছে মথুর, আর গলার কাছে বুকের ওপর গরম তেল মালিশ করে দিচ্ছে শাম্‌লী। নিজের আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করছিল মথুর। শাম্‌লী মাকে একবার দেখতে এসেছে, ভোর বেলার হাম্‌লার কথা জানে সে।

মথুর বলছিল, 'সাবধান সতর্কে থাকবে, মা লক্ষ্মী, এমন অবস্থা হল, নিজে ত দেখাশুনা করতে লারলুম, দিনের বেলা ত এস্‌তে পারি নাই'

অদূরে ওদের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসেছিল দুলির মা। সে বলে উঠল, 'হঁ গ', দাদা, সিপাইগুলা তুমার খোঁজ করছিল কিন্তুক, বলছিল তুমি ঘরের মধ্যে আছ!'

'উঃ, শালাঃ, শুকুন, শুকুন, ঠিক চোখ পড়েছে। শালাঃ, কাল রেতে ত আমি ইদিকে এস্‌ছিলম, কালই দেখা করতম, কিন্তু কেমন সন্দ হল, তাই পালায় গেলম…'

'অ মা, সি কি গ'…' দুলির মা অবাক হল।

'বাবা, থালে ত তুমার ইখেনে থাকা চলবেক নাই…' শাম্‌লী বললে।

'তা আবার চলে! এখখুনি চলে যাব আমি, শালাঃ…' বলল বটে মথুর, কিন্তু আলিস্যিতে বালিশের ওপর মাথা রাখল। শামলী ওর পায়ের ওপর কাঁথাটা ঢাকা দিলে।

দুলির মা এক সময় রহস্য করে বললে, 'তুমার এই বউট'কে ভাল করে বুঝি' যাও দিকি, অমনি করে দুশমনের সামনে বসে থাকলে চলে…' বলে সকাল বেলায় শাম্‌লীর সেই একরোখামির কথা বলল।

'না-না, সে কী কথা!' উত্তেজনায় উঠে বসল মথুর, প্রবল বেগে ঘাড় নাড়তে লাগল, 'শালারা চামার, পশু…কখন কী করবেক, ধর যদি লাথ মেরে দেয়

একট', কত মেয়ের গর্ভ খসাইচে উয়ারা ··বউমা, শুন, আমার বংশ রইচে তুমার পেটে, মহন আমার দত্তক পুত্ত, তুমাকে খুব সতক্ক থাকতে হবেক ·'

'হঃ· ' একটা অস্ফুট চিৎকার করে উঠল শামরী, বুটের লাথিতে গর্ভপাতের কথাটা ওর বুকের ভেতর তীরের মতো বিঁধল যেন।

পরক্ষণেই তুলির মা বলে উঠল, 'তাছাড়া সোমত্ত মেয়ে, যদি বেআব্রুর (বে-আব্রু) করে, খালে ? যোবতী মেয়েকে একটু লুকি' ছাপি' থাকতে হয়, হঁ।'

কী যেন হল শামরীর, ওর চোখের তারা দুটো কাঁপতে লাগল, দেহটা বসা অবস্থাতেই এমনভাবে নড়ে উঠল যেন সেটা হঠাৎ কাৎ হয়ে গেছে, পরক্ষণেই ঘুরে পড়ে গেল, মাথাটা মথুরের পায়ের কাছে।

প্রিয়জন মিলনে যেমন খুশী হয়ে উঠেছিল শামরী, তেমনি একটা মর্মান্তিক স্মৃতির আঘাতে ওকে মূর্ছিত করে ফেলল।

চোখেমুখে জল দিয়ে শামরীর জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিল ওরা, সে এখন ঘুমোচ্ছে ... আর মথুর নির্বাক হয়ে বসে ছিল পাশে।

এক সময় তুলির মা বললে, 'মেয়েটার দেহে কিছু নাই, মথুরদাদা, একে কাঁচা বয়সে সোয়ামী খুন হল, পুয়াতি মানুষ, তার উবরে ই খাটাখাটুনি, মাথায় ভাবনা-চিন্তা ·'

মুখ তুলে মথুর, 'হুম্' করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মথুরকে তার নিজের বাড়ির খবর দিল তুলির মা, কামিনীকে সেখানে পাঠানো হয়েছে জানাল। শেষে বললে, 'তুমি একবার ঘরকে যাও, একবার তিনিকে দেখা দিয়ে যাবে, মথুরদাদা।'

'সে আমি লারব, ঘরকে গেলে বড় বৌকে ছাড়াতে লারব, আর থালে নিরঘাত ধরা পড়ব আমি ·'

একটু চুপ করে থেকে তুলির মা এক রকম করে হাসল, 'আচ্ছা, দাদা, তুমরা যে এই দুন' মোষের লড়াই লাগায় দিলেক, ত হারজিত কেমনধারা হবেক ?'

মথুর সহসা উত্তর দিল না, গম্ভীর মুখে ভাবছিল। এক সময় নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'তুমাকে একট গপ্প বলি, শুন, ই আমাদের বংশের গপ্প···'

একটা বিড়ি ধরাল মথুর। থেমে থাকল একটু, মনে মনে বোধ হয় কাহিনীটা ঝালিয়ে নিচ্ছিল। ও জানত না ঠিক এই ধরনের গল্প একদিন গণপতি সিং বলেছিল তারক হালদারকে, পূর্বপুরুষদের নিয়ে এঅঞ্চলে অনেকেরই গল্প এই রকম।

মথুর বলতে লাগল, 'আমাদের গোপ বংশ, শিকারীর বংশ, ত আমার খুড়া-

ঠাকুদ্দা ভরত কোঁড়ি, পেল্লায় দেহ, পেল্লায় ক্ষ্যামতা, বাঘের যম, অন্তক আটট' বাঘ মেরেছিল, যেমন ভাতমুড়ি হয়ে গেছল···ত কী করে মরল তাই শুন, উই উদিকে কাঁসাইএর ধারে ক'দিন একট' বাঘ ঘুরছে, সবাই এসে ঠাকুদ্দাকে ধরে পড়ল, বাঘ মেরে দিতে হবেক···ত ঠাকুদ্দা গেল, ঘুরছে সেও ইথেনে উথেনে, লোকজন লিয়ে, যেন বেড়াচ্ছে ··ত একট' ঝোপ ঘুরে দেখল কি, বাঘ, ঠাকুদ্দা দাঁড়ি' আছে, ত দু'হাত আন্তরে বাঘ দাঁড়ি' আছে, বাঘ কিছু জানে নাই, অবাক হয়ে দেখছে শুধু···ঠাকুদ্দা করলেক কি, আশ্চয্য লিয়ত (নিয়তি) দেখ, শিকারী সব বিদ্যা ভুলে গেল, যেমন কুকুর মারে, তেমনি ঠাকুদ্দা বন্দুকের নল ধরে কুঁদা দিয়ে তার পিঠে বেড্ডাতে লাগল, বন্দুক গেল দু'খান হয়ে ··বাঘ তখন গজ্‌রাচ্ছে আর লেজ কাছড়াচ্ছে, লাফ দিয়ে ঠাকুদ্দার গলাট' কামড়ায় ধরল···' একটু থেমে যোগ করল মথুর, 'থালেই দেখ, কার হাতে কে মরে।'

'আশ্চয্যি···' দুলির মা বললে। একটু পরে খানিকটা অন্যমনস্কের মতো জিজ্ঞেস করল, 'থালে তুমাদের লড়ায়ে কে শিকার আর কে শিকারী, বল দিকিনি ?'

'দুলির মা, ওইট' সমিস্তের কথা। ধর, তুমি আমার শিকার, আমি তুমার শিকার ··'

ওরা দু'জনেই ভুলে যাচ্ছিল যে মথুরের চলে যাওয়া দরকার।

সাতান্ন

সেই রাত্রেরই শেষ দিকে আর একজন গাজন দুলের উঠোনে এসে দাঁড়াল তারপর দাওয়ায় উঠে গেল, সে হল পচাই। দরজার পাশে রাখা লাঙ্গলটার গায়ে হাত দিয়ে দাঁড়াল একবার, মনে হল দরজা ঠেলে দিদিকে ডাকবে, কিন্তু কী মনে করে দাওয়া থেকে নেমে এল সে, দেহ-ধর্মের আর এক প্রয়োজনে বনটনের দিকে চলে গেল, স্পষ্টত খানিক পরে এসে দিদিকে ডেকে তুলবে।

তিনদিন আগে এমনি সময় এই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল পচাই, তারপর গ্রামে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে। খুব একটা আক্ষেপ নিয়ে চলে গিয়ে ছল পচাই, তার কতটা মিটেছে সেই জানে, কিন্তু যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার ছিল ওর, তা হয়েছে। বনা টুডু তাকে কাজ দিয়েছে, কাজ সে করেছে। ইঁদুরের মতো ঘরের আঁদাল-কাঁদাল বন-বাদাড় বেয়ে নিঃশব্দে দ্রুত চলাফেরা করতে তার

জুড়ি ছিল না, ছিল না রাত্রির ছায়ার সঙ্গে ছায়া হয়ে মিশে যাওয়ার ক্ষমতার।

একটু পরে পচাই আবার যখন ফিরে আসছিল, তখন কোমরে গোঁজা ছুরিটা বের করে রাস্তার পাশ থেকে একটা নিমডাল কেটে নিলে। দাঁতন করতে লাগল সে, মুখটা ধুয়ে নিয়ে একেবারে ঘরে ঢুকবে। চোখ দুটো রাত্রি জাগার জন্য টকটকে লাল, ক্লান্তিতে পা দুটো টেনে টেনে হাঁটছিল, ওর একটু ঘুমনো দরকার।

হঠাৎ সামনে তাকিয়েই থমকে গেল পচাই—কে একটা লোক শাম্‌লীদের উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। কাপড়ে-চাদরে জড়ানো, ঢাকা মূর্তিটা, কিন্তু অনাবৃত লম্বা লম্বা বাঁকা ঠ্যাং দুটো পচাইয়ের চেনা। বিড়বিড় করে উঠল ও, 'শালাঃ, নারাণ জেলে...'

লম্বা ছুরিটা কোমর থেকে বের করে ফলাটা খুলে ফেলল পচাই, মনে হল ছুটে গিয়ে এক্ষুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে, কিন্তু কী মনে করে রাস্তা থেকে একটু সরে গেল, অতি সন্তর্পণে একটা গাছের আড়ালে লুকোল নিজেকে।

নারাণ দাওয়ার কাছে এগিয়ে গেল, যেখানটায় দরজার পাশে রয়েছে লাঙলটা। পচাই আর একটু এগিয়ে বট গাছটার কাছে চলে এল, এখন ভালো করে দেখতে পাচ্ছে।

নারাণ গলা খাঁকারি দিলে একবার, তারপর আবার জোরে কেশে উঠল। ভেতর থেকে ঘুম-জড়ানো স্বরে এক জন বলে উঠল, 'কে হে বাইরে, কে বট...'

অবাক হল পচাই, মথুর জ্যাঠার গলা। মথুর জ্যাঠা দিদিদের ঘরে এল কী করে।

নারাণ ফিরে দাঁড়াল এদিকে মুখ করে, এত দূর থেকেও পচাইয়ের দেখতে অসুবিধে হল না, ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে একটা কুটিল হাসি ফুটে উঠেছে তার মুখে। সে বাঁ হাতটা ঘরের পিছনে বনের দিকে একবার বাড়াল, তারপর সেই হাতটাই দরজার দিকে বাড়িয়ে একটা ইঙ্গিত করল। সঙ্গে সঙ্গে জনা চারেক পুলিস তাদের অফিসার সমেত আড়াল থেকে বেরিয়ে এল, দাঁড়াল উঠোনটার ওপর।

বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল পচাইয়ের, চেঁচিয়ে উঠতে চাইল সে, পারল না। কিন্তু একটা কাজ করল পচাই, নিজেকে আড়াল করে বটগাছটার আরো কাছে এগিয়ে গেল এবং একটা ঝুরি বেয়ে কাঠবিড়ালীর মতো গাছটায় উঠে গেল সেখানে উঠে দেখল, বাড়িটাকে ঘিরে ফেলেছে, একটা মানুষেরও গলে যাবার উপায় নেই। তাছাড়া, ঘরখানার একটিমাত্র দরজা।

'মথুর কওড়ি, বাহার আও…'

ঘরের ভেতর কেউ কাত্‌রে কেঁদে উঠল, পচাই বুঝল সেটা শামলীর গলা নয়। মায়ের কি?

'বাহার আও, নহী' তো দর্‌ওয়াজা তোড় দেগা…'

পচাই দেখল, লারাণ গুটিগুটি সরে আসছে, অতি সন্তর্পণে শেয়াল যেমন পালায়। এ দিকেই আসছে লোকটা। গাছের আর একটু ওপরে উঠে গেল পচাই। লারাণ একেবারে তার গাছটার নিচেই এসে দাঁড়াল, একটু আড়াল হয়ে। তার চোখ কান একাগ্র হয়ে ছিল উঠোনের দিকে, তা না হলে মাথার ওপর পচাইয়ের অস্তিত্ব টের পেত।

একটু দূরে গাছপালার মধ্যে পাখার ঝটপট, কয়েকটা পাখি ডেকে উঠল, পুবদিক থেকে প্রথম আভা ফুটে উঠছিল।

'মথুর কওড়ি?…'

'কী চায়েন আপনারা?' ভেতর থেকে বসা-বসা কিন্তু ভরাট গলায় জিজ্ঞেস করল।

'তুমারা পর হুলিয়া হ্যায়, অ্যারেস্ট করুঙ্গা, জল্‌দি করো…'

আবার কতক্ষণের নিস্তব্ধতা, সব যেন ঝিম ধরে আছে।

ভেতর থেকে মথুর কৌড়ি হেঁকে বললে, 'আমি ধরা দিব, কিন্তু ঘরে দুজন মেয়েছেলে আছে, তা দিকে চলে যেতে দিবেন, বলুন, বাবু?'

অফিসার এবং পাশের সিপাহীর মাথা দুটো একবার কাছাকাছি হল, দুজনে একমত হবার মতো ঘাড় নাড়ল। তারপর যে কথা বলছিল সে সজোরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, 'শালা লোক, তুম্‌হারা সব জরুকো হাম লে যাবে, জল্‌দি আও বাহার…ধরা দিব! ক্যা করেগা তুম!'

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র, তারপর দরজা খুলে গেল দড়াম করে।

কে বললে মানুষ, বিশেষ করে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা, ধীরেসুস্থে চিন্তা করে কাজ করে?

দিনের পর দিন চিন্তা করে কাজ করে যা হয় না, একটি অনন্য মুহূর্তে মানুষ অতি দ্রুত সেই একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করে ফেলে।

দীর্ঘদেহ মথুর কৌড়ি দরজার মুখে দাঁড়িয়ে। খোঁচা-খোঁচা কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়ি, চুলগুলো যেন জটার মতো, গায়ে রাত্রের সেই আলোয়ান নেই, কেবল একটা গেঞ্জি, মল্লের মতো কাপড় পরা। ডান হাতে বল্লম, বাঁ হাতে রাম-দা।

একটু আগে পর্যন্ত ধরা দিতে প্রস্তুত ছিল মথুর কৌড়ি, কিন্তু এখন বাঘ তার শ্বদন্ত বের করে গর্‌র্‌র্ করে উঠল, 'ক্যা করেগা! হুঁ, দেখ লাও, শালা লোক, তুমারা আপনা জরুকে, মা বোনকে লে শালাঃ, রাজপুত বংশ কুত্তা শালাকে ডর করে না, আয় শালা কুত্তারা'

সঙ্গে সঙ্গে মথুর রাম-দাটা ছুঁড়ল বাঁ হাতে, উঠোনের একটা সিপাহী কঁক্ করে উঠল, বল্লম তুলে তাক করল মথুর অফিসারের দিকে।

অফিসার বোধ হয় এমনি একটা কিছু ঘটতে পারে বলে তৈরি হয়েই ছিল, তার রিভলবার খট্‌খট্ করে শব্দ করল দু'বার।

কেবল ধুতি আর গেঞ্জি পরা মথুর কৌড়ির দীর্ঘ দেহটা পিছনে দেয়ালে ছিটকে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে লাগল সেই লাঙলটায় ধাক্কা, সেটা মথুরের দেহ ডিঙিয়ে দাওয়ার এপ্রান্তে পড়ে গেল, তার আগেই ডান হাতের বল্লমটা ছিটকে গেছে।

'পাকড়ো উস্‌কো' বলে অফিসার এগোল দাওয়ার দিকে।

দাওয়ার ঠিক নিচেই অফিসার, আর হাত দুই তিন দূরে দাওয়ার ওপর মথুর। আহত মথুরের চোখ দুটো ঘুরে উঠে এখন স্থির হয়েছে সামনের দিকে, মাঝখানে পড়ে-থাকা লাঙলটার ওপর ওর দৃষ্টি, আধ-বোজা চোখ, এখনই সম্পূর্ণ বুজে যাবে।

নিববার আগে রাজপুতের প্রাণ শেষ বারের জন্য দপ করে উঠল যেন। দেহটা খাড়া করে বসল ও, প্রচণ্ড মনের জোরেই বোধ হয় লাঙলটা দু'হাতে তুলে ফেলল, নিজের দেহটাকেও, ছুঁড়ে দেবার ক্ষমতা ছিল না, গাছ যেমন মড়মড় করে পড়ে, তেমনি করে লাঙল সমেত অফিসারের ওপর পড়ল, দুটো দেহ গড়িয়ে পড়ল উঠোনে।

সিপাহীরা যখন ব্যস্ত মথুর আর অফিসারকে নিয়ে, তখন খোলা দরজা দিয়ে একটা বুনো জন্তু যেন ছিট্‌কে বেরিয়ে এল, উঠোনের আর একটা কোণ দিয়ে তীরের মতো শাম্‌লী কোথায় গাছপালার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

'মারায় দিলেক!' এদিকে বটগাছতলায় নারাণ জেলে মাথায় জড়ানো চাদরটা খুলে ফেলে অস্থির হয়ে উঠেছিল, 'উয়াকে মারলেক, মেয়াটা পালায় গেল, ই কী হল' ঘটনার এই রকম সব পরিণতি বোধ হয় সে ভাবেনি।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে তার মাথায় ঘাড়ে প্রকাণ্ড ভারী কী জিনিস পড়ল একটা, কিছু বুঝবার ভাববার আগেই মাটিতে পড়ে গেল সে। পচাই একটুও দেরি করল না, বুড়োটার বুকের ওপর চেপে বসল। বাঁ হাতে বুড়োর বিরল

চুলের গোড়ায় খামচে চেপে রেখেছে মাটিতে, আসন্ন-যুবক পচাইযের পিঠের ঘাড়ের বাহুর পেশী ফুলে শক্ত হয়ে উঠেছে, আর ডান হাতে তার লম্বা ছুরিখানা, সজোরে বসাল বুড়োর উল্টে-আসা ডান চোখে প্রথমে, তারপর বাঁ চোখে। কয়েক বারই চালাল। বিড়বিড় করে বললে, 'শালাঃ, তোর চোখ গালব বলেছিলম ··'

তারপর চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল পচাই, শামলী যে দিকে গেছে তার উল্টো দিকে. সেই রকম একটা বুনো জন্তুর মতো।

আটান্ন

ভোর বেলাটা পরিষ্কার ছিল, কিন্তু সূর্য ওঠার একটু পরেই কুয়াশা দেখা দিল। আরো একটু পরে কুয়াশাটা এত ঘন হয়ে উঠল যে গ্রামের পথে দু'হাত দূরে কিছু দেখা যায় না, কেবল কুয়াশার মিহি ফুটকিগুলো যেন ঘুরছে, সরে যাচ্ছে, ভাসছে, এই রকম মনে হতে লাগল। একটু বেলা করে কুয়াশাও কেটে যেতে থাকে। দুপুর বেলায় রোদটা খুব চখ হয়ে দেখা দিল, সকালে কুয়াশা হলে যা হয়। বিকেলের দিকে হাওয়া উঠল একটা, প্রহরখানেক ধরে গাছপালাগুলোকে তা নাড়া দিতে থাকল। সন্ধ্যার মুখে চাঁদসোলের ওপর শুকতারা নেমে এল, পশ্চিম দিকের আকাশে বিরাট একটা লাইন জুড়ে মেঘ থমকে বসেছে, সাদা কালো লাল, খুব উজ্জ্বল প্রথমে, তারপর নিভে আসতে থাকে। সামনে রাত রয়েছে।

আবার দিন আসে, রাত হয়। কিন্তু একটা ঠিক আর একটার মতো নয়, পরিবর্তন হয়, পৌষের দিনগুলো মাঘের দিনে গড়িয়ে আসে, মাঘ আসে ফাল্গুনে. তারপর চৈত্র, তারপরও বৈশাখ।

অনিবার্য রূপান্তর।

সেই শামলীও বদলে গেছে। তার মুখ শুকনো, ঠোঁট ফ্যাকাশে, চোখ কালো হলেও রক্তশূন্য, তার মাথার চুলে বিনুনি বা খোঁপা থাকে না. হাত-পাগুলো আগেকার মতোই কাঠিকাঠি, বড় পেট সমস্ত চেহারার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন, বেঢপ, সে আসন্নপ্রসবা। মথুরের বাড়িতেই এখন রয়েছে।

ওদের গোচালাটা এখন আবার চালু হয়েছে। সমস্ত শীতকালটা শুধু মথুরের কেন, গাঁয়ের অনেক চাষী আর গোপের গরু ছাড়া ছিল। যে রকম সময়টা গিয়েছে তাতে সকাল দুপুর সন্ধ্যায় গরুর তদারকি করার লোক ছিল না, অন্তত

মথুরের বাড়ির তো নয়ই। তাছাড়া মাঠে ফসল ছিল না বলে ওগুলো বন্য নিয়মে চরে বেড়াত। শেষের দিকে গরু চুরিচামারি হয়েছে, কতকগুলো চলে গেছে কোথায়, কোনো গৃহস্থের গরু এক-আধটা অপঘাতে মরেছে। গাই বকনা ষাঁড় মিলে মথুরদের গরু ছিল সাতটা, এখনো তাই আছে। তার মধ্যে একটা গরু বিইয়েছে, একুশে যায়নি এখনো।

শামলী গোচালায় গরুকে জাবনা দিচ্ছিল।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যাবেলাটা ঠিক শীতের সন্ধ্যার মতো নয়। শীতের সময় সূর্য ডোবার আগে থেকেই অন্ধকার পর্দার মতো হয়ে নামে, আর এখন সূর্যাস্তের পরও যেন চোখ বুজতে চায় না, সব কিছুই খটখটে, পরিষ্কার দেখা যায়। মেদিনীপুর জেলার এ অংশটা বিহারের পাহাড়ে অঞ্চলেরই শেষ প্রান্ত, পাথুরে মাটি সারা দিনের রোদ খেয়েছে, গরমটা এখন ভাটি দেবার পর আখার ঝিঁটগুলোর মতো, হুসহুস করছে। বাঁ হাতের তেলোর পিছন দিয়ে ঘামে-বসা চুলগুলো কপাল থেকে সরাল শামলী, বাতাসটা হল্‌কার মতো মুখে লাগছে। শামলী খড় কেটে, কুঁড়া-নুন মেখে দিচ্ছিল ছোটবড় মাটির ডাবায়, এক-আধটা করে গরু ফিরে আসছে, আর শামলী একটা বা দুটোকে এক-একটা ডাবায় জুতে দিচ্ছে।

ওদের গোয়ালে একটাই ষাঁড়। ষাঁড়টার উঁচু কুঁজ, বড় সিং, খুব তেজী। মথুরের খুব প্রিয় ষাঁড়, ওটাকে সে-ই বশ করতে পারত, আর এখন পারে শামলী। সেইটে নিচু কোমরের ছোট লেজ ঘুরিয়ে গরম বাতাসের মতোই ফোঁস ফোঁস করতে করতে চালাটার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওটার আলাদা একটা ডাবা রয়েছে, কিন্তু সেদিকে না গিয়ে—ওটার মতলব কী বোঝা গেল না। অন্য গরুগুলো ভয়ে সিঁটিয়ে গেল, দুটো গাই জাবনা খাওয়া ছেড়ে আর এক কোণের দিকে পালিয়ে গেল, অন্যগুলোকে ঠেলা দিয়ে।

শামলী জাবনা দেবার কাজে হাত চালাতে চালাতে মুখে হেট্‌-হেট্‌ করে তাড়া লাগাল, কিন্তু ষাঁড়টার কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখা গেল না। তখন একটা হাত দুয়েক পাকা কঞ্চির লাঠি নিয়ে এগিয়ে গেল শামলী, ষাঁড়টা মাথা একটু নুইয়ে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল। রাগ হল শামলীর, ওটার নাকের ওপর মারল একটা বাড়ি, ষাঁড়টা পরের মার এড়াবার জন্য ঘাড়টা সরিয়ে নিল, অনিচ্ছুক পায়ে নিজের জায়গায় গিয়ে পৌঁছাল। খুঁটিতে মোটা দড়ির 'গলান' ছিল, সেইটে স্বচ্ছন্দে ওর গলায় বেড় দিয়ে দিল শামলী। লাঠি তুলে বলে উঠল, 'থাক, বন্ধনে থাক, তুমি যেমন কুকুর আমি তেমন মগুর···'। ষাঁড়টা মুখের দিক ঠিক রেখে

পিছনের পা সরিয়ে সরিয়ে দু-একবার এপাশ-ওপাশ করল, তারপর ডাবার মধ্যে মুখ ডোবাল।

এসবে হাঁপিয়ে উঠেছিল শাম্‌লী, চালাটার বাইরে বেরিয়ে এসে আঁচল খুলে মুখে বাতাস করতে লাগল। চালাটার ভেতর দিকে ঠাওর করে বুঝল আরো ছাঁনি লাগবে, একটা ছোট ঝুড়ি নিয়ে ভেতরের উঠোনে চলে গেল শাম্‌লী।

উঠোনে প্রায় মধ্যিখানে লুস্‌কি বুড়ি দাঁড়িয়ে আছে, দেখছে একটু পাশের দিকে, ওদের দুধালো গাইটা দুইছে গিরিবালা। এরা একুশের ভেতর দুধ খায় না। পালানে যত দুধ হয়, ছোট বাছুর তার সবটা খেলে অসুখ করবে, তাই দুধ দুয়ে নিয়ে ফেলে দেয়।

একুশে যাবার আগে বাইরের লোকের সামনে দুধ দোয়ও না ওরা, কিন্তু লুসকির কথা আলাদা। তাছাড়া, গিরিবালার মতি বদলে গেছে, আগে যে মথুরকে ঠেশ দিয়ে দিয়ে সাঁওতালদের সম্বন্ধে পিটপিট করত এখন সেটা নেই। একেবারে গায়ে গায়ে পাড়া, গিরিবালা আর শাম্‌লী দু'জনেই বিধবা, অনাথ, সহায়-স্বরুতের কার আর দরকার নেই। আর লুসকি, সে গুনিন, মারতেও আছে রাখতেও আছে।

লুসকি কেন এসেছে শাম্‌লী জানে না, অনেকক্ষণ থেকেই শাশুড়ীর কাছে আছে। ওর সেই চিরকেলে পরিচিত মূর্তি, হাঁটু পর্যন্ত কাপড়, মিলিয়ে যাওয়া বুকের ওপর বেড় দেওয়া, খাটো খাটো চুল কাঁধ পর্যন্ত, মোটা হাড়ভাড় চোয়াল, কাঁধ, হাতের কনুই, আঙুল—তবে রোগা হয়ে গেছে খুব, চামড়া লোল হয়ে গেছে। ঘোলাটে চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, যখন কিছু দেখছে তো দেখছেই, যেন বিঁধে ফেলবে।

শাম্‌লীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে গিরিবালাকে লুস্‌কি বললে, 'তুর নাতি হবেক, পথম ঘরে দুধ হল, লাতিকে খাআবি, ভাল হল ··'

লালচে গাইটার পালানের কাছে উবু হয়ে বসেছিল গিরিবালা, বাছুরটারও রঙ লালচে, গরুটারই একটা পায়ে বেঁধেছিল সেটাকে, বাছুরটা কেবলই টান খেয়ে গিরিবালার গায়ে এসে পড়ছিল, সেটাকে এক হাতে সরিয়ে দিতে গিয়ে ময়লা থান কাপড়টা সুদ্ধ হাঁটু থেকে সরিয়ে ফেললে, ঘাড় ফিরিয়ে লুস্‌কির কথার উত্তরে অপরিষ্কার দাঁতে হাসল, উদ্বিগ্ন রুক্ষ মুখ, বললে, 'দেখ না, দিদি, কী জানি কবে হবেক, মাসের হিসাব নাই, পরের ঘর ঠিঙে বেটার বউ এস্‌ছে···'

শাম্‌লী ঝুঁকে পড়ে ছাঁনি নিচ্ছিল ঝুড়িতে, তার গর্ভের ওপরটাতে বুকের কাপড় সরে গিয়েছিল, সেই দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল লুস্‌কি, বললে, 'পুয়াতির

মাইএর বঁটা ভাঙি লাগছে, হবেক, ই দশ দিন পনর দিন যাবেক, আর লাতি হবেক…'

• হে মা কালা, তাই যেমন হয়…' গিরিবালার দুধ দোয়া হয়ে গিয়েছিল, বাছুরের গলার দড়িটা টেনে খুলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

শামলী কিছু বলল না, বুকের কাপড় টেনে দিয়ে বাইরে চলে গেল।

গিরিবালা বললে, এস না দিদি বসবে একটু…' গিরিবালার গলার স্বরটা কেমন ভেরা-ভেরা, বসা-বসা। আজকাল মাঝেমধ্যে ওর গলায় ব্যথা হয় কিন্তু সেদিকে লক্ষ করে না, এমনি চলছে।

দুধের বালতিটা দাওয়ার ওপর দেয়ালের পাশে রেখে দিল গিরিবালা, দুটো আসন পাতল দাওয়ার প্রান্তের দিকে। লুসকি বসলে একটা হাতপাখা এনে দিল তার হাতে, 'লাও, বাতাস খাও, দিদি. ই যা ঝাঁঝাল বয়, গা-গতর সিদ্ধ করি' দিচ্ছে…' নিজে পাখা নিল না, কিন্তু গলার কাছটার থেকে কাপড় একটু আলগা করে দিলে, হাত-পা ছড়িয়ে বসল।

আগেকার কথার সূত্র টেনে বললে, মেয়েটা'র গায়ে-গত্তি কিছু নাই, কিন্তু কাজ-কাম করছে সব। তাও বলি, বউমা, তুমার এখন গতর লাড়ি' কাম নাই, ত আমার কথা শুনে। ত কাজ-কাম করছে ঠিক কিন্তু বাতাসে যেমন হেলছে…'

লুসকি বাধা দিয়ে বললে, 'না গ', জলে মাছ খেলিছে পুয়াতি কাম করিছে, উয়ার ছেটা-বিটী ভাল হবেক…'

গিরিবালা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল, 'তা বটে। তবে কি জান, বউমায়ের ব্যারাম হইচে, কী এক মূর্চ্ছো ব্যারাম…আগে ছিল নাই, সেই কত্তা যিদিন গত হলেন, সেই রাত্তে আধ হল, ত মাসে একবার অন্তক হচ্ছে. এই ত পরশু দিন একবার হয়ে গেল। কী হল জান, বিটী গুম খেয়ে বসে আছে, আছে ত আছে, মাটির দিকে কটমট করে চেয়ে, হঠাৎ চিৎকার করে পড়ে গেল মাটিএ, চোখ উল্টে গেছে, হাত-পা সিঁটি গেছে…দাও না, দিদি, উয়াকে ভাল করে. তু ত অনেক মন্তর-তন্তর জান…'

'দিব, ই মঙ্গলবারে সাঁঝা বেলাকে যাবি তুই, বড়মতলাকে লিযাব তুকে, উনাকে একটা জড়ি দিব, তাবিজ করে বা হাতে বাঁধি দিবি…'

'হ-হ, দিদি, খুম ভাল হয় থালে, বিটীর জন্যে ভেবে আর বাঁচি নাই…' আশায়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশে গিরিবালার বসা স্বর আরো বসে গেল।

'যাবি, মঙ্গলবার, দিব…' উঠে পড়ল লুসকি। গিরিবালাও তার সঙ্গে এল,

ওকে একটু এগিয়ে দেবার জন্য। দরজা দিয়ে সেই সময় গোচালার পাট শেষ করে শামলী ভেতরে ঢুকছিল, কপালের ওপর ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দিয়েছে। গিরিবালা বললে, 'বউমা, শুন ··', বলে নিজের আঁচল দিয়ে ওর মুখটা মুছিয়ে দিলে। 'তুই সাঁঝের পিদিমটা জাল, আমি দুট' কথা কয়ে এক্ষুনি এস্ছি ··'

দরজার বাইরে এল গিরিবালা, ব্যাখ্যা করে লুস্কিকে বললে, 'বিটী সাঁঝ দিবেক কি, শাঁখে ফুঁক দিতে লারবেক, ভরনে কাল ত, তাই · '

গিরিবালার কিছু বলার ছিল, সেইটে বলল এখন, 'দেখ দিদি, তুমাকে একট' কথা বিশ্বাস করে বলি ই কথা কাকেও বলি নাই, বলব আর কাকে, উই যে গ', দুলির মা, বউমা উয়াকে ঠাকুমা বলে, আসে যায়, ত পেট-পাত্লা মেয়ে, বলব কি, সাত কান করে ছাড়বেক, তখন!'

'কী বুলবি, কী কথা·· ' মনে হয় লুস্কি অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

'বলছি, বলব বলে ত এলম তুমার সঙ্গে। বউমায়ের মা, উই যে গ' কামিনা, আমার বদ্নাম দিয়ে বেড়াইছে, বলে তার বিটীকে আমি বশ করে দিয়েছি, ওষুদ করেছি···'

'কেনে ··'

'কেনে কি, মায়ে-ঝিয়ে পোষ্য নাই, উয়াদের দু'জনে কী হইচে কী জানি, মা কালীর দিব্যি, আমি রা-ট' কাড়ি নাই, ত বিটী মাকে দেখতে পারে নাই দু'চক্ষে, উয়াদের ঘরে যায় নাই, বল তুমি দিদি, উইট' কি আমার দোষ!'

'না, তুর দোষ হবেক কেনে···' লুস্কি বললে।

গিরিবালা জোরে জোরে ঘাড় নাড়ল, শোকাতাপা মানুষ, একটুতেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে, বললে, 'তুমিই বল! তবে এইট' ঠিক, দিদি, বিটী আর জন্মে আমার মা ছিল, কত্তা চলে গেল, ত এত বড় ঘরে উ বিটী আর আমি, সেবা-সুস্থ খুম করে, বুড়া বয়সে···আজ যাই দিদি, মঙ্গলবারে ঠিক যাব · ' বলে গিরিবালা চলে এল।

উনষাট

এর মাস তিনেক আগেকার কথা।

পুরনো গাড়ির ইঞ্জিন যেমন চলছে তো চলছে, আবার থেমেও যাচ্ছে, আবার চলছে, চাঁদসোল গ্রামের একেবারে ওপ্রান্তে অন্নপূর্ণা রাইস মিল

মাঝখানে অনেক দিন বন্ধ থাকার পর তেমনি আবার খুলেছিল। মুখে মুখে খবর রটে যেতে ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়েরা এসে হাজির হয়েছে, ধান সেদ্ধ-শুকনোর বিরাট চাতালটায় এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে বসে জটলা করছে। দুলির মা আর কামিনীও ছিল সেই দলে।

একটা মেয়ে বললে, 'হঁ গ', ধানকল যে চালু হবেক, ত ধান কুথা?'

'কেনে, চোখে কি চাল্‌সে লেগেছে না কি, বস্তাগুলান দেখতে পাস নাই?'

কাছারি-বারান্দার এক কোণে তিনটে ধানের বস্তা পড়েছিল, সে দিকে তাকিয়ে কয়েকটা মেয়ে এক সঙ্গে হেসে উঠল, একজন ঠমক দিয়ে দিয়ে বললে, 'এক কুড়ায় কিনেছি খাসি, লোক জুটেছে বারশ' আশি...বলি হ গ', ই যে সাত রাজ্যের মেয়েমানুষ জুটেছে, ক'জনের কাম হবেক উই কটি ধানে?'

'মেয়েমানুষ জুটবেক নাই ত পুরুষমানুষ কুথা পাবেক, ই মুল্লুকে পুরুষমানুষ আছে একট'?'

'কেনে, রেতে তোর ঘুম হয় নাই, পুরুষমানুষ পাস নাই...'

একটা হাসির লহর উঠল।

একজন বললে, 'উয়ার এক কথা, চিরটা কাল ত মেয়েমানুষেই ধান সিদ্ধ-শুকনা করল, তাই এখন এসছে।'

এমন সময় একটা আলোড়ন উঠল, ধানকলের ম্যানেজার অভয় সরকার ঢুকেছে। ফাল্গুন মাসের সকালবেলা, বাতাসে একটুখানি শীত-শীত আছে মাত্র, কিন্তু হাঁটু পর্যন্ত শাল দিয়ে ঢেকে-ঢুকে এসেছে, লোকে বলে, ওর মধ্যে পিস্তল লুকানো থাকে।

ভিড় করে মেয়েগুলো কাছাকাছি হয়ে এল, বারান্দার ওপর যেখানে চেয়ার-টেবিল পাতা আছে, সেখানে আগেকার অভ্যাস মতো উঠে পড়ল কেউ কেউ। পিছনে সেই মেয়েগুলোর মধ্যে একজন ফিসফিস করে বললে, 'উই লাও, কেষ্ট ঠাকুর আলেন, উই একট' পুরুষ মানুষ আর ই ষোলশ' গোপিনী...'

তারপর একটু হাসাহাসি ঠেলাঠেলি আরম্ভ হল।

সরু রিমের চশমার ওপর দিয়ে সংশয়া দৃষ্টিতে তাকাল অভয়, এই চশমাটা নতুন নিয়েছে সে, মাথার চুলগুলো পেকে উঠেছে, খাটো করে ছাঁটা, ভারী মুখখানা এখন রোগা, ঢিলেঢালা, বলে উঠল, 'তোরা এত জন সব এসেছিস কেনে, আর কে বলল আজকে মিল চালু হবেক?'

'কবে হবেক গ', বাবু, শুনলম যে...'

'দু'এক দিনেই হবেক, খোঁজখবর রাখবি...আর এত লোক নয়, দশ-পনের

জন করে আসবি, যা সব আজ…হঁ, আজ চাতালটি ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করে যা…' থমকে গেল অভয়, বোধ হয় কোথাও ভুল হয়েছিল, তৎক্ষণাৎ যোগ করল, 'জন দুই কামিন ঝাঁট দিতে জঞ্জাল পরিষ্কার করতে লাগ, মজুরি দিয়ে দিব।'

শুকনো পাতা যেমন এলোমেলো বাতাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে, তেমনি মেয়েগুলো সরে যেতে লাগল। কতকগুলো হুড়মুড় করে বেরিয়ে গিয়েছিল আগেই, কতক কাজ হবে না জেনেও চাতালে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগল, পুরনো চেনা জায়গার জন্যেই হয় তো, বাকি সব আস্তে আস্তে বেরোতে লাগল। ডুলির মা কামিনীর সঙ্গে চলে যাবার সময় বলল, অভয় সরকারকে লক্ষ করে, 'দেহটা কাহিল দেখছি যে গ', দাদা।' চোখে তার ইঙ্গিতময় হাসি।

'হঁ, দিদি, দেহটা ভাল নাই…' শুকনো স্বরে অভয় বললে।

রাস্তায় পড়ে মেয়েরা চুপ্ সে গেল, এরপর কী করবে।

একটা ছোট্ট দলে বলাবলি হচ্ছিল, 'যখন ঘরে ঘরে ধান উঠল, তখন কল চালু করল নাই, আর এখন কল চালাবেক, হঁঃ, ঢঙ আর কি…'

'তখন দিনকালটা চলছিল কেমন, কল চালাবেক কী করে…' এক প্রৌঢ়া বললে। তারপর যেন একটা ভাবনা পেয়ে বসল ওকে, 'আচ্ছা, সি দিনগুলান কেমনধারা বল দিকি, সবের ঘরে ধান, হামারে ধান, উঠানে ধান, এঁদালে-কঁদালে ধান, পাড় চাল কর খাও, কেউ কুনদিন দেখেছে ইসব! তারপর সব লুটপাট হল, মালিকের লোকে লিল, চোর-ডাকাতে লিল, তা'পরে গাঁয়ের ইলোক-সিলোক লিল, তা'পরে এখন সব ফাঁকা! পেট চাপড়াও আর মর! কী হল ইসবে?'

'হঁ লো, যৈবন কি চিরকালটা থাকে!' এক বুড়ি কোমর বেঁকিয়ে খনখনে স্বরে বলে উঠল। কথাটায় হকচকিয়ে গেল সবাই।

'ই কথার মানে কী হল, মাসী, কেনে বললে তুমি?'

'কেনে বললম কী, তুরা আপন আপন ভেবে দেখ।'

অন্য কতকগুলো মেয়ে ঘুরতে ঘুরতে কথা বলতে বলতে আড়াইক্রোশী মাঠটার ধারে এসে পড়েছিল। একজন প্রস্তাব করলে, 'চল, জঙ্গলে যাই, কাঠকুটা ভাঙি গে…'

'তাই চল গ', দিদি, ঘরকে যেয়ে আর কী করবেক?'

মাঠে নেমেই ওরা দেখল, দূরে এখানে-ওখানে মেয়েদের ছোট ছোট দল জঙ্গলের দিকে চলেছে।

'উয়ারাও যাচ্ছে দিকি জঙ্গলে, কারা সব বল দিকি?' একজন ঠাওর করার চেষ্টা করল।

'জঙ্গলে যাচ্ছে কি খালে-বিলে মাছ ধরতে যাচ্ছে কে জানে ··'

'ভূতের মা জানবেক, আবার কি ··চল চল, পা চালায় চল, রোদ কী রকম চখ হইচে আজকাল দেখেচ ·'

সকালবেলার শীত-শীত ভাবটা কখন কেটে গেছে, মাঠের মধ্যে খর রোদ ফেটে পড়তে শুরু করেছে।

যতদূর চোখ যায়, খাঁ-খাঁ করছে মাঠখানা, সেদিনের সেই মাঠটা আর চেনা যায় না। ছাড়া গরু চরছে এখানে-ওখানে, মনিষ্যির মধ্যে একটা বাগাল পর্যন্ত নেই। মাঝে মাঝে কান্নার সুরে গান গাইতে গাইতে সাঁওতাল মেয়েরা এদিকে ওদিকে চলে যাচ্ছে।

রিক্ত শস্যশূন্য মাঠ ক্রমে ফেটে উঠবে, ধুলো উড়বে, রোদে উত্তপ্ত হয়ে বাতাস থেকে উর্বরা শক্তি টেনে নেবে, এই ক'মাস চলবে এইভাবে।

রিক্ত মাঠ গোপনে গোপনে বদলাচ্ছে, প্রস্তুত হচ্ছে।

ষাট

এদিকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কামিনী আর দুলির মা অন্যমনস্কভাবে পথ হাঁটছিল। কামিনী আজকাল বিশেষ কথা বলে না, বলবেই বা কার সঙ্গে? তার পায়ের পোড়া ঘায়ের ব্যাপারটা মাঝখানে একেবারে সেরে উঠেছিল, এখন মাঝে মাঝে কনকন করে আর হাঁটুতে খিঁচ ধরে। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল সে।

দুলির মা বিমনা হয়ে রয়েছে। কাজকাম পাওয়া গেল না। গত মরশুমে যখন সবাই ধান নিয়ে গিয়েছিল, তখন সে নিজের ঘরে একটা দানাও নেয়নি, সব করেছে অন্যের জন্যে। কত জনে ওকে বলেছে। কিন্তু সে বলত, 'আমার ঘরে ইঁদুরের গর্ত আছে দু'কুড়ি। আমার ভাই ই বেলা আনি ই বেলা খাই, উ বেলাকে রাখব কি, ইঁদুরে টেনে লি'যাবেক···'। আর ধান নিয়ে গেলেই বা কী হত, যারা নিয়ে গিয়েছিল, তারা রাখতে পারল কি?

শুধু কাজ না পাওয়ার জন্য নয়, এই যে অভয় সরকারকে সে একটা কথা বলল কিন্তু তাচ্ছিল্য করে এড়িয়ে গেল লোকটা, সেইটে মনের মধ্যে লেগেছে ওর। পুরনো দিনকাল আর নেই।

এক সময় চমকে উঠে ও বললে, 'অ বউ, ই কুথাকে যাচ্ছি আমরা, ই যে গাঁ ছাড়ি' যাচ্ছি গ', আর একটু যাই ত চণ্ডীতলা আসবেক···'

কামিনী চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। সিংবাবুদের বাড়ির দিক থেকে যে উঁচু রাস্তাটা পাকা সড়কে গিয়ে মিশেছে, সেটা সামনে দেখা যায়। বললে, 'আমি কী জানি, তুমি যাচ্ছ ত আমি যা'চ্ছি···'

'আ মরণ!···' বিরক্ত হল দুলির মা, তারপর ভিন্ন স্বরে বলে উঠল, 'এস্‌ছি ত এস্‌ছি, চল, চণ্ডীতলাকে যাই, মটরে উঠে মেদ্‌নীফুর-খড়গফুর চলে যাব··· না-না, শুন, সড়ক পার হয়ে আধ কোশটাক গেলে পেল্লায় দিঘি একট', বামুনদিঘি বলে, শালবনের ভিত্‌রে, চল সেখেনে, কলা-মুলা কিছু পাব, হ্যা-হ্যা ·' দুলির মার এই মেঘ এই রোদ, আবার ওকে ফক্কুড়িতে পেয়ে বসেছে।

উঁচু কাঁচা রাস্তায় উঠেছিল ওরা, পশ্চিম মুখে আর একটু চললেই চণ্ডীতলা পড়বে। হঠাৎ পিছন ফিরে দুলির মা দেখলে, কামিনী অনেক পিছনে পড়েছে, একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক কী খুঁজছে।

'কী হল তুমার, বউ?'

'হঁ, দেখ···' কামিনী একটু কাছাকাছি এসে বললে, 'পচাই বলেছিল, ইখেনে কুথা গত্ত-ফাঁদ তয়ের করেছিল, তীর দিয়ে উয়ারা সিপাই মেরেছিল, উইট' কুথা বল দিকি?'

কৌতুহলী হয়ে অনিশ্চিত ভাবে দুলির মাও এগিয়ে এল, 'ইখেনে, বল কী! পচাই বলেছিল?' বলে সেও চোখ চারাতে লাগল।

ঘটনাটা ছিল এই রকম। সদর থেকে এসে পুলিসের ট্রাক গ্রামে ঢুকত এই রাস্তা দিয়েই। বনা এবং পচাইয়ের দল, রাতারাতি এই কাঁচা রাস্তাটা কেটে ডালপালার আড়াল দিয়ে ফাঁদ তৈরি করেছিল এক জায়গায়, শেষ রাত্রে একটা ট্রাক উল্টে পড়েছিল, ড্রাইভারকে তীরবিদ্ধ করতে পেরেছিল ওরা। রাস্তা মেরামত করে আবার গাড়ি চালু করতে ওদের একটা পুরো দিন পুরো রাত লেগেছিল।

কামিনীরা কিন্তু খুঁজে-পেতে কোনো চিহ্ন পেল না, এক জায়গায় রাস্তার ধারের দিকে কতকটা আলগা মাটি পড়ে রয়েছে, ভাবল যে সেই জায়গাটাই হবে বোধ হয়।

ওরা আবার চলতে আরম্ভ করল। ঢুলির মা জিজ্ঞেস করলে, 'পচাই তুমাকে কখন বলেছিল, সে ত এখন ইখেনে নাই?'

'উই তখন বলেছিল এক রেতে, ভাত খাআতে যেতম যখন...' বলতে গিয়ে কামিনী ফুঁপিয়ে উঠল, আঁচলটা টেনে মুখে চাপা দিলে।

'ই আবার কী হল, বউ, কাঁদতে লাগ কেনে?'

'উ আমার কুথাকে আছে, দিদি, বেঁচে আছে কি, কী হইচে...'

পচাই সেই সময় গা ঢাকা দেবার পর রাত্রে রাত্রে কামিনী তাকে খাইয়ে আসত, একটু বনেবাদাড়ে, আড়াল আবডাল দেখে, জায়গা বদলে বদলে বলে দিত পচাই। ভাত খাওয়াত, তারপর চারটি মুড়িও দিত, পরে খাবার জন্যে। এই রকম দিন পনেরো চলার পর পচাই আর আসত না।

যে সব জোয়ান পুরুষ আর ছেলেছোকরার দল আড়াল হয়েছিল, তাদের সম্বন্ধে নানা রকম শোনা যেত। কয়েক জনের গুলিবিদ্ধ দেহ পাওয়া গিয়েছিল, রাস্তার ধারে, বনের মধ্যে, তাদের মধ্যে সতে বাগ্‌দী একজন। কারুর সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট খবরই আর পাওয়া যায়নি। কত চলে গেছে অন্য গ্রামে, শহরেও, অনেক দূরে।

শোনা যায় বনা টুডু তার মামাবাড়ি সারেঙ্গার দিকে চলে গেছে, সেখানে মজুর খাটে। একবার কামিনী খবর পেয়েছিল, পচাইও গেছে তার সঙ্গে। লুস্‌কিকে জিজ্ঞেস করেছিল কামিনী, সে কিছু বলে না, বলতে চায় না।

ঢুলির মা বললে, 'কান্নাকাটি করে কী হবেক, বউ, পচাই তুমার বেঁচে আছে, ভাল আছে। আচ্ছা, লুস্‌কি বুড়িকে ভাল করে শুধাও না কেনে, তার বেটার খপর ত জানে?'

কামিনী যেন রেগে উঠল, 'উ শুকুনি বুড়ি সব জানে, কিন্তু বলবেক নাই, মন্ত্র-টন্ত্র পড়ে, ডর লাগে, উয়াকে আমি কত ছেদ্দা-মান্যি করি, কিন্তু কিছু বলবেক নাই...'

'উই দেখ, বউ, দেখ-দেখ...' থমকে গিয়েছিল ঢুলির মা, চণ্ডীতলার মোড়ে সেই রাডার-টাওয়ারের কাছে এসে পড়েছিল ওরা, এক বছর আগে এটা তৈরি হতে শুরু হয়েছিল, এখন শেষ হয়ে চালু হয়েছে। সরকার তৈরি করেছে। ইস্পাতের কাঠামো উঁচু হয়ে যেন আকাশ ছুঁতে চাচ্ছে, কাঠামোতে রুপোলি রঙ করা, রোদে ঝিকঝিক করছে। পাশে কণ্ট্রোল ঘরের দোতলায় জানলার ফাঁকে দুটো লোককে খানিকটা দেখা যায়। একজন হয়তো চেয়ারে বসে

টেবিলে কিছু পরীক্ষা করছে, আর একজন চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখছে।

কামিনী আর দুলির মা দুজনেই ঘাড় পিছনে হেলিয়ে মুখ উঁচু করে চূড়াটা দেখল কিছুক্ষণ, তারপর চলে গেল ওখান থেকে।

বাঁ দিকে দোকানপাট দু-চারটে, আগেকার মতোই, বেলা হতে কাজকর্ম শুরু হয়েছে। একটা বাস বাঁকুড়ার দিক থেকে এসে থামল, যাত্রীরা নামা-ওঠা করল, তারপর ধোঁয়া ছেড়ে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। চা দোকানের পাশেই একটা ময়রা দোকান, আলমারির কাচ ছিল এক সময়, এখন একটাও নেই, বাসি মিষ্টি সাজানো। কিন্তু পাশেই উনুনে তেলে-ভাজা হচ্ছে, তারই লোভে জড়ো হয়েছে কয়েক জন বিভিন্ন বয়সের লোক। দুলির মা দাঁড়িয়ে পড়েছিল, হাসল একটু, বললে, 'বউ, চপ খাবে? চল না, আমার আঁচলে পয়সা আছে ··'

ওরা দু'জন পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে দোকানী বলল, 'কী লিবে? তুমাদের গাঁয়ের অবস্থা কী রকম?'

'আর আবস্থা! চারট' চপ দাও দিকি, বেশ গরম, কত দাম লিবে?'

পুরুষদের সঙ্গে কথা না পেড়ে দুলির মা থাকতে পারে না, কতকটা দোকানীর দিকে কতকটা খদ্দেরদের দিকে তাকিয়ে দুলির মা বলে উঠল, 'কাজ-কামের হুলুক দিতে পার তুমরা?'

'কাজ-কাম কুথা পাব?' দোকানী বলল।

খদ্দেরদের মধ্যে এক প্রৌঢ় গোছের লোক দুলির মাকে দেখছিল, মনে হয় চিনত আগে থেকে, সে বললে, 'চাঁদসোলে সাঁওতাল আছে অনেক, ছুঁড়ি কামিনদের লিয়ে দল কর, শহরে চলে যাও, কাজকাম অঢেল পাবে, হ্যা-হ্যা·· '

'মরণ আর কি!' মুখ মুড়ে দুলির মা বলল, সেও লোকটাকে চিনত।

দোকানেরই একটা কোণে একটু পিছন ফিরে চপ খেল ওরা, পেট ভরে জল খেয়ে, চোখেমুখে জল দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। রাস্তা পেরিয়ে উল্টো দিকে চলে গেল ওরা, বামুনদিঘির দিকে। দুলির মা বললে, 'পা চালি' এস, বউ, বেলা হয়ে গেল···'

বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে। বামুনদিঘির বুনো পাড়ে—ঘাটের পাড়ের উল্টো দিকে—একটা শিরিষ গাছের নিচে বসে আছে ওরা দু'জনে। এখানে এসে ওদের লাভই হয়েছে বলতে হবে। বনের মধ্যে এত বনকুঁদরী পেয়ে যাবে তা ওরা ভাবতে পারেনি। চাঁদসোল গ্রামে দু-পাঁচটা জন্মালেও এত নয়, ওদের

দু'জনেরই কোঁচড় ভর্তি হয়ে গেছে। তাছাড়া, কচু তুলেছে ওরা, কলমি শাকও।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, এখন বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে। বেশ বড় দিঘিটা, জল কালো, হাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে এদিকে ওদিকে, পদ্মপাতা ভেসে রয়েছে, আর কিছুদিন পরে ফুল ফুটতে শুরু করবে। দিঘির চারধারে নানা রকম গাছের জঙ্গল, মানুষজনের বসতি একটু দূরে, কিন্তু দিঘিতে সরা-বসা আছে। দিঘির ওপারে ঘাটে কাদের বউ স্নান করতে এসে কাপড় কাচছে, একটা বাচ্চাকে ঘাটের পৈঠায় বসিয়ে রেখে।

শ্রান্ত, অথচ নরম চোখে সামনে তাকিয়েছিল ওরা। দু'জনেই কথা বলতে চায়, কিন্তু একটা ভারী আমেজের মতো লেগে আছে ওদের মনে, কেউ শুরু করছে না।

এক সময় নিঃশ্বাস ফেলে দুলির মা বললে, 'দেখ, বউ, ইয়াদের গাঁয়ে কি ঝড়-ঝাপ্‌টা কিছু লাগে নাই, বেশ আছে!'

ওদের দু'জনের চোখ ছিল ওপারের বউটির দিকে। সে কাপড়-কাচা শেষ করে ছেলেটাকে টেনে এনে তার মাথায় জল ঢালছিল।

কামিনা হঠাৎ বললে, 'তুমাকে একট' কথা বলব, দিদি?' একটু থেমে তারপর বলতে লাগল, 'নিজের বিটী, পেটে ধরেছি, শামলী গ', ত উয়ার ব্যাভার কী রকম! বলে বিয়া দিলে লাডী-ছেঁড়া বিটী পর হয়ে যায়···তাই বলে মায়ের সঙ্গে দেখা হল, ত বিটী কথা কইবেক নাই? মুখ ফিরাই লিবেক?'

দুলির মায়ের মনটা তখনও পুরোপুরি বিষয়ে ফিরে আসেনি, ও আলতো মনে বললে, 'হুঁ, আজকাল লাত্‌নীট' কী রকম হইচে, ভাল করে আমার সঙ্গেও কথা কয় নাই, সব সময় গুম খেয়ে রইচে, ভাল্ লাগে নাই!'

'তাই বল! উই শাউডী মাগি লিচ্চয় উয়াকে ওষুদ করেছে···আর কী সব কথা! বাপের কথা খুম জিগাস করে, কী রকম লেঠেল ছিল, সিংবাবুদের কী কাম করত, আমি কবে ঠিঙে সিংবাবুদের কাম করছি, বাবুদের সঙ্গে ভেড়াবাঁদিএ গেছলম কেনে···আর তুমার মুয়ের পানে দেখবে যেমন কী সব লুকাইছি আমি··· বিটাকে কী বলব বল, তুমি ত জান সব, সি সব দিন কী রকম ছিল, দোষ-ঘাট কার নাই বল···'

'না গ', তুমি তিলকে তাল করছ, তুমার বিটীর মাথা ঠিক নাই। উয়ার কথাট'ই ধর, সদ্য বিয়া হল সদ্য রাঁড়ী হল, কচি মেয়েট', আহা! আজকাল আবার ব্যারাম ধরেছে, মুচ্ছো যায়··· ভালয় ভালয় পেসব হয়ে যাক, তুমি রাগ

কর নাই বিটীর উব্‌রে, যাবে তুমি মাঝে মধ্যে উয়ার কাছে…'

'যাব কি, উও আসে নাই আমার ঘরে, আমাকেও যেতে মানা করেছে।'

ফিক করে হাসল ডুলির মা, একটা কথা মনে পড়ে গেছে। বললে, 'পেটে ছেলে এস্‌ছে ত যেমন সাত রাজার ধন মাণিক পেইছে… তা হবেক নাই! শুন বলি, উই যে মথুর দাদার যে দিন কাল হল, বীর পুরুষ বটেক! মা গ', উ কথা ভাবলেই গায়ে কাঁটা দি' উঠে। ত বাইরে উসব চলছে, ঘরের মধ্যে হাত পা কাঠ হয়ে গেছে আমার। দেখি কি, লাত্‌নী আমার তাক বুঝে তিড়িক করে ছুট, যেমন কাঁড় থিকে তীর ফিঁকাইছে, আর দেখ, পুয়াতি মানুষট'… আমি ভাবি ডর লেগেছে তাই পালাল লাত্‌নী, কিন্তুক ডাকাবুকা লাত্‌নী আমার, দশট' মরদের বাপ, তার আগের রেতে বল্লম লি'এস্‌ছে সামতাল পাড়া থিকে, অবাক কাণ্ড! মনে মনে ছিল কথাট', শুধালম এক দিন, লাত্‌নী, পালায়ছিলে কেনে? অ মা, বলে কি, রেতে শ্বশুর বলেছিল, পুয়াতি মানুষের পেটে সিপাই লাথ মারে, পেট নেমে যায়। থাকলেই দেখ, বউ, পেটের ছা এখন' মাটিএ পড়ে নাই, এখনই এত…'

শুনতে শুনতে কামিনী কাঁদতে আরম্ভ করল, সেই ঘুমন্ত অবস্থার একটানা কান্নাটা দিনের বেলা দিঘির ধারেই দেখা দিল যেন।

ডুলির মা বললে, 'কাঁদ কেনে, বউ, কাঁদলে বিটীর অলক্ষণ হবেক নাই? আশীর্ব্বাদ কর, উয়ার ভালয় ভালয় পেটের কাঁটা আলাদা হয়ে যাবে।'

বুঝল কামিনী, ডুলির মাও। দুটি মন এক হয়ে গেছে, একই শুভকামনা, গর্ভিণী শাম্‌লীর সম্বন্ধে একই কথা ওদের মনের ভেতর ফুটে উঠল।

ফিরবার সময় ডুলির মা বললে, 'আজ বিকালে যাব উয়াদের উঠানে, বলব তুমার কথা লাত্‌নীকে, তুমাদের মেল করি' দিব।'

একষট্টি

কিন্তু ব্যাপারটা ডুলির মা যা ভেবেছিল অত সহজ ছিল না। শুধু তাই নয়, অমন সদাপ্রসন্ন ডুলির মাও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, আরও, ওদের দুজনের মধ্যেও মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হবার উপক্রম হল।

সেদিন বিকেলেই মথুর কৌড়ির ঘরে শাম্‌লীর কাছে গিয়েছিল সে। শাম্‌লী একবার বাইরে গোচালার টুকিটাকি কাজ করছে, আবার ঘরের ভেতরে গিয়ে

রান্নাঘরের পাট সারছে। আজকাল এ বাড়ির রান্নার ভার সে-ই নিয়েছে। শাশুড়ীর অবস্থা আধমরা, কাজকর্ম করতে এলেও শাম্লী তাকে করতে দেয় না। এতে গিরিবালাও অবাক হয়ে গেছে, আগে এতটা ছিল না, মথুর কৌড়ি মারা যাবার পর এই ঘর আর গেরস্থালীতে শাম্লী যেন বুক দিয়ে পড়েছে।

'মায়ের উব্‌রে কি গঁসা করে থাকতে আছে? পচাই ঘরে নাই, বিটী বলতে তুমি একট', তুমি যদি মুখ ফিরায় থাকবে, থালে উয়ার মনের আবস্থা কী রকম হয় তুমিই বল দিকি…' এই রকম কথা ওকে বোঝাচ্ছিল ভুলির মা, শাম্লীর সঙ্গে সেও একবার ঘরে ঢুকছে আবার বাইরে আসছে।

উত্তরে শাম্লী হুঁ-হাঁ কিছুই করছে না, গুম খেয়ে রয়েছে, আজকাল যা হয়েছে তার স্বভাব।

'লাত্‌নী কি আমাকেও ঠিলে ফেলবে না কি, মায়ের মতন…তুমার কুন্থ কাম আমি করি নাই, লয়?…' অধৈর্য হয়ে বলে উঠল ভুলির মা, 'তুমার যখন আঁতুড়-ঘর হবেক, তখন আমাকে লাগবেক নাই? হ-হঁ, যে যেমন চ্যাটম করুক, ননী কায়েতনীকে ডাকতে হবেক সবাইকে…'

আঁতুড ঘরের কথায় মুখ তুলে তাকাল শাম্লী, নিজের ফুলে-ওঠা পেটের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'তখন ডাকি ডাকব, যাও দিকি তুমি…' উঠোনে দাঁড়িয়ে শোবার ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে বললে, 'মাল্লবউ' খেয়েদেয়ে একটুন ঘুমাইছে, চিল্লিয়ে ঘুম ভাঙি দাও নাই…' বলে একটা কলসী তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল শাম্লী, জল আনতে যাবে।

কামিনীদের বাড়ির সামনের পুকুরটাতেই জল আনতে এল শাম্লী, রোজ আসে। ভুলির মাও পিছন পিছন এল, মুখের ভাবটা না গরম না-ঠাণ্ডা, অর্থাৎ কথা বললেই আবার কথা বলবে। সারা রাস্তাটা কোনো কথা হল না, কলসী মেজে পরিষ্কার করে শাম্লী জল তুলল একটু অন্তর থেকে, তখনও না। কিন্তু ঘাট থেকে উঠে পা বাডাতে যাচ্ছে এমন সময় কলসীতে বেড় দেওয়া শাম্লীর হাতটা ধরল ভুলির মা, 'লাত্‌নী, আমার কথাট' রাখ, একবার মায়ের কাছে চল, তুমার শাউড়ী ত কিছু বলে নাই নিগ্‌ঘাত তুমি না যাও, থালে দাঁড়াও একটুন, আমি চট করে তুমার মাকে ডেকে নিএসি…'

শাম্লী স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে, যেন আগুন জ্বলছে, বললে, 'কেনে তুমি ফ্যাক-ফ্যাক করছ বল দিকি। তুমার হেঁসেল লিয়ে তুমি থাক, আমার হেঁসেলে উঁকিঝুঁকি মার কেনে…পাড়াবেড়ানী মেয়ে, তুমার রীত-ব্যাভার সবাই জানে, যাও যাও…'

কেউ যেন বজ্রাঘাতে ঝলসে দিয়েছে একটা গাছকে। কবে যৌবনে দুলির মার জীবনে কী ঘটেছে, সেটা জানে সবাই কিন্তু সামনে কেউ বলে না, কারও ধার ধারে না বলে সে কাউকে তোয়াক্কাও করে না—আর এখন বুড়ি হয়েছে সে, তাকেই এই কথা, আর ওই মেয়েটা বলছে, যাকে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে।

দুলির মার কথাগুলো তালপাতার মতো কাঁপতে লাগল যেন, 'তুই, তুই আমাকে ই কথা বললি! পুঁচ্‌কে ছুঁড়ি, আমার অফমান করলি তুই···তুই···'

'হঁ, করলম, তা কি··· আমাকে ঘাঁটাও কেনে···' একটু থতমত খেয়েছে শাম্‌লী।

'আমার রীত-ব্যাভার তুলিস, বুড়ি হলম···তোর মায়ের তুল গা, যা, উই যে সতী সেজে আছে, সনা মাহাত'র বউ···কেনে, সিংবাবুর রাঁড় ছিল নাই তোর মা? আমার ঢাকাঢুকি নাই, আর তোর মা···'

খটখট করে দুলির মা চলে গেল জায়গাটা থেকে, যেন পালিয়ে গেল, 'ভ্যালা রে ভ্যালা, উয়াদের মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া, মেল করতে গেলম, তা লয়, আমাকেই এই কথা, বুড়ি হলম! ছ্যা-ছ্যা!'

এরপর দিন পাঁচ-সাত ওদের আর দেখাশোনা হয়নি, অথচ তার আগে রোজই হত এক রকম। দুলির মা তো মথুর কৌড়িদের ঘরে অনেকটা সময়ই কাটিয়ে যেত, ঢুকলে আর বেরোতে চাইত না। তবে একটা জিনিস হয়েছে, সেদিনের ঝগড়ার কথা ওদের দু'জনের কেউ অন্যকে বলেনি, মেয়েদের পক্ষে সেটা একটু অস্বাভাবিক।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা এক বোঝা কাঠ মাথায় নিয়ে দুলির মা ঘরের দিকে যাচ্ছিল, জঙ্গল থেকে আসছে। ওদের সোজা রাস্তাটা মথুর কৌড়ির ঘরের সামনে দিয়ে পড়ে, জায়গাটা পেরোচ্ছিল সে হনহন করে। দূর থেকেই সে দেখেছিল, শাম্‌লী ওদের দেয়াল-দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। এক রকম পেরিয়ে যাচ্ছে জায়গাটা, এমন সময় ওকে পিছন থেকে ডাকল, 'ঠাকুমা···'। এ ডাকে যেন মধু মেশানো আছে, কিন্তু সাড়া দেবার নয়। চলে যাচ্ছিল দুলির মা।

পিছনে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল; তারপর শাম্‌লী পাশ কাটিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, পথ রোধ করে, 'ঠাকুমা, একটুন কথা আছে···' বলেই চোখ নিচু করল।

দুলির মা দেখলে, শাম্‌লীর মুখ শুকনো, নামানো চোখ যেন কোটরে ঢুকেছে,

গলার কাছে কাঁপছে ধুকধুক করে, পেটটা এই ক'দিনেই আরো বড় হয়েছে—মায়া হল, কিন্তু কর্কশ স্বরে বললে, 'আমার সঙ্গে কী কথা...'

'ঘরকে এস, বলছি...'

'বঝা মাথায় আমি এখন যেতে লারব, কী বলবে বল...'

'তুমার বঝাট' আমাকে দাও...' বলে শামলী মুখ তুলল, হাত বাড়িয়ে।

'অত সোহাগের কাম নাই, চল...' অনিচ্ছুক ফুলির মা কিসের টানে যেন এগিয়ে গেল সেই দরজাটার দিকে।

'তুমার শাউড়ী কুথা ?' ফুলির মা-ই কথা বলল, এখন স্বরটা যেন একটু নরম।

'উনি উ-পাড়ায় গেছে, মণ্ডলদের ঘরকে, নামগান শুনতে গেছে...'

গোচালাটার পাশে শামলীর সাহায্যে বোঝাটা নামিয়ে ভেতরে ঢুকল ফুলির মা। শামলী আসন পেতে দাওয়ার ওপর বসাল ওকে, চোখে-মুখে দেবার জন্য জলের পাত্র এগিয়ে দিলে। রান্নাঘরের ভিতরে গিয়ে ঠাণ্ডা জল এক গেলাস আর একখানা বাতাসা এনে ওকে দিয়ে বললে, 'লাও, খেয়ে একটুন ঠাণ্ডা হও দিকি...'

অনিচ্ছার বালির বাঁধ ভেসে গেল, বাতাসা আর জল খেয়ে সত্যিই ঠাণ্ডা হল ফুলির মা। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে বললে, 'উ দিনকে তুমি মুখ খারাপ করলে, আমিও করলম, কী সব হই গেল, রাগের মাথায়, রাগ লয় চণ্ডাল...'

থেমে গেল ফুলির মা, সামনে শামলী মুখ নিচু করে তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বসে আছে, তার আপোষমূলক কথা ওর কানে গিয়েছে কি না কে জানে। তখন একটু নীরস কণ্ঠে বললে, 'কী বলবে বল, সাঁঝ বেলা উত্‌রে গেল, আমাকে আবার এত্‌খানা পথ চলতে হবেক...'

চোখ তুলল শামলী, 'একট' কথা বলবে, ঠাকুমা, সত্যি কথা বলতে হবেক...' ওর ঠোঁট কাঁপছিল।

'কী কথা...' অনিশ্চিতভাবে বলল ফুলির মা।

'পচাই, আমি, কার বেটা-বিটী ?'

ফুলির মা যেন ডিগবাজি খেয়ে পড়ল, মুখখানা ফাঁক করে রইল তাকিয়ে।

'আমরা সনাতন মাহাত'র জন্মিতা, না কি...ঠিক করে বলবে তুমি, মা কালীর দিব্যি...'

'অ মা, ই কী কথা, আমি যে কিছু বুঝতে লারছি !'

'ঠাকুমা, মাকে আমি কেনে দেখতে পারি নাই, জান, এই জন্যে। সিংবাবুকে

লিয়ে আমি ছেলেবেলা ই কথা উ কথা শুনেছিলম, কিছু জানতম নাই তখন, এখন যেমন আমার বুকের মধ্যে…ঠাকুমা, তুমি উ দিনে কথাট' আবার বললে, রাগের মাথায় · সত্যি বলবে ঠাকুমা, আমার দিব্যি…' কান্নায় কেঁপে গেল শামলী।

'না-না, দূর পাগলী, মরণ আমার …' হাসতে গেল দুলির মা, কিন্তু অতিশয় কাতর শামলীর দিকে চেয়ে চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ সেও বেদনার্ত মুখে চুপ করে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'শুন, লাতনী, সত্য বলব, তুমার মা সব বলেছিল আমাকে। তুমার মায়ের কোলে পচাই, তখন উ বাঁড়ী হল, সিংবাবুদের ঘরে আগে থেকেই ঝিগিরি করত। সিংবাবু গেল একদিন ভেড়া-বাঁধিএ, সেখেনে আর একট' কাছারি ছিল, আর সব লোক গেল, তুমার মাকেও লি'গেল কাজকাম করতে।

'দুফর বেলা, কেউ কুথাও নাই, ঘুম ভেঙে উঠে কত্তা হাঁকল, কে আছিস, জল লি'আয়। আর কেউ নাই দেখে তুমার মা জল লি'গেল রান্নাঘর ঠিঙে। কত্তা জল খেল, কিন্তু কেমন করে চাইছিল তুমার মায়ের দিকে। ভয়ে সিটপিটিয়ে গেলাস নিয়ে চলে যাচ্ছে, কত্তা বলল, পাখাট' দিয়ে বাতাস কর দিকি। তুমার মা বাতাস করতে লাগল, মুখে ঘমটা টেনে। কত্তা বলল, উঠে এস বিছনা, এখেনে বাতাস কর…ত না বুঝবার ক্ষ্যামতা ছিল নাই। এই হল বিত্তান্ত। তুমরা ভাই-বোন বাপের জন্মিতা, সনাতন মাহাত'র আর তুমাদের মুখে বাপের ছাপ নাই? ঠিক সনাদাদার মত…'

'সত্যি বলছ…' মনে হল শামলী খুশি হয়েছে, বুকের থেকে একটা ভার নেমে গেছে যেন, 'দাঁড়াও, লম্ফ জ্বালি…'

কেরোসিনের আলো এনে দাওয়ায় রাখল শামলী, আবার দুলির মার সামনে এসে বসল। কিন্তু মনে হল ওর মুখ থেকে এর মধ্যেই খুশীর ভাবটা চলে গেছে।

দুলির মা বললে, 'আচ্ছা, এই সব কথা কেনে শুধাচ্ছ তুমি, লাতনী?'

শামলী বললে, 'আচ্ছা, ঠাকুমা, তুমি বলছ, বাবা মরে গেলে মায়ের উই সব হইছিল, ধর, বাবা বেঁচে আছে আর যদি উসব হত, থালে কার হত বেটা-বিটী?'

'তা কী করে বুলব, যে মাগী ভাতার পুষে আবার নাং করে তার পেটে কার বেটা-বিটী আসবেক, তা কি বলা যায়…'

শামলী মাথা নিচু করে বসে আছে, মাথার ভেতরটা ঘুরছে ওর।

দুলির মা নিজের রসিকতার তালেই ছিল, বললে, 'আশ্বিন মাসে কুন্তীদের

দেখিস নাই, জোড় লাগে ই কুকুরের সঙ্গে, উ কুকুরের সঙ্গে, কুন্‌ট'র বাচ্চা হবেক, উয়ার কি ধরা-বাঁধা আছে…'

চমকে উঠল ঢুলির মা, শাম্‌লীর মাথাটা টলছে। পরক্ষণেই মাথাটা ঝুঁকে পড়ল ওর, সেই মূর্ছার ব্যামো।

ঢুলির মা ভয়ে কেঁপে উঠল। রান্নাঘরে ঢুকে গেল ও, জল এনে ওর চোখে-মুখে ঝাপটা দিল, চালের বাতাতে ছিল একটা পাখা, সেটা টেনে নিয়ে বাতাস দিতে লাগল। ওর শাশুড়ীও বাড়ি নেই।

কতক্ষণ পরে চোখ মেলল শামলী, একটু পরেই উঠে বসল, 'মা গ' …'

একটু জল চেয়ে খেল ও।

ঢুলির মা বলে উঠল, 'তোমার শাউড়ী কী রকম মাগী, বাছা, কব্‌রেজ-বদ্যি দেখাতে পারে নাই? একে ছ-সাত মাসের পেট, তাব উব্‌রে ফিটের ব্যারাম…'

'কবরেজ-বদ্যি কী করবেক, ঠাকুমা…' এই অবস্থাতেও হাসল শাম্‌লী এক রকম করে, 'আমার রোগের মূল শিকড় তুমি!'

'আমি! তুমি লাত্‌নী আজ আমার মাথা-টাথা খারাপ করে দিবে না কি?'

'ঠাকুমা, তুমার মনে আছে, কুন দিন আমার ফিট হইছিল, পথম? উই রাত্তে, যে রাত্তে শ্বশুর মহনের ঘরকে এসেছে…শ্বশুর বললেক, পেটে লাথ মারে উয়ারা, উই কুত্তা সিপাইগুলা, তুমি বললে যোবতী মাগীদিকে বেআবুর করে…ত কী একট' দেখলম যেমন মাথার মধ্যে, আর আমাব মাথা ঘুরতে লাগল, উইট' আমার মাথায় এসে, ত আমার মাথা ঘুরে যায়, চোখে ধুঁয়া দেখি…'

বুদ্ধিমতী ঢুলির মাব মনের মধ্যে কিছু হল যেন, এক রকম করে শাম্‌লীর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। সংশয়ী স্বরে জিজ্ঞেস করলে, 'দিদি, তুমার মনের মধ্যে কী আছে বলবে আমাকে? আমি তুমাকে সব কথা বললম…'

'না, কিছু লয়, সত্যি বলছি…'

ঢুলির মা সবটা বিশ্বাস করল না, কিন্তু ওই একরোখা মেয়েকে আর পীড়াপীড়িও করল না। তাছাড়া, বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল।

শাম্‌লী এখন সুস্থ বোধ করছে। আলোটা নিয়ে বাইরে পর্যন্ত এসে ঢুলির মা'র মাথায় কাঠের বোঝাটা তুলে দিল। হঠাৎ বলল, 'ঠাকুমা আমাকে জঙ্গলে লি'যাবে?'

'তা লিব নাই কেনে, কিন্তুক তুমার এত বড় পেট, তুমার শাউড়ী ছাড়বেক কেনে…'

'না-না, কাল তুমি আমাকে লিয়ে যাবে, আমার এখেনে ভাল্ লাগে নাই, মনে লেয় জঙ্গলে যাই ত বুকট' ঠাণ্ডা হয়, মহনের সঙ্গে গেছি ত…'

'আচ্ছা, শাউড়ীকে বলে রাখ · ' শাম্‌লীর চোখ নিচু করা মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ঢুলির মা।

বাষট্টি

ফাল্গুন মাসের জঙ্গলের ব্যাপার সব আদ্ধেক-আদ্ধেক। একটু বেলা হচ্ছে, শীত একেবারে শেষ হয়ে যায়নি, কিন্তু রোদ উঠেছে খর হয়ে, গাছের ছায়ায় এলে ঠাণ্ডা লাগে, বেরোলেই চোখমুখ জলতে থাকে। গাছের তলায় বড় বড় শুকনো পাতা ঝরে পড়েছে, আর সব সময়ই টুপটুপ করে পডছে, আবার নেড়া ডালে সদ্য-গজানো বাদামি পাতা ঝিকঝিক করছে।

পরের দিন এই রকম বনের মধ্যে পথ চলছিল ঢুলির মা আর শাম্‌লী। প্রথমে ছোট ছোট গাছ, তারপর জঙ্গল ক্রমে ঘন হতে শুরু করেছে। আজ সব কিছুই যেন অন্য রকম লাগে—একজন নিজের যন্ত্রণার মধ্যে ডুবে রয়েছে, অন্যজন উৎসুক অথচ বিমর্ষ। নিজেদের টেনে টেনে এগোচ্ছে ওরা। বিশেষ করে শাম্‌লীর পা ফেলা কেমন জড়ানো-জড়ানো, অনেক দূর পর্যন্ত ওরা কথাও বলছিল না। শেষে ঢুলির মা বললে, 'উই জন্যে তুমাকে আনতে চাই নাই আমি…'

'কেনে…' কী রকম অবাক চোখে তাকাল শাম্‌লী।

'তুমি চলতে পারছ নাই, হাঁপ ধরছে তুমার, পুয়াতি মানুষ…'

'হুঁ…' বলে আবার পথ চলতে লাগল শাম্‌লী। পরক্ষণেই আবার বললে, 'ঠাকুমা, আমার পেটে ছাঁ-ট' না এলেই ভাল হত…'

'উ কী কথা, ষাট ষাট…' চুকচুক করে উঠল ঢুলির মা। তারপরে গদ্‌গদ হয়ে যোগ করল, 'তুমার শ্বশুরের কথা মনে আছে ত? আমাদের কত আশা, তুমার শাউড়ী, মা, আমি, তুমার বেটার জন্যে আমাদের কত সাধ-আহ্লাদ বল দিকিনি…'

হ্যাঁ, ওরা প্রত্যেকে বিধবা, ঘরে পুরুষ নেই, গ্রামের পুরুষরা কেউ মরেছে কেউ পালিয়েছে, অনাথ নারীরা বহু আগ্রহে প্রতীক্ষা করে আছে পুরুষ-জাতকের জন্যে।

শাম্‌লী কথা তোলে বটে, কিন্তু উত্তরটা কানে যায় না। আবার কতক্ষণ পরে বলে উঠল, 'আচ্ছা, ঠাকুমা, ছেলের মুখ দেখলে ত বুঝা যায় কার জন্মিতা, হঁ?'

'তুমার কী হইচে, বল দিকি, লাত্‌নী, সব খুলে বল, আমাকে বিশ্বাস কর...' খপ করে শাম্‌লীর হাতখানা ধরে ফেলল ঢুলির মা, 'আমাকে বল, তুমার বুকে আগুন খাক-খাক করছে, বুক ফাটি' মরে যাবে নালে...'

শাম্‌লী মুখ ফিরিয়ে নিলে, ভাঙা-ভাঙা গলায় বললে, 'কিছু লয়, না, এস...'

অবশেষে সেই জায়গাটায় এসে পৌছাল ওরা। সেই চত্বর, সেই পাথুরে গড়ান, গুহার মুখ, চারদিকে গাছগাছালি, পাখির ডাক—জায়গাটায় শাম্‌লীর জীবন-মরণ জড়ানো রয়েছে। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল ওরা। তারপর শাম্‌লী আগে আগে, চত্বরটার ওপর দিয়ে হেঁটে গেল ওরা, সেই গুহাটার সামনে পৌছাল।

উঁকি মারল ওরা, আর শাম্‌লী অত্যন্ত পরিচিত জায়গার মতো ভেতরে ঢুকে গেল।

আর ঢুলির মা, একটু আগেকার সঙ্গে তার যেন কোনো মিল নেই। তার গলার ভেতর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, মুখখানা একটু ফাঁক হওয়া, চোখ দুটো ঈষৎ বড় বড়, দেহের সমস্ত স্নায়ু-শিরা যেন টান-টান হয়ে গেছে।

এই জায়গায় সে আগে কখনো আসেনি। শাম্‌লী গুহায় ঢুকেছে, আর ঢুলির মা ভয়-খাওয়া চোখে পিছনে ফিরে তাকাচ্ছে, চত্বরটার উপর, তারপর চারপাশের গাছগাছালির দিকে। ঢুলির মা'র বুঝবার কথা নয়, প্রকৃতি বড় অকরুণ, গাছগুলো যে মর্মান্তিক ঘটনারই সাক্ষী থাক না কেন, নতুন পাতা গজিয়েছে, ফুল ফুটেছে অজস্র, বড় আমগাছটায় বোল ধরেছে থোক থোক, তার ওপর মৌমাছির ঝাঁক মৃদু সুর তুলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কতক্ষণ পরে শাম্‌লী যখন বেরিয়ে আসছে, তখন ঢুলির মা দেখলে, তার চোখমুখ অন্য রকম হয়ে গেছে, একটা ভৌতিক আবেশ যেন ভর করেছে ওকে, কাঁপছে তার দেহটা।

'ঠাকুমা...' কাতর কণ্ঠে বলে উঠল শাম্‌লী।

ঢুলির মা বড় বড় চোখ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। সাড়া দিতে পারল না, গলার মধ্যে আটকে গেছে যেন। কিন্তু এটাও বুঝতে পারল, শাম্‌লী আর পারবে না, যে কথাটা ওকে এতদিন পিষে ফেলছে, সেটা এখনই ও বলবে।

'সি দিন দুফর বেলা খেয়ে-দেয়ে বেরি' পড়েছিলম আমরা, মহন আর আমি। বনের মধ্যে আমাকে টিয়া পাখি ধরে দি'ছল...এই খেনে উয়ার বন্ধু ছিল, আমি

গঁ ধরলম ত উয়াকে পাঠায় দিলেক, দেখবে এস…' গুহার ভিতর দিকে আবার চলে গেল শাম্‌লী, তুলির মা যেন টানা হয়ে দু'পা এগিয়ে গেল, 'ইখেনে মহন আ াকে লিয়েছিল, উই শেষ বার, ইখেনে শুয়েছিলম আমরা…'

বেরিয়ে এল শাম্‌লী। চত্বরটার ওপর এগিয়ে গেল, উঠল সেই মোটা অশথ গাছটার পিছনে উঁচু পাথুরে জায়গাটায়, যেখানে মোহনের সঙ্গে সে ওৎ পেতে ছিল, কেমন করে বল্লম হাতে নিয়ে একটা কুকুরকে খুঁচে মেরে নিচে পড়ে গিয়েছিল, কেমন করে বেঁধেছিল ওদের দু'জনকে, কী সব কথা শুনেছিল, তারপব এল সেই জায়গাটায়, একটুও ভোলেনি শাম্‌লী, 'ইখেনে, ইখেনে, তিনটে জন্ত, ঠাকুমা…'

আবার বলল শাম্‌লী, 'মুচ্ছো গেছলম, ঠাকুমা, চেতন হতে দেখি মহন আমার পড়ে রইচে উখেনে, গুলি মেরেছে, উই উখেনে · উখেনে · ' টলতে টলতে জায়গাটায় চলে এল শাম্‌লী, যেন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে, এমনিভাবে বসে পড়ল। ফুলে ফুলে উঠতে লাগল তার দেহটা, এত দিন পরে তার চোখে জল নেমেছে, কাঁদছে শাম্‌লী।

চারদিকের গাছে পাতায় দু'পুরের রোদ ঝকমক করছে, বাতাস দিচ্ছে ঝিরঝির করে, কোথায় একটা কোকিল ডাকছে, এক দিকে একটা মহুয়া গাছের থেকে ফুল ঝরে পড়ছিল, তার গন্ধ ভেসে আসছে।

চাঁদসোলের আড়াইক্রোশী মাঠটার ওপর দিয়ে যখন ওরা ফিরে আসছিল, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। ওরা কাঠকুটো বেশি সংগ্রহ করতে পারেনি। দুজনের মাথায় ছোট দুটি বোঝা, দু'জনে চুপচাপ, কোনো রকমে পা ফেলছে। রোদের ঝাঁওলটা গ্রীষ্মের মতো, সমস্ত মাঠটা পুড়ছে যেন, বনের সেই উন্মাদনার ভাবটা এ মাঠে নেই। এই উত্তাপে নিঃশেষিত মাটির উর্বরতার তেজ দিনে দিনে আবার সঞ্চিত হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে, পরের বর্ষাকালের জন্য।

কখনো আলের উপর দিয়ে, কখনো জমির কোনাকুনি আসছে ওরা। যার উপর পা ফেলছে ওরা, সেই মাঠ কতবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, কত হাতবদল হয়েছে, কত যুগ ধরে কত দাপট গেছে এর ওপর দিয়ে, কিন্তু আজও সেই একই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলেছে। আর এই মাঠের ওপর দুটি মেয়ে, একজন বর্ষীয়সী, আর একজন তরুণী, গর্ভিণী, কামিনীর কথাও রয়েছে ওদের সঙ্গে। কে যেন এদের জুড়ে দিয়েছে একসঙ্গে। ক্ষমতার, লালসার, অসহায়তার শিকার দেহধারিণী নারী দুটি মাঠ পেরোচ্ছে।

মাঠ শেষ হল। মে নের জমির পাশ দিয়ে যাবার পরই বাঁদিকে দুটো পাকুড়, আর ডানদিকে এক ঝাঁকড়া হিজল গাছ। এখানেই পাড়া আরম্ভ হয়েছে। শাম্‌লী বললে, 'আর পা চলছে নাই, ঠাকুমা, একটু জিরাই…'

মোহনের জমিটার দিকে মুখ করে ওরা বসল দু'জনে। এখানকার বাতাস কতকটা সেই বনের মতো, একটু পরেই ঠাণ্ডা হল ওরা।

শাম্‌লী কথাও বলল সহজভাবে, এখন ও অনেক সুস্থ হয়ে উঠেছে। বললে, 'ঠাকুমা, শ্বশুরের কথা ভাবি। তিনি দেব্‌তা, মহনের বাপ, তেনাকে গড় করি আমি, তিনি স্বগ্‌গে গেছে… তিনি বলত, তেনার বংশ আসবেক আমার পেটে, মহনের পুত্ত…'

বনের মধ্যে সেই যে শাম্‌লী তার বৃত্তান্ত বলেছিল, তারপর থেকে দুলির মা একটা কথাও বলতে পারেনি। তার সমস্ত চেতনা যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল। তার নিজের যৌবনের ঘটনা সব তার মন থেকে মুছে যাবার নয়, কিন্তু তার যে এমন বেদনার দিক থাকতে পারে, তা এর আগে সে ভাবেনি। শাম্‌লীর মুখের দিকে তাকাল সে, বুকের অনেক গভীরে যেন মোচড় দেয়, বড় কচি মেয়েটা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'তুমার পেটে মহনের বেটা আসবেক, তুমি ভাব কেনে…'

যেন বাতাসে কচি পাতাটি নড়ছে, এমনি মৃদু মাথা নাড়ল শাম্‌লী, 'শুন, ঠাকুমা, তখন সেই গেছি তেনাদের ঘরে, আমাকে বউ বলে লি'গেছে। এক রেতে ঘুম ভেঙে গেছে, শুনি কি, শাউড়ী গজ্‌রাচ্ছে, তুমি যে বউ-বউ করছ, বাগ্‌দী-মাহাত'র বিটী, উয়ার গত্তের বেটা আমার বংশ হবেক? উ আমি লিতে লাবব…ত শ্বশুর কী বললেক জান, বললেক, মহন ভুলে লয় গ', মহন বামুনের বেটা, তার বীচ আছে উয়ার গত্তে, বামুনের বেটা রাজপুত-বংশ হবেক, তায় ক্ষেতি কী, ইসব চলে আমাদের জেতে…ত বল, ঠাকুমা, আমি ভাবি, আমার পেটে মহনের ছেলে আছে, না কি, জন্তু জন্মাইছে…'

দুলির মার শুকনো গালের ওপর জলের ধারা নেমে এসেছিল, যা কেউ কোনো দিন দেখেনি। সে হাত বাড়িয়ে শাম্‌লীর চিবুক স্পর্শ করে সেই হাত মুখে ঠেকাল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে অতি কোমল স্বরে সস্নেহে বললে, 'আমি বলছি তুমার পেটে মহনের বেটা আছে…আমি বলছি…তুমি সনা মাহাত'র বিটী, খাঁটি মানুষের বিটী, তার গত্তে কি জন্তুর ছাঁ জন্মায়!'

তেষট্টি

এরপর আরো মাস তিনেক কেটে গেছে, ফাল্গুনের হালকা বাতাস চৈত্রে ভারী হয়ে উঠেছে, তারপর বৈশাখের শেষ দিকে চারদিক জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, ঝাঁ ঝাঁ করছে চারদিক। গাছের ফুল সব ঝরে গেছে, কিন্তু হিজল বট কাঁঠাল আম গাছে ফল ধরেছে রাশি রাশি, কত রকম রঙ—সবুজ, লাল, নীলচে।

এদিকে গিরিবালা আর শাম্‌লী একান্তে তাদের গেরস্থালিটা চালিয়ে যাচ্ছে, যেমন চাঁদসোলের নিঃঝুম পুরী, তেমনি ঘটনাহীন ওদের ঘরকন্না, দুলির মা মাঝে মধ্যে আসে।

চলছিল এই রকম। এই তিন মাসে শাম্‌লীর বেশি মূর্ছা হয়নি, কিন্তু মাস খানেক বাদে হঠাৎ কেন জানি, বোধ হয় প্রসবের সময় আসন্ন হচ্ছে বলেই, দিন তিনেক আগে আবার একবার হয়েছিল। গিরিবালা তাতেই উদ্বিগ্ন হয়ে লুস্‌কিকে বলেছিল ওষুধ দিতে।

তার কথা মতো মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলায় গিরিবালা লুস্‌কির ঘরে যাবার জন্য বেরোল। রাস্তায় পড়ে গা ছমছম করতে লাগল ওর। একটুও বাতাস দিচ্ছে না, অসম্ভব গুমোট। পথ অন্ধকার, তার ওপর কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। সাঁওতাল পাড়াটাও এখন নিস্তেজ, এদের পুরুষদের কেউ মরেছে, কেউ দেশান্তরী হয়েছে।

লুস্‌কির ঘরও একলার। বনা টুডু অনেকদিন এ ঘরে নেই। বুড়ি ছেলের কথা কাউকে বলে না, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে চুপ করে থাকে।

সন্ধ্যাবেলাতেই কাপড় মুড়ি দিয়ে দাওয়ার ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিল লুস্‌কি। ডাকাডাকি করে ওঠাতে হল তাকে। ঘুম জড়ানো স্বরে লুস্‌কি বলে উঠল, 'এসছিস তুই…', কিন্তু তক্ষুনি উঠল না।

কী রকম অস্বস্তি আর ভয় লাগছিল গিরিবালার, অনুনয়ের কণ্ঠে বললে, 'তুমি যে ওষুদ দিবে বলেছিলে, দিদি…'

'দিব, চল…'

লুস্‌কি একটা লণ্ঠন জ্বালল, একটা লাঠি নিল হাতে, তারপর আগে আগে চলল সেই বড়মতলার দিকে। পায়ে পায়ে জড়িয়ে চলতে লাগল গিরিবালা। ওর চোখ একবার রাস্তার দিকে, একবার লুস্‌কির ওপর। লুস্‌কির হাতের

লাঠিটা চলার তালে তালে দুলছে, আর শনলুড়ির মতো চুলগুলো দুলছে ঘাড়ের ওপর।

ঝাঁকড়া বটগাছের নিচে বড়মের থান। জায়গাটায় পৌছাতেই কয়েকটা শেয়াল ডেকে উঠে সরে গেল এদিকে-ওদিকে। বুকের ভেতর ঢিপঢিপ করতে লাগল গিরিবালার। লুস্‌কি তাকে দাঁড়াতে বলে বেনা ঝোপ কাঁটার জঙ্গল ভেঙে ভেতর দিকে চলে গেল। যে পাথরের মূর্তি বড়ম দেবতার, তার দুদিকে দুটো করে চারটে মাটির ঢিপ তুলেছিল লুস্‌কি। শোনা যায়, আগামী বড়ম পূজায় চারটে মোরগ বলি দেবে লুস্‌কি, চারটে ঢিপের সামনে। এর মানে কেউ জানে না।

ডান হাতে লণ্ঠন তুলে ধরে বাঁ হাতে একটা শেকড় বড়ম পাথরে, তারপর সেই ঢিপগুলোতে ছোঁয়াল লুস্‌কি, এই রকম তিনবার করল। তারপর সেথান থেকে সোজা গিরিবালার কাছে এসে বললে, 'বাঁ হাতে লে…বিটীর বাঁ হাতে লাল সুতা দিয়ে বাঁধি দিবি, চলে যা '

গিরিবালার ভয় তখন চরমে উঠেছে, কোনো কথা বলার ক্ষমতা তার ছিল না। লুস্‌কি পিছনে ফিরে আসছে কিনা, সেটাও দেখবার সাহস হচ্ছিল না ওর। এক রকম ছুটে হেটে বাড়ি এসে পৌছাল।

ঘরে ঢুকে দেখলে, শাম্‌লী দাওয়ার ওপর মাদুর পেতে শুয়েছে, বাতি-কমানো হারিকেনটা মাথার কাছে। গিরিবালাকে দেখে কাপড়-চোপড় সামলে উঠে বসল শাম্‌লী, আজকাল ওর শোওয়া-বসা করতে কষ্ট হয়। বললে, 'মা, লালী বাছুরট' গুয়াল ঠিঙে বেরি' এস্‌ছিল, আবার লি'যেয়ে বেঁধে দিছি …'

গিরিবালার ভয় কেটে গিয়েছিল তখন। যে বড়মের থান থেকে এই মাত্র এসেছে সে, সেই দেবতার কথা মনে হল, বাঁ হাতের শেকড়টার দিকে হারিকেনের আবছা আলোয় একবার তাকাল। ভক্তি-মন্থর কণ্ঠে বললে, 'বেশ করেছিস, মা এখন এইট' পরে লে দিদি, লুস্‌কি দিদি…দাঁড়া, আগে লাল পাড়ের সুতা লি'আসি…'

এর প্রায় পক্ষকাল পরে সেই বহু প্রতীক্ষিত দিনটি এল। দিনে দিনে নিকট হয়ে আসছিল সময়টা। শাম্‌লীর উঠতে বসতে কষ্ট, মুখ দিয়ে জল কাটে, রাত্রে ঘুম হয় না, খিদে পায় কিন্তু খেতে পারে না, মাঝে মাঝে কাঁদে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা কী রকম আটকে গেল ওর কোমরটায়, যেন নড়তে পারছে না। 'মা, দেখ, ধর আমাকে…' শাশুড়ীকে ডাকল শাম্‌লী। গিরিবালা

রান্নাঘর থেকে ছুটে-এসে ওকে ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দিলে। কিন্তু শুতে পারল না শাম্‌লী, ছটফট করতে লাগল, কোমরের খিলটা ছেড়ে গেছে, কিন্তু ব্যথায় কাঁটা হয়ে উঠল।

'তুই একটুন একলা থাক, মা, আমি দুলির মাকে খপর পাঠাই…' বলে পাড়ার মধ্যে ছুটে গেল গিরিবালা।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দুলির মা এসে পৌছাল। সে হেসে বললে, 'আর দেখ কী, লাতি হবেক গ', লাতি…পসব ব্যথা উঠেছে দেখছ নাই…'

দুলির মা যেন একাই একশ', এ অঞ্চলের নাম-করা ধাত্রী সে, সমস্ত পরিস্থিতির দায়িত্ব হাতে তুলে নিতে তার একটুও অসুবিধে হল না।

মাথা নেড়ে বললে, 'দেরি আছে গ', দেরি আছে…আগে পুয়াতিকে খেতে দাও দিকি, ভাত লি'এস, পেটে দল পড়ুক…'

'খাব কি ঠাকুমা, কী বলছ তুমি…' ককিয়ে কাতরে বলল শাম্‌লী।

'তুই খাবি কি, তোর ঘাড় খাবেক…' ধমকে দিল দুলির মা, জোর করে ওকে খাওয়াল।

শাম্‌লী বসতে পারে না, দাঁড়াতে চায়, আবার বসে। দুলির মা বললে, 'ব্যথা লাগলেই ভর দিবি আমার কাঁধে, লয় ত, দাঁড়া · ' তাড়াতাড়ি একটা শাড়িতে পাক দিয়ে খুঁটিতে বেঁধে দিল দুলির মা, 'এইট' ধরে ভর দিবি…'

দুলির মার নিপুণ পরিচালনায় একেবারে ভোর বেলা চরম মুহূর্তটি এল। গিরিবালা আর দুলির মা, দুটো বয়স্কা মেয়ে হিমশিম খেয়ে গেছে, কেবল কাজের তাড়সে খাড়া হয়ে আছে ওরা। দুলির মা শাম্‌লীকে ভাঙা-ভাঙা সজোর আদেশের কণ্ঠে বলছে, 'ব্যথা দে, লাত্‌নী, ব্যথা দে…'

কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা, তারপর ভোরের পাখপাখালির ডাকের সঙ্গে মথুর কৌড়ির দাওয়ায় শব্দ উঠল, 'ওঁয়া-ওঁয়া…'

একটু পরে মাথাটা তুলবার চেষ্টা করল শাম্‌লী, কী যেন দেখতে চায়, এরা দুজন হাঁ-হাঁ করে উঠল, 'শুয়ে থাক, দেখবি পরে, তোর বেটা হইচে…'

গিরিবালা ছুটে ঘর থেকে শাঁখ এনে বাজাল।

'ঠাকুমা, বল আমাকে, মহনের বেটা হইচে ?…' চিৎকার করে উঠতে চাইল শাম্‌লী, পারল না, মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

দুলির মা গিরিবালাকে বললে, 'ডর নাই, মুয়ে জলের ছিটা দাও, ভাল হয়ে যাবেক…'

চৌষট্টি

একুশে ষষ্ঠী পুজো। সন্ধ্যাবেলা পাড়ার পাঁচজন মেয়ে এসেছে। একটু খাওয়ার আয়োজনও করেছে গিরিবালা। তার আহ্লাদ আর ধরে না। ছেলেটা দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে।

দুলির মা ছিল, সে-ই সরস কথায় গল্পে আসরটাকে জমজমাট করে রেখেছিল। লুসকি বুড়িও এসেছিল গিরিবালার বিশেষ অনুরোধে। কামিনীর সঙ্গে শাম্‌লীর আর সে বিরোধ নেই। মেয়ের ছেলে হবার সময় সে থাকতে পারেনি বলে খুব আক্ষেপ করেছিল, এখন গিরিবালা আর সে, দুই বেয়ানে খুব হেসে হেসে কথা বলছে।

এসেছে এপাড়ার ওপাড়ার অনেক মেয়ে। যারা সপুত্র শাম্‌লীর চারদিকে গোল হয়ে বসেছে তাদের মধ্যে আছে অনেক বর্ষীয়সী বিধবা, বঁচার মামী, ঝুনী, সেই ধনী যে পচাইয়ের কাছে একদিন শাম্‌লীর সম্বন্ধে বলেছিল তাকে ঘঁড়া রোগে ধরেছে, এইসব। কিন্তু অন্তত পাঁচজন এয়োকে এনেছে গিরিবালা, তাদের মধ্যে রয়েছে লখী, গাজনের ভাই-বউ। তার দেড় বছরের ছেলে পুঁটেটা মায়ের শাড়ির পাড় ধরে এদিক-ওদিক ঘুরছে, আর মাঝে মাঝে টিয়া পাখির মতো চেঁচিয়ে উঠছে, খুশীতে। মেয়েরা তাতে হেসে উঠছে।

দুলির মা একটা ছড়া কাটছিল :

মা ষষ্ঠী, তুমার বালক এল বনে
থাকে যেন মনে,
শত্রু দুশমন চাপা দিয়ে রাখ গোড়ের কোণে।
দোহাই মা ষষ্ঠীর, দোহাই মা ষষ্ঠীর।

শাম্‌লী ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে আছে। দিনের বেলাতেই ওকে নিয়ে অনেক অনুষ্ঠান করে নিয়েছে গিরিবালা। আজ একুশ দিন, তার নখ কাটা হয়েছে, তেল হলুদ মাখিয়ে স্নান করিয়েছে ওকে, চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, টান খোঁপায় বাঁধা।

শাম্‌লী এয়ো নয়, আলতা শাঁখা সিঁদুর দেওয়া হয়নি, কিন্তু রঙিন শাড়ি পরিয়েছে, নতুন কিনেছে গিরিবালা, বিয়ের একটা জামা দিয়েছে গায়ে।

শাম্‌লীও পরেছে সে সব, শাশুড়ীকে বলেছিল, 'হুঁ, আমাকে পরায় দাও, বাবা এই সব পরতে বলেছিল আমাকে…'

চোখের জল ফেলেছিল গিরিবালা, 'তিনি থাকলে আজ তেনার কত আহ্লাদ…'

গিরিবালার পুরনো দু'গাছি সোনার চুড়ি ছিল, শেষবেশ তা-ই তার দু'হাতে পরিয়ে দিয়েছিল সে। শাম্‌লী রোগা হাতে বড় বড় চুড়ি পরে কাঁচুমাচু মুখে হেসেছিল।

সেই শাম্‌লী মেয়েদের মাঝখানে ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে আছে। শিশুর মাথার কাছে মাটির পিদিম জ্বলছে। পাশে বরণডালা, দেয়ালে তেল-গোবর-কড়ির ষষ্ঠীর মূর্তি। নানা মেয়েলি আচার।

শাম্‌লীর ছেলেটা হয়েছে বেশ, মেয়েরা বলাবলি করছিল আর মাঝে মাঝেই দেখছিল। বেশ গোলগাল, গায়ে জামা, পরনে লেংটি। তারও চুল আঁচড়ে দিয়েছিল, কপালে টিপ, চোখে কাজল। একটু আগেও ঘুমোচ্ছিল, এখন শাঁখের শব্দে আর উলুধ্বনিতে জেগে উঠে জুলজুল করে তাকাচ্ছে। মেয়েরা মাঝে মাঝেই উলু দিচ্ছিল।

এত সব চেনা মেয়ের মধ্যে থেকেও শাম্‌লী কথা বলতে পারছিল না। সে মাঝে মাঝে কালো নরম চোখে তাকাচ্ছে ছেলের মুখের দিকে, আর মুখ তুলে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে লজ্জা লজ্জা হাসছে।

লুস্‌কি মেয়েদের মাঝখান দিয়ে একটু এগিয়ে এসে নিচু হয়ে ছেলের মুখখানা দেখল, বললে, 'মহনিয়ার মত দেখনী হইচে, মহনিয়ার বেটা…' বলে ধান-দূর্বা দিল ছেলেটার মাথায়, গিরিবালা তার হাতে দিয়ে দিয়েছিল, আশীর্বাদ করার জন্য।

ভিড় থেকে সরে এসে লুস্‌কি আবার বলল, 'মথুরবাবুর বংশ হল থালে…'

গিরিবালা খই বাতাসা সন্দেশ রেকাবিতে সাজিয়ে এনেছিল, হেসে হেসে গদগদ কণ্ঠে বললে, 'দিদি, বস, টুটি মুখে দিয়ে যেতে হবেক!'

॥ সমাপ্ত ॥